প্রেম ও মজলিশি

সৈয়দ মুজতবা আলী

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

প্রথম প্রকাশ, কার্তিক ১৩৭০

PREM O MAJLISHI
A collection of various articles of Syed. Mujtaba Ali.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata - 700 073.

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস, ১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

প্রেমের প্রথম ভাগ

সর্বপ্রথমেই করজোড়ে নিবেদন, এ অধম মরালিটি ইমমরালিটি কোনো কিছুই প্রচারের জন্য এই 'ফরাসী হ্যান্ডবুক ফর বিগিনার্স ইন লভ্' লিখতে বসে নি। অবশ্য স্বীকার করি, আমি প্রাচীনপন্থী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে নিই—যাতে করে আমার প্রতি অবিচার না হয়—মডার্ন কবিতা, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ট্রাম-বাস পোড়ানো, পেট-কাটা ব্লাউজ ইত্যাদির বিরুদ্ধে না আছে আমার কোনো অভিযোগ, না চাই আমি দেশের জনসাধারণকে—তন্মধ্যে আমি নিজেও আছি—খ্রিস্ট-বুদ্ধ-রূপে দেখতে। বিশেষত ঐতিহাসিক উপন্যাস। জনসাধারণে রটে গেছে, আমি নাকি ঐ বস্তুর শত্রু। এটা আমার প্রতি বেদরদ জুলুম। প্রথমত, জনপ্রিয় কোনো জিনিস, অভ্যাস বা আদর্শের শত্রু হতে আমি কিছুতেই সম্মত হই নে। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলে পথে যে সব খানাখন্দ পড়ে, সেগুলোর প্রতি লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি তো ওঁদের সেবা করে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। বস্তুত আমি নিজেই একখানা লিখব বলে স্থির করেছি। তবে নিশ্চয়ই জানি অধুনা যেগুলি জনপ্রিয়, তার চেয়ে আমার বই অনেক নিরেস হবে; ভরসা এই, দালদাই বাজারে বেশি বিক্রি হয়, আমারটার কাটতি সেই কারণেই হবে অধিকতর।

তবে আমার এ 'ফরাসী হ্যান্ডবুক' লেখার সময় ইতিহাসের শরণ নেব অল্পই। যদিও আমার মনে হয়, পেট-কাটা বা টপ-লেসের নিন্দায় যখন হরিশ মুখুজ্যেরা কলরব করে ওঠেন তখন আধুনিকাদের উচিত একটুখানি ইতিহাসের পাতা উল্টোনো, কিংবা ইতিহাসের বাস্তব নিদর্শনভূমি মিউজিয়মে গমন। জাতকে আছে, একটি জেদী রমণী বসন্তোৎসবে যাবার সময় একটি বিশেষ রকমের দুর্লভ ফুল কামনা করে তার স্বামীকে রাজার বাগানে চুরি করতে পাঠায়। ধরা পড়ে বেচারা যখন শূলে চড়েছে তখন সে তার নিষ্ঠুর অকালমৃত্যুর জন্য রোদন করে নি। সে উচ্চকণ্ঠে শোকপ্রকাশ করছিল এই বলে, 'আমি মরছি তার জন্য আমার দুঃখ নেই, প্রিয়ে; আমার ক্ষোভ, তুমি আমার প্রিয় পুষ্পপ্রসাধন করে যে বসন্তোৎসবে যেতে পারলে না তার জন্য।'

তাহলে সপ্রমাণ হল, তথাগতের যুগেও রমণী ফ্যাশানের জন্য এমন ফুলও কামনা করতেন, যেটা শুধু রাজবাড়িতেই পাওয়া যেত, এবং সেটা যোগাড় করার দুঃসাহসিক অভিযানের ফলস্বরূপ তিনি বিধবা হতেও রাজী ছিলেন। এবং শুধু তাই নয়, সে-যুগের স্বামীসম্প্রদায় অতিশয় দার-নিষ্ঠ ছিলেন। প্রিয়ার মনোরঞ্জনার্থে হেলায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। এই দৃষ্টান্ত কি এ যুগের যুবকসম্প্রদায়কে আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় পন্থা অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করবে না?

অবশ্য পাঠক বলতে পারেন এ ধরনের ঘটনা সাতিশয় বিরল।

সাতিশয় বিরলই যদি হবে তবে আমাদের কবিগুরু ঐ ধরনের উদাহরণই জাতক থেকে নেবেন কেন?—

'—বালক কিশোর,
উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর
উন্মত্ত অধীর। সে আমার অনুনয়ে
তব চুরি-অপবাদ নিজস্কন্ধে লয়ে
দিয়েছে আপন প্রাণ।'

এবং যেন এ কবিতাতেই প্রোপাগান্ডা কর্ম নিঃশেষ হল না বলে কবি বৃদ্ধবয়সে ঐ বিষয় নিয়ে আরো মনোরঞ্জক, আরো চিত্তচাঞ্চল্যকর গীতি নৃত্য-নাট্য 'শ্যামা' রচনা করলেন।

এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করি যে, আমার যতদূর মনে পড়ছে মূল জাতকে গল্পটি একটু অন্য রকমের। আমার স্মৃতিশক্তি হয়তো আমাকে ঠকাচ্ছে, কিন্তু আমার যেন মনে পড়ছে, উত্তীয়কে কোন কিছু না বলেই তাকে শ্যামা নগরপালের কাছে পাঠায়। তাকে আগের থেকেই শ্যামা বলে রেখেছিল, কিংবা উত্তীয়েরই হাত দিয়ে চিঠি লিখে তাকে জানায়, পত্রবাহককে শূলে চড়াও; বজ্রসেনকে মুক্তি দাও। এবং বোধ হয় ঘুষের টাকাও কিছু ছিল, আর সেটাও উত্তীয় তার আপন ভাণ্ডার থেকেই দিয়েছিল—তাবৎ ঘটনার কোনো কিছু না জেনেশুনেই। আবার মাফ চাইছি, ভুল হতে পারে, শ্যামা বোধ হয় উত্তীয়কে বলে, 'তুমি এই চিঠি ও অর্থ—' সেটা শ্যামার কিংবা উত্তীয়ের—'নগরপালকে দিয়ে এলে আমি একান্ত তোমারই হব।'*

পাঠক স্বপ্নেও ভাববেন না, আমি শ্যামা বা পুষ্পবিলাসিনীর কার্যকলাপ সম্মতির চোখে দেখেছি। আধুনিকাদের অধঃপাতগমনের অহেতুক অভিযোগ কানে এলে আমার এসব দৃষ্টান্ত মনে আসে, এই মাত্র।

তবে এ নিয়ে ভাববার আছে।

যে কালে মুরুব্বীরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করে দিতেন, সে সময় ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মুরুব্বীদের ভিতর ভালো বর পাওয়ার জন্য যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত না তা নয়। বস্তুত যে কনের সঙ্গে লোভনীয় বরের বিয়ের কথাবার্তা এগিয়ে গেছে তার বিরুদ্ধে নাকি উড়ো চিঠি পর্যন্ত যেত তৃতীয় কন্যাপক্ষ থেকে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সংগ্রামে আবার নীতি কি! এবং কিছুমাত্র নতুন তত্ত্ব নয় যে, কুরু-পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্র সংগ্রামে যে নীতি অবলম্বন করেছিলেন সে নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু এযুগে, বিশেষ করে কলকাতা এবং অন্যান্য বড় শহরে, অনেক মেয়েকেই বাধ্য হয়ে বরের সন্ধানে বেরুতে হয়। এবং বররাও বেরোন কন্যার সন্ধানে। ফলে বিত্তশালী, রূপবতী বা উচ্চশিক্ষিতা যার যেমন অভিরুচি—কনের জন্য ছোকরাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায়, এবং উল্টোটাও হয়। বোধ হয় সুলেখক সুবোধ ঘোষের গল্পেই পড়েছি, তিনটি মেয়ে তিনটি ফুলের তোড়া নিয়ে পাল্লা দেন এক শাঁসালো বরকে স্টেশনে সী-অফ করতে গিয়ে।

এসব বিয়ে যে দেখা মাত্রই দুম করে স্থির হয় না সে কথা বলা বাহুল্য। কিঞ্চিৎ পূর্বরাগ, প্রেম বা প্রেমের অভিনয়ের প্রয়োজন হয়। কোনো কোনো স্থলে এটাকে কোর্টশিপও বলা হয়। আমাদের দেশে একদা গান্ধর্ব-বিবাহের প্রচলন ছিল। সে বিবাহ হত বিবাহের পূর্বেকার প্রণয়ের ভিত্তিতে।

কিন্তু এদেশে এখনো প্রণয়ের কোনো কোড্ নির্মিত হয় নি, অর্থাৎ যুবক-যুবতীতে কতখানি প্রণয় হওয়ার পর ছেলে কিংবা মেয়ে আশা করতে পারে যে এবারে অন্য পক্ষ তাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত, এবং তখন যদি সে হঠাৎ তাকে ত্যাগ করে অন্য কাউকে ভালোবাসতে আরম্ভ করে তবে সমাজে তার নিন্দা হয়। ইয়োরোপে মোটামুটি দুটো ধাপ আছে। দু'জনাতে প্রণয় হওয়ার ফলে যদি ছেলেটা মেয়েটিকে ফরাসীতে 'আমি', জর্মনে

* রবীন্দ্রনাথ জাতক, ইতিহাস ও অন্যান্য কিংবদন্তীমূলক যে সকল কবিতা, গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন, সেগুলো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি কি কি পরিবর্তন করেছেন সে সম্বন্ধে প্রামাণিক গবেষণা করে কেউ ডক্টরেট নেন না কেন?

'ফ্রয়েন্ডিন্' ('গার্লফ্রেন্ডে'র চেয়ে এটাকে ঘনিষ্ঠতর বলে ধরা হয়) বলে উল্লেখ করে, তার তখনো মোটামুটি বিয়ের দায়িত্ব আসে না। এটা প্রথম ধাপ। কিন্তু ফরাসীতে 'ফিয়াঁসে'—জর্মনে ঐ একই শব্দ বা 'ফেরল্‌বট্' ব্যবহৃত হয়—পর্যায়ে পৌঁছলে সেটাকে দ্বিতীয় ধাপ বলা হয়। এবং সে সময় যদি যুবক তাকে এন্‌গেজমেন্ট আংটি দেয় (অর্থাৎ মেয়েটি তখন 'বাগদত্তা' হল যদিও অর্থটা কিছু ভিন্ন) তবে সেটা বিয়ের প্রতিশ্রুতি বলেই ধরা হয়। তারপর সে বিয়ে করতে না চাইলে অনেক স্থলে মেয়েটি আদালতে প্রতিজ্ঞা বা চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা করে খেসারতি চাইতে পারে। সমাজে বদনাম তো হয়ই। মহাভারতে রুক্মিণী বাগদত্তা ছিলেন বলে পরে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বিয়ে করলে শ্রীকৃষ্ণের শত্রুপক্ষ তাঁর নিন্দা করে।

এদেশে প্রণয়ের কোনো স্তরেই বোধ হয় এরকম আংটি দেবার রেওয়াজ প্রচলিত হয় নি। তবে প্রণয় ঘনীভূত হওয়ার পর (কতটা ঘনীভূত এবং তার চিহ্ন কি, সেটা বলা কঠিন) যদি কোনো পক্ষ অকারণে 'রণে ভঙ্গ' দেয়, তবে তার যে বদনাম হয় সেটা সুনিশ্চিত। ইয়োরোপেও যে মেয়ে অকারণে একাধিক প্রণয়ীকে পর পর ত্যাগ করে সে 'জিল্‌ট' এই বদনামটি পায়।

নিছক প্রেমের জন্য প্রেম—বিয়ে করার উদ্দেশ্য কারোরই নেই—এটা বোধ হয় এদেশে বিরল। ইয়োরোপে মোটেই বিরল নয়। ছাত্র, ছাত্রী, মেয়ে কেরানী, ছোকরা অ্যাসিসটেন্টের ভিতর এ-জাতীয় প্রেম আকছারই হয়। এ-জাতীয় প্রণয়ের ফলে যদি কোনো কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায় তবে কোনো কোনো স্থলে সে যুবকের বিরুদ্ধে খেসারতির মোকদ্দমা আনতে পারে। আমি যতদূর জানি, বিয়ে করতে বাধ্য করাতে পারে না—তবে রাশাতে বোধ হয় সন্তানটি অন্তত পিতার নামটা আইনত পায়, অর্থাৎ জারজ রূপে ঘৃণার পাত্র নয়। ইয়োরোপে যদি যুবা প্রমাণ করতে পারে যে, মেয়েটার একাধিক প্রণয়ী ছিল তবে তাকে বা অন্য কাউকে কোনো খেসারতি দিতে হয় না। এক বলশেভিক আমাকে বলেন, এক্ষেত্রে রাশায় সব ক'জনাকে খেসারতি ভাগাভাগি করে দিতে হয়।

তবে ইয়োরোপের মেয়েরা যুগ যুগ ধরে প্রেমের মারফতে বিয়ে করেছে বলে অনেক কিছু জানে, এবং আর পাঁচজন বিচক্ষণ বান্ধবীদের কাছ থেকে উপদেশও পায়।

এদেশের তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আমার যোগসূত্র নেই। তবে আমার সব সময়েই মনে হয়েছে আমাদের মেয়েরা বড় অসহায়।

* * *

সিরিয়স প্রবন্ধ লিখব বলে আমার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। আমি প্রণয়, বিবাহ, লাভ ফর লাভ্‌স সেক্ ইত্যাদি সম্বন্ধে ফরাসীদের দু-একটি মতামত লিখতে যাচ্ছিলুম মাত্র। এ বাবদে ফরাসীদের অধিকারই যে সবচেয়ে বেশি, সেকথা বিশ্বজন মেনে নিয়েছে। লোকে বলে, অবাধ অবৈধ প্রেম নাকি ঐ দেশেই সব চেয়ে বেশি। আমি কিছু বলতে নারাজ, তবে একটা কথা জানি। ডিভোর্স বা লগ্নচ্ছেদ ফরাসীরা নেক্‌নজরে দেখে না। পারিবারিক শান্তি ও শিশুদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তারা বড়ই সচেতন। স্বামী-স্ত্রী দুজনাই কিঞ্চিৎ অসংযমী হলে ফরাসী সমাজ সয়ে নেয়, কিন্তু তারা একে অন্যকে ডিভোর্স করতে চাইলে সমাজ অসন্তুষ্ট হয়।

ইয়োরোপের উন্নত দেশগুলো যেস্থলে গিয়ে পৌঁচেছে আমরাও একদিন সেখানে গিয়ে পৌঁছব, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না (অবশ্য তার অর্থ এ নয় যে, আমি ইয়োরোপের প্রেম তথা বিবাহ-পদ্ধতির নিন্দা করছি। বস্তুত বাইরের অন্য সভ্যতা অন্য

ঐতিহ্যের মানুষ হয়ে আমার পক্ষে ইয়োরোপীয় সভ্যতা বিচার করতে যাওয়া খুব যুক্তিসঙ্গত নয়। যাঁরা আমার চেয়ে বহু ঊর্ধ্বে উঠে প্রকৃত সত্য দেখতে পান তাঁরাই বোধহয় অনাসক্তভাবে আপন দেশ ও বিদেশ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করবার অধিকার ধরেন)। এদেশের ঐতিহ্য তাকে প্রেম বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপারে অন্য প্যাটার্ন বানাতে শেখাবে—এই আমার বিশ্বাস।

* * *

যে ফরাসী যুবতী কয়েকটি তরুণকে হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়ে সদুপদেশ দিচ্ছিলেন তাঁর কথাগুলো শুনে আমি আমোদ অনুভব করছিলুম। তরুণীদের ভাবভঙ্গি কথাবার্তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল তাঁরা যুবতীটিকে প্রেমের ভুবনে রীতিমত 'সাকসেসফুল' বা বিজয়িনী বলে মনে করছিলেন। তিনি খাচ্ছিলেন কন্যাক্ ও চেসার, অতি ধীরে মন্থরে। অর্থাৎ সামান্য কয়েক ফোঁটা কন্যাক্ পান করে সঙ্গে সঙ্গে অন্য গেলাস থেকে এক ঢোক জল। এই জল কন্যাক্‌কে chase করে নিয়ে যায় বলে একে বলে 'চেসার'। যুবতীটি যে পান বাবদে শুধু সমজদার তাই নয়, আমার মনে হল তিনি এ বাবদে পরিপূর্ণ আত্মকর্তৃত্বও বজায় রাখেন।

লম্বা হোল্ডারে সিগরেট ধরিয়ে ঊর্ধ্বপানে ধুঁয়োর একসারি চক্কর চালান করে বললেন, 'লেয়োঁ ব্লুমের কেতাবখানা মন দিয়ে পড়ো। বিবাহ সম্বন্ধে তিনি অনেক খাঁটি কথা বলেছেন।' ব্লুম একদা ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি তাঁর বইয়ে বলেন, প্রেম, যৌনজীবন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ যুবক-যুবতীর বিবাহ সাধারণত তাদের জীবনে দীর্ঘকালব্যাপী দাম্পত্য সুখশান্তি দিতে পারে না। উচিত, উভয় পক্ষেরই এসব বিষয়ে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর বিয়ে করা। বলা বাহুল্য, এ বই প্রকাশিত হলে ইংলন্ডের অনেকেই এটাকে 'শকিং' 'গর্হিত' বলে নিন্দা করেছিলেন।

সুন্দরীটি ব্লুমের মূল বক্তব্য প্রাঞ্জল ভাষায় পেশ করে বললেন, 'দেখো, আমি নিজে বিশ্বাস করি, নারী-পুরুষ দুই যুযুধান শক্তি, একে অন্যের শত্রু—'

একটি তরুণী কফির ঢোক গিলতে গিয়ে মারাত্মক বিষম খেয়ে বললে, 'আপনি এ কি কথা বলছেন! কবি দুর্গ্যা এখনো আপনার কথা ভুলতে পারেন নি—আপনি তাঁকে বিদায় দেওয়ার পরও। এখনো তাঁর মুখে ঐ এক মন্ত্র : আপনার মত প্রাণ-মন, সর্বহৃদয়, সর্বস্ব দিয়ে এরকম আত্মহারা হয়ে কেউ কখনো ভালোবাসতে পারে নি।'

যুবতী স্মিত হাস্যভরা চোখে তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেচারি আঁদ্রে! তোমার এখনো অনেক-কিছু শেখবার বাকি আছে। আমি আর্টিস্ট। আমি যা-ই করি নে কেন, সেটাকে পরিপূর্ণতার চরমে পৌঁছিয়ে দিয়ে করি। যখনই ভালোবেসেছি, 'আত্মহারা' হয়েই ভালোবেসেছি। কিন্তু ডার্লিং, ইহুদিও কি তার ব্যবসা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আত্মহারা হয়ে ভালোবাসে না? তাই বলে সে কি তার মুনাফার কথা ভুলে যায়? যে ব্যবসাকে সে আপন প্রিয়ার চেয়েও বেশি ভালোবাসে তাকে সে অকাতরে বিসর্জন দেয় না, যদি দেখে সেটা দেউলে হয়ে যাওয়ার উপক্রম?

তাই বলছিলুম, পুরুষ রমণীর শত্রু। যে কোনো পুরুষ আমাকে 'আত্মহারা' হয়ে ভালোবাসলেও একদিন সে আমাকে অকাতরে বিসর্জন দিতে পারে—আমি যে-রকম মঁসিয়ো দুর্গ্যাকে দিয়েছিলুম। অবশ্য আমি স্যাডিস্ট নই, তাই তাকে ড্রপ করার সময় যতদূর সম্ভব মোলায়েমভাবে সেটা সম্পাদন করি—তদুপরি বলা তো যায় না, কখন কাকে আবার প্রয়োজন হয়!'

আরেকটি তরুণী বললে, 'কিন্তু দাস্তে—?'

মাদাম বললেন, 'ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি—যদিও ওঁর কাব্য আমার প্রেমপত্রে কাজে লেগেছে। ঐ ধরনের মানুষ আমি দেখি নি। তবে এইটুকু বলতে পারি, যারা কারও বিরহে বা মৃত্যুতে দীর্ঘদিন ধরে আপসা-আপসি করে, সেটা শুধু তাদের আত্মম্ভরিতা। নিজের কাছে স্বীকার করতে চায় না যে, এইবারে তার অন্য ব্যবসা ফাঁদা উচিত। মনস্তত্ত্বে ওদের বলা হয় ম্যাজোকিস্ট্—নিজেকে নিজে কষ্ট দিয়ে সুখ পায়। ঐ যে-রকম অনেক সর্বত্যাগী অনাহারে থেকে সুখ পান! তোমার আমার স্বাস্থ্য আছে, ক্ষুধা আছে, আমরা নর্মেল্। খাদ্য যখন রয়েছে তখন উপোস করবো কোন দুঃখে?'

'তবে কি একনিষ্ঠ প্রেম বলে কিছুই নেই?'

'কী উৎপাত! কে বললে নেই? নিশ্চয়ই আছে। যখন যাকে ভালোবাসবে তখন তার প্রতি একনিষ্ঠ হবে, আঁদ্রের ভাষায় আত্মহারা হবে। একাধিক জনের সঙ্গেও অক্লেশে একনিষ্ঠ হওয়া যায়। ঐ তো আমার এক বন্ধু ছিলেন লিয়োঁতে। সেখানে মাঝে মাঝে উইক-এন্ড করতে যেতুম। চমৎকার কথাবার্তা বলতে জানেন। বাড়িটিও সুন্দর। প্যারিসে প্রতি বৃহস্পতিবারে আমার ফ্ল্যাটে আসতেন আরেক বন্ধু। উনি বিবাহিত। অন্য সময় সুযোগ পেতেন না। তা ছাড়া চাকরির উন্নতির জন্য অফিসের এক বৃদ্ধ কর্তার সঙ্গে তাঁর মোটরে মাঝে মাঝে বেরুতে হত। তিনি আবার ভয়ানক ভীতু। যদি কেউ দেখে ফেলে! তাই রাত্রে মোটরে করে শহর থেকে দূরে যেতে হয় তাঁর সঙ্গে। এদের প্রত্যেককে যদি একনিষ্ঠভাবে না ভালোবাসি তবে—ঐ যে বললুম পুরুষ মাত্রই শত্রু—সে শত্রু ধরে ফেলবে না আমার ভারসেটাইলিটি—বহুমুখী প্রতিভা? শুনেছি এবং বিশ্বস্তসূত্রেই, যে রসরাজ কবি, যোদ্ধা, ঔপন্যাসিক, শাসনকর্তা দান্‌দ্‌জিয়ো একসঙ্গে একগণ্ডা সুন্দরীর সঙ্গে একনিষ্ঠ প্রেমের উচ্চাঙ্গ সাধনা করেছেন, তিনি একই সময়ে চারজনকে যে চার সিরিজ প্রেমপত্র লিখেছেন, তার প্রত্যেকটি অতিশয় অরিজিনাল মাধুর্যময় কবিত্বপূর্ণ—কোনো সিরিজের সঙ্গে কোনো সিরিজের সাদৃশ্য নেই। প্রত্যেকটি বল্লভা আপন সিরিজ পেয়ে ধন্য হয়েছেন।'

তারপর আরেক তরুণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্যুজান্, তুমি এ লাইন ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেল। পল্ আর মার্সেল তোমাকে একই সময়ে ভালোবাসতো, আর তুমি মাত্র দুটোকে সামলাতে পারলে না? হায়! প্যারিস কোথায় এসে পৌঁচচ্ছে? আর ডার্লিং স্যুজান, তুমি নাকি জানতেও না, পল্ আর মার্সেল উভয়েরই যখন আরেক প্রস্থ প্রিয়া ছিল!'

স্যুজান্ তাজ্জব মেনে বললো, 'তাই নাকি, মঁ দিয়ো!'

নানেৎ বললে, 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল? দ্বিধা করে সিধা রাখো?'

মাদাম বললেন, 'ও! তা কেন? মেনাজ্ আ ত্রোয়া (menage a trois = management by three) যদিও এখন ফ্রান্সে একটু আউট অব ডেট্—তবু তিনজনে মিলেমিশে থাকাটা ট্রায়েল পেতে পারে, কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, শান্তিভঙ্গ যেন না হয়, নো স্ক্যান্ডাল, প্লীজ! আব ডুয়েল, খুন, আত্মহত্যা এগুলো তো বর্বরতার চরম—ভুল বললুম, বর্বরদের ভিতর এসব অপ্রিয় ঘটনা প্রায় কখনোই ঘটে না। এগুলো ঘটলে মনের অশান্তি খানিকটে হয় বটে, কিন্তু তার চেয়ে মারাত্মক বদনাম ছড়ায় ভবিষ্যতের বিয়ের বাজারে। অবশ্য এমন কোনো বদনাম নেই যেটা আস্তে আস্তে মুছে ফেলা যায় না। এবং

কোনো কোনো স্থলে একাধিক পুরুষ আকৃষ্ট হয় 'ফাম্ ফাতাল্' (fatal woman),'বিপজ্জনক রমণী'র প্রতি।'

ইনি তাঁদেরই একজন কিনা সেটা জানবার কৌতূহল আমার পক্ষে স্বাভাবিক।

ইতিমধ্যে তাঁর কন্যাক শেষ হয়ে গিয়েছে দেখে গুটিতিনেক তরুণী একসঙ্গে ওয়েটারকে ডাকলে। যুবতী রাজ-রাজেশ্বরীর মত বাঁ হাতখানা দিয়ে যেন বাতাসের একাংশ দু'টুকরো করে অসম্মতি জানালেন, বললেন, 'সুইট্ অব্ ইউ, কিন্তু জানো তো, আমার সোনার খনিতে এখন ডবল শিফ্‌টে কাজ চলছে। দ্বিতীয় শিফ্‌টায় আমি অবশ্য অনেকখানি সাহায্য করি। এমনিতেই আমি একগাদা টাকার কুমীরকে চিনতুম, এখন আমার 'মারী' (স্বামী) প্রতি রাত্রেই দু-একটি নয়া নয়া বাঘ-ভাল্লুক শিকার করছেন, আমাকে তাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে। —তোমরা বরঞ্চ শ্যামপেন খাও।'

তরুণীদের একাধিকজন আনমনা হয়ে ভাবলে, তাদের জীবনে এ সুদিন আসবে কবে?

হঠাৎ যেন বিজয়িনীর একটি গভীর তত্ত্বকথা মনে পড়লো। গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু যাদুরা, একটি কথা মনের ভিতর ভালো করে গেঁথে নিয়ো। ব্লুম এটা বলেন নি। সর্বপ্রেমের চরম গতি যখন পতিলাভ তখন সে-পথে নামবার আগে একটি মোক্ষম তত্ত্ব ভুললে চলবে না। ব্লুম বলেছেন, প্রথম ইদিক-উদিক প্রেম এবং ফ্যাকট্‌স অব্ লাইফ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর, ইংরিজিতে পুরুষের বেলা যাকে বলা হয় 'বুনো ভুট্টা বপন'—সেইটে হয়ে গেলে পর বিয়ে করবে। তাহলে একে অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা হবে অনেক বেশি, একে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে অনেক বেশি—দাম্পত্যজীবন তাই হবে দীর্ঘকালব্যাপী ও মধুর। ব্লুমের উদ্দেশ্য অতিশয় মহৎ এ-বিষয়ে কেউ সন্দেহ করবে না। আমি তো নিশ্চয়ই করবো না, কারণ তিনি অতিশয় নীতিবাগীশ—'

কোরাস উঠলো তাবৎ তরুণী-কণ্ঠে, 'কি বললেন, মাদাম?'

কণামাত্র বিচলিত না হয়ে মহিলাটি ধীরেসুস্থে আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করে বললেন, 'কট্টর নীতিবাগীশ, ধর্মভীরু, আচারনিষ্ঠ এবং ছিন্নভিন্ন উদ্দেশ্যহীন ফরাসী সমাজকে নৈতিক দৃঢ়ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যগ্র। তিনি ইহুদি, এবং অনেকেই যে রকম তাঁর ইহুদি-ভ্রাতা ফ্রয়েট্‌কে ভুল বোঝে, এঁর বেলাও তাই হয়েছে। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনি এবং জানি তিনি নীতি, মরালিটিতে অতিশয় আস্থাবান। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, প্রাচীন নীতি পরিবর্তন করে—বরং বলবো সেটাকে পরিপূর্ণভাবে কার্যকরী ও কল্যাণময়ী করে সম্পূর্ণতর করে তোলবার জন্য নবীন নীতির প্রয়োজন। তিনি সেইটে প্রবর্তন করতে চান। কিন্তু এই নবীন নীতি প্রবর্তন করতে পারি শুধু আমরা ফরাসীরাই। যেরকম আমরাই সর্বপ্রথম ফরাসীবিদ্রোহ করে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা প্রবর্তন করি। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ, এমন কি জর্মনিরও লাগবে এ নীতি গ্রহণ করতে অন্তত একশ বছর। তারা তো এখনো গণতন্ত্রটাই রপ্ত করতে পারেনি। আর যেসব দেশ ধর্ম উৎপাদন করেছে—যেমন প্যালেস্টাইন, আরবদেশ, ইন্ডিয়া, এরা এ নীতি কখনো গ্রহণ করতে পারবে না, আর যদি করে তবে তাদের সর্বনাশ হবে।'

আমি মনে মনে সম্পূর্ণ সায় দিলুম। এবং যোগ দিলুম, হয়তো চীন পারবে।

'কিন্তু একটা প্র্যাকটিকাল উপদেশ আমি দিই। বিয়ের পূর্বের সর্ব অভিজ্ঞতা যেন বিবাহিত পুরুষের সঙ্গে হয়। তার প্রথম কারণ তারা প্রবীণতর, পক্কতর। তাদের কাছে শুধু প্রণয় নয়, জীবনের মূল্যবান আরও অনেক-কিছু শেখা যায়। কিন্তু খবরদার,

আহাম্মুকের মত কক্‌খনো তাকে বলবে না, তোমার কাউকে ডিভোর্স করে আমাকে বিয়ে করো। এক্‌স্‌পেরিমেন্টের ইঁদুরকে আকাট মূর্খও বিয়ে করে না।

আরেকটা কারণ বললে তোমাদের তরুণ-হৃদয়ে হয়তো একটু বাজবে।

ঐ বিবাহিতদেরই দু'পয়সা রেস্ত থাকে। বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে আর স্রেফ হাওয়া খেয়ে খেয়ে জীবনের কোনো অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় হয় না। সেটা হয় জনসমাজে। ক্লাব, রেস্তোরাঁ, অপ্‌রা, জুয়োর কাসিনো, রেস, রিভিয়েরা—সুইট্‌জারল্যান্ড ভ্রমণ, এগুলো না করলে, না চষলে কোনো এলেমই হয় না যেটা তোমার ভবিষ্যৎ স্বামী ও দাম্পত্যজীবনে কাজে লাগবে।

আরেকটা সুবিধে, বলা তো যায় না, তিনি যদি মাত্রা সামলাতে না পেরে তোমাকে বিয়ে করতে চেয়ে বসেন, তুমি তখন অতিশয় ব্রীড়া সহকারে বলতে পারবে, "আমি চাই নে যে আপনার স্ত্রীকে ডিভোর্স করে আপনি একটি পরিবার নষ্ট করুন।"

এবং শেষ সুবিধে, যেদিন তুমি কেটে পড়তে চাইবে, সেদিন স্বচ্ছন্দে বলতে পারবে, "আমারও তো সংসার পাততে হবে, আমারও তো সমাজের প্রটেকশন দরকার", তারপর ব্লাশ করে বলবে, "আমিও তো, আমিও তো মা হতে চাই।"

কি বলবো পাঠক, সে যা অনবদ্য অভিনয় করলেন সেই বিবাহিতা যুবতীটি—আহা, যেন ষোল বছরের তরুণীটি, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না। ধন্য নটরানী প্যারিস, ধন্য তোমার অভিনয়, ধন্য তোমার নব মরালিটি! সাধে কি লোকে বার বার বলে, 'সী প্যারিস অ্যান্ড ডাই!' প্যারিস দেখার পর পৃথিবীতে দেখবার মত তার তো কিছু থাকে না।

তবে আমার অনুরোধ, অন্যান্য বহু বস্তু নির্মাণ করার সময় ফ্রান্সে আইনত যেমন ছাপ মারতে হয়, 'নট্ ফর্ একস্‌পোর্ট'—'বিদেশে চালান নিষিদ্ধ', এই নব মরালিটির উপরও যেন তেমনি ছাপটি সযত্নে মারা হয়।

তবে আমি এটি আমদানি করলুম কেন? বুঝিয়ে বলি। বিদগ্ধা যুবতীটি যা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছিলেন আমি তার সহস্রাংশের একাংশও বলি নি। আমি শুধু সেইটুকুই বলেছি, যেটুকু আপনার জানা থাকলে যদি কখনো প্যারিসের ঐ নব মরালিটিটি এদেশে চোরাবাজার দিয়ে বা স্মাগল্‌ড্ হয়ে চলে আসে তবে যেন তৎক্ষণাৎ সেটি চিনতে পারেন।

চার্লি চ্যাপলিন এই কর্মটি করেছিলেন। অনেকেই তাঁর 'মঁসিয়ো ভের্দু' ছবি দেখেছেন। চ্যাপলিনের পূর্বেও তাঁর সময়ে ইয়োরোপের কোনো কোনো দার্শনিক সাড়ম্বর প্রচার করেন, জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ যেন সর্বাস্ত্র প্রয়োগ করে সর্ব প্রতিদ্বন্দ্বীকে 'অর দ্য কঁবা'—দরকার হলে খতম করে দেয়। সেই হাস্যাস্পদ দর্শনের বেকুব চরম পরিণতি প্রমাণ করার জন্য চ্যাপলিন দেখান কি-ভাবে একজন লোক একটার পর একটা ধনী প্রাপ্তবয়স্ক রমণীকে বিয়ে করে তাকে সুকৌশলে খুন করে অর্থসঞ্চয় করতে থাকে। কিন্তু খুনের কৌশলটি ছবিতে দেখান নি।

আমিও বিদগ্ধা প্যারিসিনীর আসল অস্ত্রটির রহস্য সযত্নে গোপন রেখেছি।

[দু'হারা—রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড]

দাম্পত্য জীবন

যাঁদের ঝড়তি-পড়তি মালা কুড়িয়ে নিয়ে ভাঙিয়ে খাচ্ছি—অর্থাৎ 'পঞ্চতন্ত্র' তৈরি করছি তাঁদের সঙ্গে 'দেশে'র পাঠক-পাঠিকার যোগসূত্র স্থাপন করার বাসনা এ-অধমের প্রায়ই হয়। তাঁদেরই একজন আমার এক চীনা-বন্ধু। সত্যকার জহুরী লোক—লাওৎসে, কনফুৎসিয়ে টৈ-টম্বুর হয়ে আছেন। তত্ত্বালোচনা আরম্ভ হলেই শাস্ত্রবচন ওষ্ঠাগ্রে। আমি যে পদে পদে হার মানি সে-কথা আর রঙ-ফুলিয়ে, তুলি-বুলিয়ে বলতে হবে না।

ক্লাবের সুদূরতম প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি নিমগাছের তলায় বসে তিনি আপিস ফাঁকি দিয়ে চা পান করেন। তাঁর কাছ থেকে আমি এস্তার এলেম হাঁসিল করেছি—তারই একটা আপিস ফাঁকি দেওয়া। কাছে পৌঁছতেই একগাল হেসে নিলেন—অর্থ সুস্পষ্ট—ছোকরা কাবেল হয়ে উঠছে। আর ক'দিন বাদেই আপিস-যাওয়া বিলকুল বন্ধ করে পুরো তনখা টানবে।

ইতিমধ্যে এক ইংরেজও এসে উপস্থিত।

রসালাপ আরম্ভ হল। কথায় কথায় বিবাহিত জীবন নিয়ে আলোচনা। সাহেব বললে, 'লন্ডনে একবার স্বামীদের এক আড়াই মাইল লম্বা প্রসেশন হয়েছিল, স্ত্রীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য। প্রসেশনের মাথায় ছিল এক পাঁচ ফুট লম্বা টিঙটিঙে হাড্ডি-সার ছোকরা। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই, ছ'ফুট লম্বা ইয়া লাশ এক ঔরৎ দুমদুম করে তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললে, 'তুমি এখানে কেন, তুমি তো আমাকে ডরাও না। চলো বাড়ি। সুড়সুড় করে ছোকরা চলে গেল সেই খাণ্ডার বৌয়ের পিছনে পিছনে।'

আমার চীনা বন্ধুটি আদত-মাফিক মিষ্টি মৌরী হাসি হাসলেন। সায়েব খুশী হয়ে চলে গেল।

গুটিকয়েক শুকনো নিমপাতা টেবিলের উপর ঝরে পড়ল। বন্ধু তাই দিয়ে টেবিলক্লথের উপর আলপনা সাজাতে সাজাতে বললেন, 'কী গল্প! শুনে হাসির চেয়ে কান্না পায় বেশি।' তারপর চোখবন্ধ করে বললেন,

'চীনা গুণী আচার্য সূ তাঁর প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে লিখেছেন, একদা চীন দেশের পেপিং শহরে অত্যাচার-জর্জরিত স্বামীরা এক মহতী সভার আহ্বান করেন। সভার উদ্দেশ্য, কি প্রকারে নিপীড়িত স্বামীকুলকে তাঁদের খাণ্ডার গৃহিণীদের হাত থেকে উদ্ধার করা যায়?

'সভাপতির সম্মানিত আসনে বসানো হল সবচেয়ে জাঁদরেল দাড়িওয়ালা অধ্যাপক মাওলীকে। ঝাড়া ষাটটি বছর তিনি তাঁর দজ্জাল গিন্নীর হাতে অশেষ অত্যাচার ভুঞ্জেছেন সে কথা সকলেরই জানা ছিল।

'ওজস্বিনী ভাষায় গম্ভীর কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষে বক্তার পর বক্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আপন আপন অভিজ্ঞতা বলে যেতে লাগলেন। স্ত্রীলোকের অত্যাচারে দেশ গেল, ঐতিহ্য গেল, ধর্ম গেল, সব গেল, চীন দেশ হটেনটটের মুল্লুকে পরিণত হতে চলল, এর একটা প্রতিকার করতেই হবে! ধন-প্রাণ, সর্বস্ব দিয়ে এ অত্যাচার ঠেকাতে হবে। এস ভাই, এক জোট হয়ে—

এমন সময় বাড়ির দারোয়ান হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, "হুজুররা এবার আসুন। আপনাদের গিন্নীরা কি করে এ সভার খবর পেয়ে ঝাঁটা, ছেঁড়া জুতো, ভাঙা ছাতা ইত্যাদি যাবতীয় মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এদিকে ধাওয়া করে আসছেন।"

যেই না শোনা, আর যাবে কোথায়? জানলা দিয়ে, পেছনের দরজা দিয়ে, এমন কি ছাত ফুটো করে, দেয়াল কানা করে দে ছুট! দে ছুট! তিন সেকেন্ডে মিটিঙ সাফ—বিলকুল ঠাণ্ডা!

কেবলমাত্র সভাপতি বসে আছেন সেই শান্ত গম্ভীর মুখ নিয়ে—তিনি—বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নি। দারোয়ান তাঁর কাছে ছুটে গিয়ে বার বার প্রণাম করে বলল, "হুজুর যে সাহস দেখাচ্ছেন তার সামনে চেঙ্গিস খানও তসলীম ঠুকতেন, কিন্তু এ তো সাহস নয়, এ হচ্ছে আত্মহত্যার শামিল। গৃহিণীদের প্রসেশনের সক্কলের পয়লা রয়েছেন আপনারই স্ত্রী। এখনো সময় আছে। আমি আপনাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।" সভাপতি তবু চুপ। তখন দারোয়ান তাঁকে তুলে ধরতে গিয়ে দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ ঠাণ্ডা। হার্ট ফেল করে মারা গিয়েছেন।'

আচার্য উ থামলেন। আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে 'সাধু সাধু', 'শাবাস, শাবাস' বললুম। করতালি দিতে দিতে নিবেদন করলুম, 'এ একটা গল্পের মত গল্প বটে।'

আচার্য উ বললেন, 'এ বিষয়ে ভারতীয় আপ্তবাক্য কি?'

চোখ বন্ধ করে আল্লা রসুলকে স্মরণ করলুম, পীর দরবেশ গুরু ধর্ম কেউই বাদ পড়লেন না। শেষটায় মৌলা আলীর দয়া হল!

হাত জোড় করে বরজলালের মত ক্ষীণ কণ্ঠে ইমন কল্যাণ ধরলুম।

শ্রীমন্মহারাজ রাজাধিরাজ দেবেন্দ্রবিজয় মুখ কালি করে একদিন বসে আছেন ঘরের অন্ধকার কোণে। খবর পেয়ে প্রধান মন্ত্রী এসে শুধালেন, 'মহারাজের কুশল তো?' মহারাজ রা কাড়েন না। মন্ত্রী বিস্তর পীড়াপীড়ি করাতে হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন, 'ঐ রানীটা—ওঃ কি দজ্জাল, কি খাণ্ডার! বাপরে বাপ। দেখলেই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে।'

মন্ত্রীর যেন বুক থেকে হিমালয় নেমে গেল। বললেন, 'ওঃ! আমি ভাবি আর কিছু। তাতে অত বিচলিত হচ্ছেন কেন মহারাজ। বউকে তো সব্বাই ডরায়—আম্মো ডরাই। তাই বলে তো আর কেউ এরকমধারা গুম হয়ে বসে থাকে না।'

রাজা বললেন, 'ঐ তুমি ফের আরেকখানা গুল ছাড়লে।' মন্ত্রী বললেন, 'আমি প্রমাণ করতে পারি।' রাজা বললেন, 'ধরো বাজি।' 'কত মহারাজ! দশ লাখ?' 'দশ লাখ।'

পরদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরে ঢোল পেটানোর সঙ্গে সঙ্গে হুকুমজারি হল—বিষ্যুদবার বেলা পাঁচটায় শহরের তাবৎ বিবাহিত পুরুষ যেন শহরের দেয়ালের বাইরে জমায়েত হয়; মহারাজ তাদের কাছ থেকে একটি বিষয় জানতে চান।

লোকে লোকারণ্য। মধ্যিখানে মাচাঙ—তার উপরে মহারাজ আর মন্ত্রী। মন্ত্রী চেঁচিয়ে বললেন, 'মহারাজ জানতে চান তোমরা তোমাদের বউকে ডরাও কি না। তাই তাঁর হয়ে আমি হুকুম দিচ্ছি যারা বউকে ডরাও তারা পাহাড়ের দিকে সরে যাও আর যারা ডরাও না তারা যাও নদীর দিকে।'

যেই না বলা অমনি হুড়মুড় করে, বাঘের সামনে পড়লে গোরুর পালের মত, কালবৈশাখীর সামনে শুকনো পলাশ পাতার মত সবাই ধাওয়া করলে পাহাড়ের দিকে, একে অন্যকে পিষে, দলে, থেঁৎলে—তিন সেকেন্ডের ভিতর পাহাড়ের গা ভর্তি।

বউকে না-ডরানোর দিক বিলকুল ফর্সা। না, ভুল বললুম। মাত্র একটি রোগা টিঙটিঙে লোক সেই বিরাট মাঠের মধ্যিখানে লিক্‌লিক্ করছে।

রাজা তো অবাক। ব্যাপারটা যে এরকম দাঁড়াবে তিনি তার কল্পনাও করতে পারেন নি। মন্ত্রীকে বললেন, 'তুমিই বাজি জিতলে। এই নাও দশ লখা হার।' মন্ত্রী বললেন, 'দাঁড়ান, মহারাজ। ঐ যে একটা লোক রয়ে গেছে।' মন্ত্রী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। কাছে এলে বললেন, 'তুমি যে বড় ওদিকে দাঁড়িয়ে? বউকে ডরাও না বুঝি?'

লোকটা কাঁপতে কাঁপতে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললে, 'অতশত বুঝিনে, হুজুর। এখানে আসবার সময় বউ আমাকে ধমক দিয়ে বলেছিল, "যেদিকে ভিড় সেখানে যেয়ো না।" তাই আমি ওদিকে যাই নি।'

আচার্য উ আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'ভারতবর্ষেরই জিৎ। তোমার গল্প যেন বাঘিনী-বউ। আমার গল্প ভয়ে পালালো।'

তবু আমার মনে সন্দ রয়ে গিয়েছে। রসিক পাঠক, তুমি বলতে পারো কোন্ গল্পটাকে শিরোপা দি?

[পঞ্চতন্ত্র-১ম—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

কি কায়দায় আলাপ হয়েছিল সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ছোকরা আইন পড়ে।

একদিন বললে 'চ, একটা ইনট্রেসটিং মোকদ্দমা হচ্ছে।' এদেশের নিয়ম, আইন পরীক্ষা দেবার পূর্বে ছ'বার না দশবার—আমার সঠিক মনে নেই—আদালতে হাজিরা দিতে হয়, বোধ হয় সরকারী উকিলের অ্যাসিসট্যান্ট রূপে দু'চারবার কাগজপত্রও দুরস্ত করে দিতে হয়।

সুইস্ আদালত আদৌ ভীতি উৎপাদক নয়। কেমন যেন ঘরোয়া-ঘরোয়া ভাব।

অথচ মোকদ্দমাটা বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে এক যুবতী। সুন্দরী বলা চলে না, সাদামাটা, তবে দেখতে ভালই। এবং তার চেয়ে বড় কথা, মেয়েটি বেশ স্বাস্থ্যবতী। মুখের রঙটি যেন শিশিরে ভেজা। জানা গেল, মেয়েটি সুইস ইতালিয়ান।

দোস্ত ফিস্ ফিস্ করে বললে, 'জানিস তো, জাতে সুইস হলেও এই ইতালিয়ানরা একটু আনস্টেডি—' অর্থাৎ ''উড্‌ক্কু' ভাব ধরে।

প্রেমট্রেমের ব্যাপার আদালত সংক্ষেপেই সারে। তবে এ-স্থলে বিবরণীটি নিশ্চয়ই কোনও রোমান্টিক ছোকরা পুলিশ লিখেছিল। প্রেমটা হয়েছিল গভীরই। প্রতি ছুটির দিনে উইক-এন্ড, এমন কি কাজকর্মের ফাঁকে-ফিকিরে সিনেমা-কাবারে-সুইমিং পুল। বেশ স্ফূর্তিতে কেটেছে দিনগুলো—কোনও সন্দেহ নেই। এবং কোনও সন্দেহ নেই মেয়েটাই মজেছিল মরমে মরমে।

সরকারি উকিল গলাখাঁকরি দিয়ে বললেন, 'এবং খর্চাটা মেয়েটির কষ্টে জমানো টাকা থেকে।'

আমার কান ছিল বিবরণীর দিকে, চোখ মেয়েটির পানে। এতক্ষণ তার মুখে কোনও ভাবের পরিবর্তন হয়নি। এবারে তার ঠোঁটের কোণে যেন ঈষৎ অসহিষ্ণুতার ভাব দেখা গেল। ...উকিল পড়ে যেতে লাগলেন, 'দুর্ভাগ্যক্রমে আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। প্রকাশ, ছেলেটা প্রতিজ্ঞা করেছিল, আসামীকে বিয়ে করবে। আসামীর পিতামাতা ধর্মভীরু, সেও প্রতি রববারে গীর্জেয় যেত। আসামী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে জানামাত্রই ছেলেটা পালায়!'

এবারে বিবরণী প্রথম পুরুষে—মেয়েটির বাচনিক।

'আমার এই বিপদে আমাকে সাহায্য করবার মত সে-শহরে কেউ ছিল না; জমানো কড়িও ফুরিয়ে গিয়েছে। তখন স্থির করলুম, গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবা-মাকে সব খুলে বলবো। তাঁরা আঘাত পাবেন জানতুম, কিন্তু এছাড়া আমি অন্য পথ খুঁজে পেলুম না।

বাড়ি ফিরে যে অবস্থা দেখলুম তাতে বাবা-মাকে সব কিছু খুলে বলার সাহস আমার আর রইল না। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমার দু বছরের ছোট বোনটি—সেও শহরে গিয়েছিল কাজ নিয়ে, সেও ফিরে এসেছে পেটে বাচ্চা নিয়ে। তাকে কে দাগা দিয়েছে শুধোইনি। আমি কী কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়েছি সে শুধু আমিই জানি। সে বাবা-মাকে সব খুলে বলেছে। আমাকে বললে, তাঁরা বড় আঘাত পেয়েছেন, কিন্তু তাকে গ্রহণ করেছেন, বাচ্চাটাকেও মানুষ করবেন।

আমি তখন করি কি? দু'দুটো মেয়ে কুপথে গেল—অথচ তাঁরা কত যত্নেই আমাদের মানুষ করেছিলেন। আমি তাঁদের কি করে বলি, আমিও কুপথে গিয়েছি। আর দু'দুটো বাচ্চা তাঁরা পুষবেনই বা কি করে?

আমি স্থির করলুম, আমার বাচ্চাটাকে আমি বিসর্জন দেব। হাজার হোক, আমার ছোট বোন। তার হক্ক বেশি। আমি তাকে ভালোবাসি। আমি তাকে সাহায্য করতে চাই। —সে বেচারি একেবারে ভেঙে পড়েছে। আমিও যদি মুখে কলঙ্কের ছোপ মাখি তবে তার হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে লড়াই দেব কি করে?

আমি মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলুম। যে যেন একেবারে পাষাণ হয়ে গিয়েছে।

এবারে সরকারী উকিল বললেন, 'নদীপারে নির্জনে আসামী বাচ্চা প্রসব করে তাকে জলে ফেলে দেয়।' তারপর একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু সেখানে আর কেউ ছিল না বলে প্রমাণ করা অসম্ভব না হলেও সুকঠিন, বাচ্চাটা মৃতাবস্থায় জন্মেছিল কি না।'

সমস্ত আদালত-ঘর নিস্তব্ধ, নীরব।

এইবারে প্রথম জজ মুখ খুললেন। সামনের দিকে শূন্য দৃষ্টি ফেলে শুধোলেন, 'বাচ্চাটা জন্মের সময় জীবিত না মৃত ছিল?'

মেয়েটি একবার মুখ তুলে তাকিয়ে ফের মাথা নিচু করলো। বললে, আমি সত্যই শপথ করে বলতে পারবো না। আমি—আমার—আমি তখন সব-কিছু বুঝতে পারিনি।'

আশ্চর্য, জজ তো নয়-ই, সরকারী উকিল পর্যন্ত কোনও রকম জেরা বা চাপাচাপি করলেন না, প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করার জন্য। কারণ এটা তো আইনত স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বাচ্চা জ্যান্ত জন্মে থাকলে এটা খুন—হয়তো মারডার নয়, ম্যানস্লটার—আর মৃতাবস্থায় জন্মে থাকলে বা জন্মের পরেই যদি মরে গিয়ে থাকে তবে বাচ্চা প্রসবের কথা পুলিশকে জানায়নি বলে অপরাধটা কঠিন নয়—হাইডিং অব্ এভিডেন্‌স্, সত্য তথ্য নির্ধারণের প্রমাণ গোপন করেছে শুধু।

মোকদ্দমা এখানেই শেষ বলা যেতে পারে। কিন্তু জজ তবু একটা প্রশ্ন শুধোলেন, 'আচ্ছা, তুমি সেই ছেলেটার সন্ধান নিলে না কেন? তাকে বিয়ে করাতে বাধ্য করালে না কেন?'

কুণ্ডুলি পাকানো গোখরো সাপ যে রকম হঠাৎ ফনা তুলে দাঁড়ায় মেয়েটা ঠিক সেই রকম বলে উঠলো, 'কী! সেই কাপুরুষ—যে আমাকে অসহায় করে ছুটে পালালো! তাকে বিয়ে করে আমার বাচ্চাকে দেব সেই কাপুরুষের, সেই পশুর নাম!' তারপর দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললে। গোঙরানোর শব্দ কানে এল।

আমি তার মুখের দিকে আর তাকিয়ে থাকতে পারিনি।

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণায় পরিণত হতে পারে তার বিকৃত মুখে দেখলুম—পূর্বেও দেখিনি, পরেও দেখিনি।

আমি বসেছিলাম একেবারে দরজার পাশে। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলুম।

দু'দিন পরে দোস্তের সাথে ফের দেখা।

বললে, 'ছোঃ, তুই বড্ড কাঁচা। পালালি?'

'কি সাজা হল?'

'চার মাস। কিন্তু জেলে যেতে হবে না। গাঁয়ের পাদ্রি সাহেবের কাছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে হাজিরা দিতে হবে—গুড্ কনডাকটের রিপোরট দেবার জন্য। আদালত বললেন, 'সমস্ত পরিবার যে বদনামের পাবলিসিটি পেল, সে-ই যথেষ্ট সাজা—আর যার ফাঁসি হওয়া উচিত সে তো আদালতে নেই।'

প্রেম যে কী দ্বেষ, কী ঘৃণার—

[রাজাউজির—রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড]

চুম্বন

আমাদের মুকদ্‌দসী কিন্তু আর্‌ট্‌ কি, অলঙ্কার কাকে বলে, আর্‌ট্‌ অনুভূতিপ্রধান না তাতে অন্য কোনও মনোবৃত্তি চিত্তবৃত্তি প্রবেশ করতে পারে কিনা সে নিয়ে কোনও আলোচনা করতে চাইতো না, পারতোও না। এ কিছু নূতন তত্ত্ব নয়। মা-ঠাকুরমার রূপকথা শুনে আমরা, হ্যাঁ, বয়োবৃদ্ধরা পর্যন্ত বিমোহিত হয়ে ভাবি, রূপকথা কল্পনা করার, তাকে অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশ করার রহস্যটা কোন্‌খানে। প্রশ্ন শুধিয়ে দেখি ঠাকুরমাও জানেন না। মুকদ্‌দসীর বেলাও হুবহু তাই।

শুধু একটি কথা মাঝে মাঝে মাথা দোলাতে দোলাতে বলতো, কবি হওয়ার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে হে, কবি হওয়ার একটা বিশেষ মূল্য আছে। সে মূল্য কিন্তু অর্থ, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কোনও-কিছুর মাপকাঠি দিয়েই বিচার করা যায় না। কোন্‌ এক ইরানী কবি নাকি পেয়েছিলেন লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা, দানতে পেয়েছিলেন বেয়াৎরিচের কাছ থেকে একটি ফুল, কিংবা কি জানি, কার ঠোঁটের কোণে স্বীকৃতির একটুখানি স্মিতহাস্য, কি জানি—।'

* * *

কবি মুকদ্‌দসী বড় স্পর্শকাতর। সে আরব। ইহুদিদের কাছে তারা নির্দয়ভাবে লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছে। তাকে চিঠি লিখেছি, 'সখা তুমি ইহুদিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হাইনরিষ হাইনে পড়ো।'

* * *

যে একেরমান গ্যোটের সঙ্গে কথোপকথনের বিবৃতি দিয়ে বিশ্ববিখ্যাত হন তিনি ছাত্রাবস্থায় গ্যোটিঙেন শহরে হাইনের বন্ধুত্ব লাভ করেন। এক জহুরিকে চিনতে অন্য জহুরির বেশিক্ষণ সময় লাগেনি। প্রথম দর্শনেই প্রেম হয়।

ছাত্রাবস্থাতেই হাইনের সরল মধুর কবিতা জরমনির সর্বত্র খ্যাতিলাভ করে। অতিশয় সাধারণ জন-দফতরের কেরানী, ম্যাট্‌রিকের মেয়ে, ছাপাখানার ছোকরা—তাকে যেন দু-বাহু মেলে আলিঙ্গন করে নেয়। আর ওদিকে বন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত আলঙ্কারিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ফন্‌ শ্লেগেল তো তাকে প্রথম দিনই বিজয় মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন।

ঘটনাটির বর্ণনা দিয়েছেন একেরমান; ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪। তারপর সেটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে।

গ্যোটিঙেন থেকে ঘোড়ার গাড়িতে ঘণ্টাখানেকের পথ—লানট্‌ভের বিয়েরগারটেন। খোলামেলাতে বিয়ারের আড্ডা। রববার দিন গ্যোটিঙেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সেখানে এসে জালা জালা বিয়ার খায়, হইহুল্লোড় করে, আর নৃত্যগীত তো লেগেই আছে।

একেরমান, হাইনে এবং কলেজের আরও কয়েকজন ইয়ার বক্‌সী গেছেন সেখানে ফুর্তি করতে।

হাইনে আগের থেকেই মৌজে—বোধ হয় হামবুর্গের ব্যাঙ্কার কাকার কাছ থেকে বেশ কিছু পেয়েছেন।[১] তিনি ছেড়ে দিয়েছেন তাঁর আনন্দোল্লাসের লাগাম—বাক্যস্রোত ছুটেছে তুরুক সোওয়ারের মত। বিয়ার তাদের টেবিলে নিয়ে এসেছে পাব্‌-এর খাবসুরুত

---

১ টাকাকড়ি বাবদে হাইনে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অত্যন্ত বেহিসেবী। তিনি স্বয়ং এক জায়গায় লিখেছেন, কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।

কোমলাঙ্গী তরুণী লটে (Lotte), হাইনে ফুর্তির চোটে জড়িয়ে ধরেছেন সুন্দরী লটেকে। কিন্তু একেরমান ও অন্যান্য ইয়াররা পূর্বাভিজ্ঞতা থেকে জানতেন, এই লটেটি বিয়ারখানার আর পাঁচটা বার্-গার্লের মত ঢলাঢলির পাত্রী নয়। রাগে তার বাঁশির মত নাকের ডগাটি হয়ে গেছে টুকটুকে রাঙা, চোখ দিয়ে বেরুচ্ছে আগুনের হল্কা, আর সে এমনই ধস্তাধস্তি আর পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়তে আরম্ভ করেছে যে ইয়ারগোষ্ঠী কানে আঙুল দিয়ে চেপে ধরেছেন। হাইনে ওটা মস্করা হিসেবেই ভেবে নিয়েছিলেন গোড়ার দিকে, কিন্তু একটু পরেই কি যেন ভেবে অপ্রতিভ হয়ে চুপ মেরে গেলেন—যেন কি করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।[১]

পরের সপ্তাহে একেরমানরা যখন হাইনেকে তুলে নিয়ে এলেন, তখন তিনি তাঁদের সঙ্গে যেতে কবুল নারাজ। শেষটায় একরকম গায়ের জোরে জাবড়ে ধরে তাঁকে গাড়িতে তুলতে হল।

কাফেতে আসন নিয়ে হাইনে মাথা হেঁট করে রইলেন চুপ। ঘাড় তুলে মেয়েটির দিকে তাকাবার মত সাহস পর্যন্ত তাঁর নেই।

কিন্তু কী আশ্চর্য। লটে স্বয়ং এসে উপস্থিত হাইনেদের টেবিলে। মধুর হাসি হেসে হাইনের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালে। ইয়ার-দোস্তরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

লটে হাইনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমার উপর রাগ করবেন না, স্যর। আপনি অন্য ছাত্রদের মত নন। আমি আপনার কবিতা পড়েছি। কী সুন্দর! কী সুন্দর! আপনার যদি ইচ্ছে যায়, তবে এই সব ভদ্রলোকের সামনাসামনি আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন—কিন্তু ঐসব মধুর কবিতা আপনাকে রচনা করে যেতেই হবে।'

বলেই লটে তার গাল বাড়িয়ে দিলে হাইনের দিকে।

আর হাইনে?—কে জানতো হাইনের মত সপ্রতিভ লোকও লজ্জায় লাল হয়ে যেতে পারেন—লজ্জায় লাল হয়ে তিনি চুমো খেলেন।

একেরমান বলেছেন, 'লক্ষ্য করলুম (নটবর) বন্ধু স্পিটা হিংসেয় একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।'

* * *

হাইনের চোখ দুটি ভিজে গিয়েছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এ জীবনে এর চেয়ে সুখী আমি আর কখনও হইনি। এই আমি প্রথম হৃদয়ঙ্গম করলুম, কবি হওয়ার মূল্য আছে, কবি হওয়া সার্থক।'

* * *

সখা মুকদ্দসী, কবি হওয়া সার্থক।

[রাজাউজির—রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড]

১ কনটিনেনটের ছাত্র-পাবে এ ঘটনা নিত্য-নিত্য ঘটে। কেউ বড় একটা সিম্পিয়াসলি নেয় না। চেঁচামেচিটা অনেক ক্ষেত্রেই 'ন্যাকরা' বলে ধরা হয়।

লেডি চ্যাটারলি

নিমিত্ত মাত্র। আসলে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীলে কি কোনো পার্থক্য নেই? যদি থাকে তবে তার বিভাগ করবো কোন্ সংজ্ঞা দিয়ে? আর যদি করা যায় তবে পুলিশের সাহায্য নিয়ে অশ্লীল জিনিস বন্ধ করবো, না অন্য কোনো পন্থা আছে?

এ প্রশ্ন আজ এই প্রথম ওঠে নি সেকথা সবাই জানেন, এবং এ কথাও নিশ্চয়ই জানি যে, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান কোনো দিনই হবে না—যতদিন মানুষ গল্প লিখবে, ছবি আঁকবে, একে অন্যের সঙ্গে কথা কইবে, এমন কি অঙ্গভঙ্গি করবে (অধুনা কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে কোনো নর্তকীর নৃত্য দেখে পুলিশ বলে, এগুলো অশ্লীল, নর্তকী ও ম্যানেজার বলেন, ওগুলো উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা, আদালত বলেন, মহিলাটির নৃত্যের পিছনে বহু বৎসরের একনিষ্ঠ কঠোর সাধনা রয়েছে এবং সে নৃত্য কলাসৃষ্টি)।

লেডি চ্যাটারলি খালাস পেলে পর বিলেতে এ নিয়ে প্রচুর তোলপাড় হয়—অবশ্য স্মরণ রাখা ভালো যে, মার্কিন আদালতে লেডি চ্যাটারলির লয়ার ('লাভার' না লিখে আমেরিকা 'লয়ার'—'উকিল' লিখেছিল) পূর্বেই জিতে গিয়েছিলেন, এবং গত ত্রিশ বৎসর বইখানা কন্টিনেন্টের সর্বত্রই ইংরিজীতেও অনুবাদে পাওয়া যেত। আরো মনে রাখা ভালো যে, এসব বাবদে ইংরেজ সব চেয়ে পদী পিসি মার্কা, অর্থাৎ গোঁড়া। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। লেঁও ব্লুম্ যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি একখানা বই বের করেন, নাম 'মারিয়াজ'—বিবাহ। ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গোছের বই—যদিও ব্লুমের মূল বক্তব্য ভূদেববাবুর ঠিক উল্টো। নানা কথার ভিতর তাঁর অন্যতম মূল্য বক্তব্য ছিল, যুবক-যুবতীরা বিয়ের পূর্বে পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা করে নিয়ে বিয়ে করলেই ভালো—তা হলে একে অন্যকে বোঝার সুবিধে হয়, বিবাহবিচ্ছেদের আশঙ্কা কমে যায় (!!)। ইংরেজ সমালোচক তখন বলেছিলেন যে, ইংলন্ডের কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি আপন নামে এরকম একখানা বই প্রকাশ করতেন তবে পরের দিনই তাঁকে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে হত।

তাই চ্যাটারলি জিতে যাওয়ার পর একাধিক প্রাচীনপন্থী বললেন,

(১) এ বইয়ে যে 'নৈতিক আদর্শ' প্রচারিত হয়েছে সেটা ইংরেজের যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিক ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে ও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী এতে করে মর্মাহত হবেন।

(২) এ বইয়ের অনুকরণে যদি বিলাতের যুবক-যুবতীরা তাদের যৌন আদর্শ নির্মাণ করে তবে দেশের সর্বনাশ হবে।

(৩) এ বই আইনে জিতে যাওয়ায় এর অনুকরণে—লাই পেয়ে—অশ্লীলতর ও জঘন্যতর বই বাজার ছেয়ে ফেলবে।

(৪) এ বই জিতে যাওয়ায় সাহিত্যিক তথা সাধারণ নাগরিক আইন-রাজ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু নীতির রাজ্যে সে পিছিয়ে গেল। দা-কাটা বাঙলায়;—আইনের জয়, ধর্মের পরাজয়।

নবীনরা বললেন,

(১) স্ত্রী-পুরুষের যে সম্পর্ক গোঁড়া ইংলন্ড বড় জোর বরদাস্ত করে নিত, লরেন্স যার সত্য মূল্য দেখিয়ে (কোনো কোনো সমালোচক 'স্পিরিচুয়াল' পর্যন্ত বলেছেন) সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছেন তারই জয় হয়েছে।

(২) বাজারে যখন ভূরি ভূরি অশ্লীল পাপ, পৈশাচিক উত্তেজনাদায়ক বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে তখন লরেন্সের এই উত্তম সাহিত্য নির্বাসিত করা শুধু যে আহাম্মুকী তা নয়, অন্যায়ও বটে।

(৩) শক্তিশালী সত্যোন্মোচনকারী লেখকদের এখন আর পুলিশের ভয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় বর্জন করতে হবে না।

(৪) অশ্লীল কদর্য পুস্তক কামকে কর্দমের স্তরে টেনে নামিয়ে আনে। লরেন্সের বই তাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছে।

সংস্কৃত অলঙ্কারে শ্লীল অশ্লীল নিয়ে কিছুটা আলোচনা আছে। কিন্তু আইন করে কোনো বই বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে শুনি নি। হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বুদ্ধের আমলেই সংস্কৃত সাধারণ জনের পক্ষে কঠিন ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে; সে ভাষা আয়ত্ত করতে করতে মানুষের এতখানি বয়েস হয়ে যেত যে, তখন কি পড়ছে না পড়ছে তার দায়িত্ব তারই হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু আরবীতে লেখা আরব্যোপন্যাস? সে তো অল্প আরবী শেখার পরেই পড়া যায়। বাজারে যে আরবারজনী ইংরিজী বা বাঙলাতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা হচ্ছে না; তথাকথিত 'আপত্তিজনক' অংশগুলো সেগুলোতে নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হয়। বারো না আট ভলুমে বার্টনের যে ইংরিজী অনুবাদ আছে তাতেও তিনি হিমসিম খেয়ে 'আনট্রেন্‌স্‌লেটেবল' বলে বেশ কিছু বাদ দিয়েছেন। এমন কি বাইরুতে ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারা প্রকাশিত আরবী আরব্যরজনীতেও বিস্তর জিনিস বাদ পড়েছে। এবং আরবভূমিতে ছেলেবুড়ো সবাই পড়ে সেই সম্পূর্ণ সংস্করণ—কেউ কিছু বলে না।

ফার্সীতে লেখা জালালউদ্দীন রূমীর মস্‌নবী গ্রন্থের উল্লেখ করতে পেলে আমি বড় আনন্দ বোধ করি। এ বই ইরানের গীতা এবং এতে হেন পাপাচার নাই যার বিশদ বিবরণ নেওয়া হয় নি। ইংরিজীতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদক সেসব অংশ লাতিনে অনুবাদ করেছেন। (সংস্কৃত শিখতে শিখতে মানুষ যে রকম হয়ে যায় এবং ধরে নেওয়া হয় তার শাস্ত্রাধিকার হয়েছে—লাতিনের বেলাও তাই।) অথচ ইরান ভূমিতে আট বছরের ছেলেও যদি মস্‌নবী নিয়ে বসে, পিতা এবং গুরু তাতে আনন্দিত হন।

বাংলা গদ্য আরম্ভ হয় 'পরিষ্কার হাত' নিয়ে এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখতে পাই, ভারতচন্দ্র অশ্লীল আখ্যা পাচ্ছেন। ভিক্টোরিয় যুগের ছুঁৎবাই তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। এরই মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ 'চৌরপঞ্চাশিকা' গীতিকাব্যের উদ্দেশে গেয়ে উঠলেন,

'ওগো সুন্দর চোর
বিদ্যা তোমার কোন সন্ধ্যার
কনক-চাঁপার ডোর।'

(১৩০৪ সন) কল্পনা।

ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' রচেছেন এই চৌর-পঞ্চাশিকার প্লট নিয়েই এবং এ কাব্যের বাংলা অনুবাদও করেছেন। এরকম অনবদ্য খণ্ডকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল।

শ্লীল অশ্লীলে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। এমন কি কাব্য অশ্লীল না হয়েও অনুচিত হতে পারে। অনেকে মনে করেন, স্বয়ং কালিদাস এ পার্থক্য জানতেন না। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ সম্বন্ধে কবিরাজ রাজেন্দ্রভূষণ বলেছেন, 'জগন্মাতা ও জগৎপিতার এই সম্ভোগ একটা বিরাট ব্যাপার হইলেও, পড়িতে লজ্জা

জন্মে। তাই আলঙ্কারিকগণ এই অষ্টম সর্গের উপর "অত্যন্তমনূচিতম্" বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তবে চিত্রের জন্য যেমন চিত্র দেখা, তেমনই এই হরপার্বতীর বিহার পাঠ, ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার বস্তু প্রচুর। কবির এই আলেখ্য দেখিয়া চমকাইলে, মহামায়ার "বিপরীতরতাতুরাম্" এই ধ্যানাংশেরও পরিহাস করিতে হয় এবং আদিকবি বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাস্তবের "তুঙ্গস্তনাস্ফালিতম্" প্রভৃতি অংশ বাদ দিতে হয়। কাব্য কাব্য, তাহা উপনিষদের চক্ষে দেখিতে যাঁহারা চান বা দেখেন, তাঁহাদের উহা না পড়াই ভালো'*

কালিদাসের তুলনায় বামন লরেন্স্ নাকি কামকে স্বর্গীয় (স্পিরিচুয়াল) স্তরে তুলতে চেয়েছিলেন! তা তিনি চেয়েছিলেন কিনা, পেরেছিলেন কিনা সে কথা আমি জানি না,—তবে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাস চেয়েছিলেন এবং তাই জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্যপ্রেম বর্ণনা করেছিলেন। কারণ কামকে যদি সত্যই পূতপবিত্র করতে হয়, তবে সর্ব দেশকালপাত্রে পূজ্য পিতামাতা এবং তাঁদেরও পূজ্য জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্য প্রেমের চেয়েও উচ্চতর লোক তো আর কোথাও নেই।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো আলঙ্কারিকের মতে তিনি সক্ষম হন নি, কারণ তাঁরা বলেছেন, কালিদাস 'অত্যন্ত অনুচিত' কর্ম করেছেন। পড়ার সময় 'লজ্জাবোধ' সত্ত্বেও বিদ্যাভূষণ কিন্তু তাঁর নিন্দা করেন নি। পড়ার সময় আমার সঙ্কোচ বোধ হয় নি, কারণ প্রতি ছত্রে আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম, কালিদাস আমাকে তাঁর অতুলনীয় কাব্যসৃষ্টি প্রসাদাৎ সর্বশেষে আমাকে এমন দ্যোলোকে উড্ডীয়মান করে দেবেন যেখানে কামের পার্থিব মলিনতার কথা আমার স্মরণেই থাকবে না। হয়তো আমি অক্ষম, কিংবা কালিদাসের সে শক্তি ছিল না। ব্যাসের যে সে শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাম সম্বন্ধে ব্যাসের মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না বলে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

রচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে নিবেদন,

ইয়োরোপের অনুকরণে যদি আমরা অত্যধিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে কামকে সাহিত্য থেকে তাড়িয়ে দিই তবে নিছক নির্জলা অশ্লীল রচনা উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে। আর্টের কাজ তাকে আর পাঁচটা বিষয়বস্তুর মত আপন কাব্যলোকে রসস্বরূপে প্রকাশ করা। কালিদাস করেছেন, চুড় কবি করেছেন, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র করেছেন।

অশ্লীল সাহিত্য তাড়াবার জন্য পুলিশ সেন্সর বোর্ড বিশেষ কিছু করতে পারবে না। মার্কিন মুল্লুকে তারা আপন হার মেনে নিয়েছে। বিশেষত সাহিত্যিকরাই যখন শ্লীল অশ্লীলে ঠিক কোথায় পার্থক্য সে জিনিসটা সংজ্ঞা এবং বর্ণনা দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেন নি।

সংস্কৃত আরবী ফার্সীতে নিছক অশ্লীল রচনা অতি অল্প। তার কারণ গুণীজ্ঞানীর রুচিবোধ ও সাধারণ জনের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-বোধ (কমন সেন্স্)। নির্ভর করতে হবে প্রধানত এই দুটি জিনিসের উপর।

পাঠক হয়তো শুধোবেন, চ্যাটারলি বইখানা আমি পড়েছি কিনা? পড়েছি। যৌবনে প্যারিসে কাফেতে বসে পড়েছি। ভালো লাগে নি। লরেন্স্ যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে অতি সাধারণ জিনিস। এবং ঐ অতি সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন বিরাট বিরাট কামান। এবং কামানগুলো পরিষ্কার নয়।

[ভবঘুরে ও অন্যান্য—রচনাবলী সপ্তম খণ্ড]

* পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ২য় ভাগ, বসুমতী পৃ ১৫৫ পাদটীকা।

'নেভা'র রাধা

অনেক প্রেমের কাহিনী পড়েছি, এমন সব দেশে বহু বৎসর কাটিয়েছি যেখানে প্রেমে না পড়াতেই ব্যত্যয়—তাই চোখের সামনে দেখেছি প্রেমের নিত্য নব প্যাটার্ন—কিন্তু একটা গল্প আমি কিছুতেই ভুলতে পারি নে। তার প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে গল্পটি বলেছেন ওস্তাদ তুর্গেনিয়েফ। এবং শুধু তাই নয়—ঘটনাটি তাঁর নিজের জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছিল।

দস্তয়েফস্কি, তলস্তয়ের সৃজনীশক্তি তুর্গেনিয়েফের চেয়ে অনেক উঁচুদরের, কিন্তু তুর্গেনিয়েফ যে স্বচ্ছসলিল ভঙ্গিতে গল্প বলতে পারতেন, সেরকম কৃতিত্ব বিশ্বসাহিত্যে দেখাতে পেরেছেন অতি অল্প ওস্তাদই। তুর্গেনিয়েফের শৈলীর প্রশংসা করতে গিয়ে এক রুশ সমঝদার বলেছেন, 'তাঁর শৈলী যেন বোতল থেকে তেল ঢালা হচ্ছে—ইট ফ্লোজ্ লাইক্ অয়েল।'

তুর্গেনিয়েফ ছিলেন খানদানী ঘরের ছেলে—তলস্তয়েরই মত। ওরকম সুপুরুষও নাকি মস্কো, পিটার্সবুর্গে কমই জন্মেছেন। কৈশোরে তাঁর একবার শক্ত অসুখ হয়। সেরে ওঠবার পর ডাক্তার তাঁকে হুকুম দেন নেভা নদীর পারে কোনো জায়গায় গিয়ে কিছুদিন নির্জনে থাকতে। নেভার পারে এক জেলেদের গ্রামে তুর্গেনিয়েফ পরিবারের জমিদারি ছিল। গ্রামের এক প্রান্তে জমিদারের একখানি ছোট্ট বাঙলো—চাকর-বাকর নিয়ে ছোকরা তুর্গেনিয়েফ বাঙলোয় গিয়ে উঠলেন।

সেই ছবিটি আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। জমিদারের ছেলে, চেহারাটি চমৎকার আর অসুখ থেকে উঠে সে চেহারাটি দেখাচ্ছে করুণ, উদাস-উদাস, বেদনাতুর। তার উপর তুর্গেনিয়েফ ছিলেন মুখচোরা এবং লাজুক, আচরণে অতিশয় ভদ্র এবং নম্র। আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, গ্রামে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছে—জেলে-মেয়েরা দূর থেকে আড়নয়নে দেখছে তুর্গনিয়েফ মাথা নিচু করে, দুহাত পিছনে একজোড় করে নদীর পারে পাইচারি করছেন। জরাজীর্ণ গ্রামে হঠাৎ যেন দেবদূত নেমে এসেছেন।

মেয়েরা জানে এরকম খানদানী ঘরের ছেলে তাদের কারও দিকে ফিরেও তাকাবে না, কিন্তু তা হলে কি হয়, তরুণ হৃদয় অসম্ভব বলে কোনো জিনিস বিশ্বাস করে না। সে রববারে জেলে-তরুণীরা গির্জায় গেল দুরুদুরু বুক নিয়ে—বড়দিনের ফ্রক-ব্লাউজ পরে।

তরুণীদের হৃদয় ভুল বলে নি। অসম্ভব সম্ভব হল। তুর্গেনিয়েফ মেয়েদের দিকে তাকালেন। তাঁর মনও চঞ্চল হল।

তুর্গেনিয়েফ পষ্টাপষ্টি বলেন নি, কিন্তু আমার মনে হয় মস্কো পিটার্সবুর্গের রঙ-মাখানো গয়না-চাপানো লোক-দেখানো সুন্দরীদের নখরা-ককেট্‌রি তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে দিয়েছিল বলে তিনি জেলে-গ্রামের অনাড়ম্বর সরল সৌন্দর্যের সামনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমার মনে হয়, তুর্গেনিয়েফের কবিহৃদয় অতি সহজেই হীরার ফুল অনাদর করে বুনো ফুল আপন বুকে গুঁজে নিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য, গ্রামের সুন্দরীদের পয়লানম্বরী কাউকে তিনি বেছে নিলেন না। এই উল্টোস্বয়ম্বরে যাকে তিনি হৃদয় দিলেন সে স্বপ্নেও আশা করতে পারে নি, এই প্রিয়দর্শন তরুণটি সুন্দরীদের অবহেলা করে তাকেই নেবে বেছে। সত্য বটে মেয়েটি কুৎসিত ছিল না, এবং তার স্বাস্থ্যও ছিল ভালো; কিন্তু তাই দিয়ে তো আর প্রেমের প্রহেলিকার সমাধান হয় না।

মেয়েটির মনে যে কী আনন্দ, কী গর্ব হয়েছিল সেটা কল্পনা করতে আমার বড় ভালো লাগে। তুর্গেনিয়েফ তার অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন—নিজের জীবনে ঘটেছিল বলে হয়ত তিনি এ ঘটনাটিকে বিনা অলঙ্কারে বর্ণনা করেছেন। আমার কিন্তু ভারি ইচ্ছে হয়, মেয়েটির লজ্জা-মেশানো গর্ব যদি আরও ভালো করে জানতে পারতুম—তুর্গেনিয়েফ যদি আরও একটুখানি ভালো করে তাঁর হৃদয়ের খবরটি আমাদের দিতেন।

শুধু এইটুকু জানি, মেয়েটি দেমাক করে নি। ইভানকে পেয়ে সে যে-লোকে উঠে গিয়েছিলে সেখানে তো দেমাক দম্ভের কথাই উঠতে পারে না। আর তুর্গেনিয়েফ হিংসা, ঈর্ষা থেকে মেয়েটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন অন্য মেয়েদের সঙ্গে অতি ভদ্র মিষ্ট আচরণ দিয়ে—কোনো জমিদারের ছেলে নাকি ওরকমধারা মাথা থেকে হ্যাট তুলে নিচু হয়ে জেলেনীদের কখনো নমস্কার করেনি।

কৈশোরের সেই অনাবিল প্রেম কিরূপে আস্তে আস্তে তার বিকাশ পেয়েছিল, তুর্গেনিয়েফ তার সবিস্তার বর্ণনা দেন নি—তাই নিয়ে আমার শোকের অন্ত নেই।

দুজনে দেখা হত। হাতে হাত রেখে তারা নদীর ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকত। চাঁদ উঠত। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করলে তুর্গেনিয়েফ তাঁর ওভারকোট দিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে দিতেন। সে হয়তো মৃদু আপত্তি করত—কিন্তু নিশ্চয়ই জানি ইভানের কোনো ইচ্ছায় সে বেশিক্ষণ বাধা দিতে পারত না।

তুর্গেনিয়েফ সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন। বাড়ি থেকে হুকুম এসেছে প্যারিস যেতে।

বিদায়ের শেষ সন্ধ্যা এল। কাজ সেরে মেয়েটি যখন ছুটে এল ইভানের কাছ থেকে বিদায় নিতে, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

অন্ধোরে নীরবে কেঁদেছিল শুধু মেয়েটি। তুর্গেনিয়েফ বারে বারে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন 'তুমি এরকমধারা কাঁদছো কেন? আমি তো আবার ফিরে আসব—শিগগিরই। তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে, তুমি ভাবছ, আমি আর কখনও ফিরে আসব না।'

কিন্তু হায়, এসব কথায় কি ভাঙা বুক সান্ত্বনা মানে? জানি তুর্গেনিয়েফের তখনো বিশ্বাস ছিল তিনি ফিরে আসবেন কিন্তু যে ভালোবেসেছে সমস্ত সত্তা সর্বৈব অস্তিত্ব দিয়ে তার হৃদয় তো তখন ভবিষ্যৎ দেখতে পায়—বিধাতাপুরুষেরই মত।

তুর্গেনিয়েফ বললেন, 'তোমার জন্য প্যারিস থেকে কি নিয়ে আসব?'

কোনো উত্তর নেই।

'বল কি নিয়ে আসব?'

'কিচ্ছু না—শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'কিছু না? সে কি কথা? আর সবাই তো এটা, ওটা, সেটা চেয়েছে। এই দেখো, আমি নোটবুকে সব কিছু টুকে নিয়েছি। কিন্তু তোমার জন্য সব চেয়ে ভালো, সব চেয়ে দামী জিনিস আনতে চাই। বলো কি আনব?'

'কিচ্ছু না।'

তুর্গেনিয়েফকে অনেকক্ষণ ধরে পীড়াপীড়ি করতে হয়েছিল, মেয়েটির কাছ থেকে কোন একটা কিছু একটার ফরমাইশ বের করতে। শেষটায় সে বললে, 'তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান নিয়ে এসো।'

তুর্গেনিয়েফ তো অবাক। 'এই সামান্য জিনিস! কিন্তু কেন বলো তো, তোমার আজ সাবানে শখ গেল? কই তুমি তো কখনো পাউডার সাবানের জন্য এতটুকু মায়া দেখাও নি—তুমি তো সাজগোজ করতে পছন্দ কর না।'

নিরুত্তর।

'বলো।'

'তা হলে আনবার দরকার নেই।' তারপর ইভানের কোলে মাথা রেখে কেঁদে বলল, 'ওগো, শুধু তুমি ফিরে এসো।'

'আমি নিশ্চয়ই সাবান নিয়ে আসব। কিন্তু বল, তুমি কেন সুগন্ধি সাবান চাইলে?'

কোলে মাথা গুঁজে মেয়েটি বলল, 'তুমি আমার হাতে চুমো খেতে ভালোবাসো আমি জানি। আর আমার হাতে লেগে থাকে সব সময় মাছের আঁশটে গন্ধ। কিছুতেই ছাড়াতে পারি নে। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি সব গন্ধ কেটে যায়। তখন চুমো খেতে তোমার গন্ধ লাগবে না।'

অদৃষ্ট তুর্গেনিয়েফকে সে গ্রামে ফেরবার অনুমতি দেন নি।

সে দুঃখ তুর্গেনিয়েফও বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি।

[ময়ূরকণ্ঠী—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

ইতিমধ্যে আমি দুম্ করে প্রেমে পড়ে গেলুম।

কবিগুরু গেয়েছেন :

যদি পুরাতন প্রেম
ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেম জালে
তবু মনে রেখো।

কিন্তু এ-আশা রাখেন নি, সেই প্রথম প্রিয়াই পুনরায় তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আমার কপাল ভালো।

লাঞ্চ সেরে মৃদুমন্থরে যখন বাড়ি ফিরছি তখন বাস্‌স্ট্যান্ডের বেঞ্চিতে বসেই দেখি বেঞ্চির অন্য প্রান্তে যে-মেয়েটি বসেছিল সে জুলজুল করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। আমার দুশমনরা তো জানেনই, এস্তেক দোস্তরাও জানেন, আমি কন্দর্পকিউপিডের সৌন্দর্য নিয়ে জন্মাই নি। তদুপরি বয়স যা হয়েছে তার হিসেব নিতে গেলে কাঠাকালি বিঘেকালি বিস্তর আঁক কষাকষি করতে হয়। সর্বশেষে সেটা ভগ্নাংশে না ত্রৈরাশিকে দিতে হবে তার জন্য প্ল্যাশেৎ মারফত ঈশ্বর সুকুমার রায়কে নন্দনকানন থেকে এই য ব ন ভূমিতে নামতে হবে।

অবশ্য লক্ষ্য করেছিলুম, আমি ওর দিকে তাকালেই সে ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে নেয়।

রোমান্টিক হবার চেষ্টাতে বলেছিলুম, "মেয়েটি।" কিন্তু তার বয়স হবে নিদেন চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ এমন কি পঞ্চাশও হতে পারে। কিন্তু তাতে কি যায় আসে। বিদগ্ধ পাঠকের অতি অবশ্যই স্মরণে আসবে, বৃদ্ধ চাটুয্যে মশাই যখন প্রেমের গল্প অবতারণা করতে যাচ্ছেন তখন এক চ্যাংড়া বক্রোক্তি করে বলেছিল[১] চাটুয্যে মশাই প্রেমের কী-ই বা জানেন। মুখে আর যে-কটা দাঁত যাবোযাচ্ছি যাবোযাচ্ছি করছে তাই নিয়ে প্রেম।

চাটুয্যে মশাই দারুণ চটিতং হয়ে যা বলেছিলেন তার মোদ্দা : ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার বস্তু যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস! প্রেম হয় হৃদয়ে! ...একদম খাঁটি কথা। ভলতের, গ্যোটে, আনাতোল ফ্রাঁস, হাইনে আমৃত্যু বিস্তরে বিস্তর বার ফট ফট করে নয়া নয়া হুরী পরীর সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। এই সোনার বাঙলাতেও দু'একটি উত্তম দৃষ্টান্ত আছে। তা হলে আমিই বা এমন কি ব্রহ্মহত্যা করেছি যে ফুট করে প্রেমে পড়বো না।

বলতে পেত্যয় যাবেন, অকস্মাৎ একই মুহূর্তে একে অন্যকে চিনে গেলুম। যেন 'আকাশে বিদ্যুৎ-বহ্নি পরিচয় গেল লেখি।'

একসঙ্গে আমি চেঁচালুম "লটে।"

সে চেঁচালে "হ্যার সায়েড।"

তারপর চরম নির্লজ্জার মত সেই প্রশস্ত দিবালোকে সর্বজনসমক্ষে আমাকে জাবড়ে ধরে দুই গালে ঝপাঝপ এক হুন্দর বা দুই টন চুমো খেল।

সুশীল পাঠক, সচ্চরিত্রা পাঠিকা, মায় দেশের মরালিটি-রক্ষিণী বিধবা পদীপিসি এতক্ষণে একবাক্যে নিশ্চয়ই নাসিকা কুঞ্চিত করে "ছ্যা ছ্যা" বলতে আরম্ভ করেছেন। আমি দোষ দিচ্ছি নে। এস্থলে আম্মো তাই করতুম—যদি না নাটকের হেরোইন আমার প্রিয়া লটে (তোলা নাম 'শাল ট') হত। বাকিটা খুলে কই।

ওর বয়স যখন নয়-দশ আমার বয়স ছাব্বিশ। আমি বাস করতুম ছোট গোডেসবের্গ টাউনের উত্তরত্তম প্রান্তে লটেদের বাড়ির ঠিক মুখোমুখি। ওদের পাশে থাকত দুই বোন

১ বইখানা আমার চুরি গেছে। কাজেই উল্টোসুল্টো হয়ে গেলে পাঠক অপরাধ নেবেন না।

গ্রেটে ক্যাটে। আরও গোটা পাঁচেক মেয়ে—তাদের বাড়ির পরে। কারোই বারো-তেরোর বেশি নয়।

লটে ছিল সবচেয়ে ছোট।

আমার জীবনের প্রথমা প্রিয়া।

আর সব কটা মেয়ে এ তথ্যটা জানতো এবং হয়তো অতি সামান্য কিছুটা হিংসে হিংসে ভাব পোষণ করতো। ওদের আশ্চর্য বোধ হত হয়তো, যে লটে তো ওদের তুলনায় এমন-কিছু গুলেবাকাওলী নয় যে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এসে আমি এরই 'প্রেমে মজে যাবো'। এটা অবশ্য আমি বাড়িয়ে বলছি। 'প্রেমে মজার' কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার বয়স ছাব্বিশ, ওর নয় কি দশ।

আসলে ব্যাপারটি কি জানেন? জর্মনদের ভিতর যে-চুল অতিশয় বিরল, লটের ছিল সেই চুল। দাঁড়কাকের মত মিশমিশে কালো একমাথা চুল। ঠিক আমার মা-বোনদের চুলের মত। ওর চুলের দিকে তাকালেই আমার মা-বোনেদের কথা, দেশের কথা মনে পড়তো। আর লটে ছিল আমার বোনেদের মত সত্যই বড় লাজুক। সক্কলের সামনে, নিজের থেকে, আমার সঙ্গে কক্‌খনো কথা বলতো না।

আমাদের বাড়ির সামনে ছিল একচিলতে গলি। সেখানে রোজ দুপুর একটা দুটোয় আমরা ফুটবল খেলতুম। আমার বিশ্বাস তুমি পাঠক, আমাদের সে টিমের নাম জানো না। আমিও অপরাধ নেবো না। আমরা যে আই এফ এ শীল্‌ডে লড়াই দেবার জন্য সে আমলে ভারতবর্ষে আসি নি তার মাত্র দুটি কারণ ছিল। পয়লা : এতখানি জাহাজ ভাড়ার রেস্ত আমাদের ছিল না, এবং দোসরা : আমাদের 'কাইজার টীমে' পুরো এগারো জন মেম্বার ছিলেন না। আমরা ছিলুম মাত্র আষ্টো জন। তৃতীয়ত, যেটা অবশ্য আমাদের ফেভারেই যায়, আমাদের ফুটবলটি ছিল অনেকটা বাতাবী নেবুর মত। ওরকম ফুটবল দিয়ে কি সমদ, কি জুম্মা খান কক্‌খনো প্যাটার্ন-উইভিং ড্রিবলিং ডজিং ডাকিঙের সুযোগ পান নি।

হায়, হায়! এ-জীবনটা শুধু সুযোগের অবহেলা করে করেই কেটে যায়।

এসব আত্মচিন্তা যে তখন করেছিলুম তা নয়।

চল্লিশ বছর পর পুনরায় এই প্রথম আমাদের পুনর্মিলন। লটে হঠাৎ শুধুলো, "হ্যার সায়েড! তুমি বিয়ে করেছো?"

শুনেছি ইহুদীরা নিতান্ত গঙ্গাযাত্রার জ্যান্ত মড়া না হলে কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন শুধিয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা দেয়। আমি শুধলুম, "তুই?"

খল খল করে হেসে উঠলো।

"কেন? আমার আঙুলে এনগেজমেন্ট রিং বিয়ের আংটি দুটোই এখনো তোমার চোখে পড়ে নি! আমি তো দিদিমা হয়ে গিয়েছি। চলো আমাদের বাড়ি।"

আমি সাক্ষাৎ যমদর্শনের ন্যায় ভীত চকিত সন্ত্রাসগত হয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠলুম, "সে যদি আমায় ঠ্যাঙায়?"

দুটি মিষ্টি মধুর ঠোঁটের উপর অতিশয় নির্মল মৃদু হাসি এঁকে নিয়ে বললে, "বটে! আমার জীবনের প্রথম প্রিয়কে সে প্যাঁদাবে? তা হলে সেই হালুকেটাকে আমি ডিভোর্স করবো না!"

তওবা, তওবা!

[মুসাফির—রচনাবলী সপ্তম খণ্ড]

নয়রাট

দেশভ্রমণের সময় যারা ছন্নের মতো ছুটোছুটি করে—অর্থাৎ সকালে মিউজিয়ম, দুপুরে চিত্রশালা, বিকেলে গির্জেদর্শন, সন্ধ্যায় অপেরা, রাতদুপুরে কাবারে, আমি তাদের দলে নেই। দেশে ফেরার পর কোনো পাক্কা টুরিস্ট যদি আশ্চর্য হয়ে বলেন, 'সে কি হে? তুমি প্রাগে তিন দিন কাটালে অথচ বলছ রাজা কার্লের বর্মাভরণ-অস্ত্রশস্ত্রের মিউজিয়াম দেখ নি—এ তো অবিশ্বাস্য', আমি তাহলে তা নিয়ে তর্কাতর্কি করি নে কারণ মনে মনে জানি আমি প্রত্যেকটি কড়ির পুরো দাম তোলার জন্য দেশভ্রমণে বেরই নি। ছ পয়সার টিকিট আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত নিয়ে যায়—আমি নামব হেদোয়—তাই আমাকে শ্যামবাজার পর্যন্ত গিয়ে সেখানে নেমে, পায়ে হেঁটে ঘষটাতে ঘষটাতে হেদোয় এসে বেঞ্চিতে বসে ধুঁকতে হবে নাকি? আট নম্বরের জুতো ছ টাকায় দিচ্ছে বলে আমার ছ-নম্বরী পা-কে আট-নম্বরী পরাতে যাব নাকি?

তাই আমার উপদেশ ও কর্মটি করতে যাবেন না। খাওয়ার যে রকম সীমা আছে, ভালো জিনিস দেখারও একটা সীমা আছে। ক্লান্তি বোধ হলেই দেখা ক্ষান্ত দিয়ে একটা কাফেতে বসে যাবেন কিংবা যদি বাগানে বসবার মতো আবহাওয়া হয় তবে বাগানে বসে কফি, চা, বিয়ার কিছু একটা অর্ডার দিয়ে সিগারেটটি ধরিয়ে আরামসে গা এলিয়ে দেবেন।

এই হল জাবর-কাটার মোকা। এ কদিনে যা কিছু দেখেছেন তার মধ্যে যে কটি মনে ঢেউ তুলেছিল সেই ঢেউগুলি গুনবেন। কিংবা বলব আপনার মনের ফিল্ম যে ছবিগুলো তুলেছিল তার গুটিকয়েক ডিভালাপ প্রিনটিং করবেন, চোখ বন্ধ করে এক-একটা দেখবেন আর মনের ঘাড় নাড়িয়ে বলবেন, উত্তম হয়েছে, খাসা হয়েছে।

আমার পাশের টেবিলে দুই পাঁড় দাবাখেলনেওলা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে দাবা খেলছিলেন। দু'কাপ কফি হিম হয়ে গিয়েছে—উপরে কফির ঘন সর পড়েছে। জামবাটি সাইজ অ্যাশ-ট্রে পোড়া সিগারেটে ভর্তি। আরও জনতিনেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলা দেখছে, কিন্তু কারও মুখে কথা নেই, এ দৃশ্য বাঙালীকে রঙ ফলিয়ে দেখাতে হবে না। কৈলাস খুড়োর যে ছবি শরচ্চন্দ্র এঁকে গিয়েছেন তার দোহার গাইবার প্রয়োজন বাঙলাদেশে বহুকাল ধরে হবে না।

খেলোয়াড়দের একজন দেখলুম ক্রমেই কোণঠাসা হয়ে আসছেন। আধ ঘণ্টাতেই কাবু হয়ে গেলেন। গজের কিস্তিতে যখন মাত হবু হবু, তখন ঘাড়গর্দানে 'শ্রাগ' করে বললেন, 'স্পাঞ্জ ফেলে দিলুম,' অর্থাৎ আমার খেলা গয়াগঙ্গাগদাধরহরি।

দর্শকদের একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন, 'কেন? ঐ বড়েটা একঘর ঠেলে দিলে হয় না?'

খাসা চাল তো! ওদিকে কারও নজরই যায় নি। এ চালে আরও খানিকক্ষণ লড়াই দেওয়া যেতে পারে।

খেলোয়াড়টি উঠে দাঁড়িয়ে সেই দর্শককে বললেন, 'আপনি তাহলে বসেন।' দর্শক তখন খেলোয়াড়রূপে বসে প্রথম সামলালেন আপন ঘর, তার পর দিতে আরম্ভ করলেন ধীরে ধীরে চাপ। স্পষ্ট বোঝা গেল ইনি উচ্চাঙ্গের লেঠেল। এবার অন্য পক্ষের প্রাণ যায় আর কি। শেষটায় তাই হল। পয়লা বারের কসাই এবারে বকরি হয়ে বললেন—যা বললেন—তার অর্থ "হরিবোল বল হরি!"

আমরা লক্ষ্য করি নি কে-ই বা এরূপ স্থলে করে—আরও জনতিনেক দর্শক তখন বেড়ে গিয়েছেন। তাঁদেরই একজন তখন মিনমিনিয়ে বললেন,'কেন, গজটা পেছিয়ে নিলে হয় না?'

এ চালের অর্থটা আমার কাছে ধরা পড়ল না। কিন্তু কসাই দেখলুম ধরতে পেরেছেন। শুধু বললেন, 'হুঁ।' তখন পয়লা বারের কসাই, দুসরা বারের বকরি উঠে বললেন, 'আপনি তা হলে বসুন।'

অর্থাৎ খোল-নলচে দুই-ই তখন বদলে গিয়েছে।

এবারে সত্যি সত্যি লাগল মোষের লড়াই।

শেষটায় খেলা চাল-মাত হল।

* * *

ফিরে এসে আপন চেয়ারে বসলুম।

খেলোয়াড়দেব একজন তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। এক চঙু-খানায় যখন এতক্ষণ একসঙ্গে আফিং খেয়েছি তখন খানিকটে পরিচয় হয়ে গিয়েছে বই কি—একটা ছোট নড্ করলুম। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে বললেন, 'সুপ্রভাত।' আমি বললুম, 'বসুন বসুন।'

ঝুপ করে বসে পড়ে বললেন, "বসুন", হুঁঃ,"বসুন"। ওদিকে আমার প্রাণ যায় আর কি?'

আমি শুধালুম, 'কেন, কি হয়েছে?' বুঝলুম লোকটি দিলখোলা।

বললেন, 'জবাই করবে, মশাই, জবাই করবে আমাকে—বউ। বলেছিলুম, এই এলুম বলে। কি করে জানব বলুন, দাবার চক্করে পড়ে যাব। বলতে পারেন, মশাই, এই বিদ্‌ঘুটে খেলা বের করেছিল কে? হাঁ, হাঁ, ভারতবর্ষেই তো এর জন্মভূমি। কিন্তু এদেশে এল কি করে?'

'শুনেছি পারসিকরা আমাদের কাছ থেকে শেখে, আরবরা তাদের কাছ থেকে, তারপর ক্রুসেডের লড়াইয়ে বন্দী ইয়োরোপীয়রা শেখে আরবদের কাছ থেকে, তারা দেশে ফিরে—'

'আমাদের মজালে। কিন্তু এখন আমার উপায় কি? আপনারা এ অবস্থায় দেশে কি করেন?'

'চাঁদ-পানা মুখ করে গাল সই।'

'ব্যস্! ব্যামোটা বাধিয়ে বসে আছেন ঠিক; ওষুধটা বের করতে পারেন নি। কিন্তু আমি পেরেছি। চলুন, আমার সঙ্গে, লঞ্চ খাবেন।'

'আর গালও খাব? না?'

'না, না, আপনাকে বকবে কেন? আমি বলব, এঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে কি করে যে বেলা বয়ে গেল ঠাহর করতে পারি নি। চলুন, চলুন আর দেরি করা নয়।'

চললুম।

ভদ্রলোকের বয়স—এই ধরুন ৪৫-৪৬। স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ, পরনে উত্তম রুচির কোট-পাতলুন-টাই। সব কিছু পরিপাটি। তাই অনুমান করলুম তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তাঁকে বকুন-ঝকুন আর যা-ই করুন না কেন, গৃহিণী হিসেবে তিনি ভালোই।

বললেন, 'যা খুশি তাই বউকে বলে যাবেন, কিচ্ছু ভয় করবেন না। তাঁকে যদি ভুলিয়ে-ভালিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুণী বানিয়ে সিংহলে পাঠিয়ে দিতে পারেন, তাতেও আমি কোনো আপত্তি করব না, কিন্তু স্যর, দয়া করে ঐ দাবা খেলার কথাটি চেপে যাবেন।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই।'

দরজা খুলে দিলেন স্বয়ং স্ত্রী। কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তার পূর্বেই ভদ্রলোক আলাপ করিয়ে দিলেন, 'ইনি আমার স্ত্রী, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা—ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা নয়রাট্‌।' আমি বললুম, 'আমার নাম আলী।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বয়স ৩৫-৩৬ হবে। সুইজারল্যান্ডে এই বয়সে মেয়েদের পূর্ণ যুবতী বলে ধরা হয়। এ-যৌবনে কুমারীর রূপের নেশা আর মাতৃত্বের মাধুরী মিশে গিয়ে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি করে তার রস মানুষ নির্ভয়ে উপভোগ করতে পারে—স্বামী সন্দেহের চোখে দেখে না, রমণী আপনার চোখে চটক লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে না। মেয়েদের আচরণ এ সময় সত্যই বড় মধুর হয়; কখনো তারা তরুণীর মতো ভাবে বিহ্বল আত্মহারা হয়ে অকারণ বেদনার কাহিনী বলে যায়, কখনো আবার মাতৃত্বের গর্ব নিয়ে আপনাকে নানা সদুপদেশ দেয়, বিয়ে-থা করে ঘর-সংসার পাতবার জন্য স্নিগ্ধচোখে অনুনয়-বিনয় করে।

স্ত্রীকে কিছু বলতে না দিয়েই হ্যার-নয়রাট্‌ বকে যেতে লাগলেন, 'বুঝলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা, আমি ঠিক সময়েই ফিরে আসতুম কিন্তু এই হ্যার আলীর সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। ইনি ভারতবর্ষের লোক—শুনেছ তো ভারতবর্ষের লোক কি রকম গুণী-জ্ঞানী হয়। ইনি তাঁদেরই একজন। তার প্রমাণও আমি হাতে-নাতে পেয়ে গিয়েছি। রাস্তায় আসতে আসতে তাঁকে জিজ্ঞেস করে জানতে পেলুম, সাতদিন ধরে এসেছেন জিনীভায়, এখনো লীগ অব নেশনসের "চিড়িয়াখানা" দেখতে যান নি, শামুনিক্‌স্‌ চড়েন নি, অপেরা-থিয়েটার কিছুই দেখেন নি। আর সব টুরিস্টদের মতো সুইটজারল্যান্ডের প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বস্তুকে পিঁপড়ে নিঙড়ে ঘি বের করাবার জন্য উঠে পড়ে লাগেন নি। আমার তো মনে হয়, এ-দেশের উচিত এঁকে এঁর খর্চার পয়সা কিছু ফেরত দেওয়া। কী বল?'

পাছে ভদ্রমহিলার অভিমানে ঘা লাগে, আমি তাঁর দেশের কুতুব তাজ ভারতীয় দম্ভের নেশায় তাচ্ছিল্য করছি তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'আমি বড় দুর্বল, বেশি ঘোরাঘুরি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ি। আস্তে আস্তে সব-কিছুই দেখে নেব।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেই ভালো। শামুনিক্‌স্‌ পাহাড় তো আর বসন্তের বরফ নয় যে দুদিনে গলে যাবে, সুইটজারল্যান্ড ভ্রমণ তো আর দাবাখেলা নয় যে সুযোগ পেয়েও দুটি কিস্তি না দিলে—'

বাকিটা আমি আর শুনতে পাই নি। আমি তখন ওয়াল-পেপার হয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে যাবার জন্য আস্তে আস্তে পিছুপা হতে আরম্ভ করেছি।

শুনি, হ্যার নয়রাট্‌ ব্যথা-ভরা সুরে বলছেন, 'গিন্নী, ছিঃ।'

আমার অবস্থা তখন এক মাতাল আরেক স্যাঙাত মাতালকে সাফাই গাইবার জন্য নিয়ে এসে ধরা পড়লে যা হয়।

নাঃ, ভুল করেছি। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার কামড়ানোর চেয়ে ঘেউ-ঘেউটাই বেশি। বললে, 'আঃ, আপনারাও যেমন। মেয়েছেলে এরকম দু-একটা কথা সব সময়েই কয়ে থাকেন—ওসব কি গায়ে মাখতে আছে? তুমি দাবা-খেলায় দু-একটা আজেবাজে চাল মাঝে মাঝে দাও না—দুশমন কি করে তাই দেখবার জন্য?'

আবার দাবা। খেয়েছে।

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা স্বামীকে বললেন, 'আজ তো লাঞ্চের ব্যবস্থা বড় মামুলী। সুপ্‌', ফিস্‌ আ লা রুস (রাশান কায়দায়) আর অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্‌ ক্রীম। তার চেয়ে বরঞ্চ

চল রেস্তোরাঁয়—জিনীভা লেকের মাছ সুইস কায়দায় রান্না—ভালোমন্দ এটা সেটা।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে শুধালেন, 'আপনি কি খেতে ভালোবাসেন?'

আমি নির্ভয়ে বললুম, 'সুপ্, ফিশ্ আ লা রুস, অ্যাপল টার্ট উইথ হুইপ্‌ট্ ক্রীম।'

হ্যার নয়রাট্ তো আনন্দে গদ্‌গদ। বললেন, 'দেখলে গিন্নী, কি রকম অদ্ভুত আদব-কায়দা। তুমি যদি বলতে আজ রেঁধেছি স্ট্রিকনিন-সুপ, পটাসিয়াম সায়ানাইড-ফ্রাইড, আর্সেনিক-পুডিং আর কোবরা-রসের কফি তা হলে উনি বলতেন "দি আইডিয়া, আমি দু বেলা ঐ জিনিস খাই"।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'দেখো, পেটার, বিশ্বসংসারের লোককে তুমি আপন মাপকাঠি দিয়ে মেপো না। তোমার মত ওঁর পেট অজুহাতের মানওয়ারী জাহাজ নয়।'

পেটার বললেন, 'সব দাবা-খেলোয়াড়কেই অজুহাত-বিদ্যে আয়ত্ত করতে হয়। বিয়ের পরেই যে রকম হনিমুন, দাবা-খেলার পরই সেই রকম অজুহাত অন্বেষণ।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমি তো দাবা খেলি নে।'

কথা শুনে দুজনাই খানিকক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষটায় পেটার বললেন, 'দেখলে গিন্নী, অজুহাতের রাজ্য কারে কয়? একদম কবুল জবাব উনি দাবা খেলেন না। বাপস! মারি তো হাতি লুটি তো ভাণ্ডার। অজুহাত যদি দিতেই হয় তবে এমন একখানা ঝাড়ব যে মানুষ রা কাড়বার ফাঁকটি পাবে না। পাক্কা আড়াই ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে দেখলেন আমাদের খেলা, আর এখন অম্লান বদনে বলছেন উনি দাবা খেলেন না!'

আমি সবিনয়ে শুধালাম, 'আপনি কনসার্ট শুনতে যান? আচ্ছা, সেখানে তো পাকি সাড়ে তিন ঘণ্টা বাজনা শোনেন; তাই বলে কি আপনি পিয়ানো, ব্যালা, চেল্লো কত্তাল বাজান?

ওদিকে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাদের তর্কাতর্কিতে কান দিচ্ছেন না, শুধু বললেন, 'তাই বলো, দাবা খেলা হচ্ছিল।'

চাণক্য বান্ধবের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'উৎসবে, বাসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে, রাজদ্বারে যে সঙ্গ দেয় সে বান্ধব। আমার বিশ্বাস চাণক্য কখনো বিয়ে করেন নি। তা না হলে তিনি 'রাজদ্বারে' না বলে 'জায়াদ্বারে' বলতেন।

জানি, অতিশয় অভদ্রতা হল—তবু বললুম, 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে।'

বন্ধুর ফাঁসিটাকে মুলতুবি করাতে পারলুম—এই বা কি কম সান্ত্বনা।

* * *

আমরা বাড়িতে রান্নাঘরের বারান্দায় বসে যেরকম হাপুসহুপুস শব্দ করে আহারাদি সমাপন করি, নেমন্তন্ন খেতে গিয়েও প্রায় সেই রকমই করে থাকি। তফাত মাত্র এইটুকু যে, বাড়িতে চিৎকার করে বলি, 'আরও দুখানা মাছভাজা দাও'; নেমন্তন্ন বাড়িতে বলি, 'চৌধুরী মশাইকে আরও দুখানা মাছভাজা দাও।'

সায়েব-সুবোদের কিন্তু বাড়ির খাওয়াতে, রেস্তোরাঁয় আহারে এবং নেমন্তন্নের ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন কায়দা-কেতায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয়। সায়েবরা বাড়িতে খেতে বসে গোগ্রাসে গোস্ত গেলে আর পোশাকী ডিনারে কিংবা ব্যানকুয়েটে একরকম না খেয়েই বাড়ি ফেরে। ব্যানকুয়েটে আপনাকে সুপ দেওয়া হবে আড়াই চামচ, তার থেকে আপনি খাবেন দেড় চামচ। ডিনারে সুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে মোলায়েম কায়দায় ঠোঁট ব্লট করবেন, কিন্তু ড্যুক অব উইন্ডসরের সঙ্গে ব্যানকুয়েট খেতে বসলে ঠোঁট ব্লট করাও নিষিদ্ধ, অর্থাৎ তখন ধরে নেওয়া হয়, আপনি এতই কম সুপ খেয়েছেন যে, আপনার

ঠোঁট পর্যন্ত ভেজে নি। তারপর পদের পর পদ উত্তম খাদ্য আসবে—আপনি আপন প্লেটে তুলে নেবেন কখনো আড়াই আউন্স, কখনো দু আউন্স এবং খাবেন তার থেকে এক আউন্স কিংবা তার চেয়েও কম। মুর্গির হাড্ডি থেকে যে ছুরি দিয়ে মাংস চাঁচবেন তার উপায় নেই এবং গ্রেভিটুকুর মোহ করেছেন কি মরেছেন। সাইড প্লেটে যে এক স্লাইস টোস্ট দিয়েছিল তার এক-দশমাংশের বেশি খেলে পাঁচজনে ভাববে, আপনি রায়লসীমার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত 'পারিয়া' কিংবা মধ্য-আফ্রিকার মিশনারি-খেকো হটেনটট্।

বিশ্বাস করবেন না, এক খানদানী ক্লাবে আমি দুই পক্ষকে পাকি দু ঘণ্টা ধরে তর্কাতর্কি করতে শুনলুম, সসেজ কি করে খেতে হয়। সমস্যাটা এইরূপ :—(ক) সসেজ থেকে ছুরি দিয়ে চাক্তি কেটে নিয়ে তার উপর মাস্টার্ড মাখাবে কিংবা (খ) প্রথম সসেজের ডগায় মাস্টার্ড মাখিয়ে নিয়ে পরে সসেজ থেকে চাক্তি কেটে তুলবে? আমি প্রথম পক্ষের হয়ে লড়াই করেছিলুম এবং শেষটায় আমরা ভোটে হেরে গেলুম। এর থেকেই বুঝতে পারছেন, আমি খানদানী খানা খেতে শিখি নি—ব্যানকুয়েটে আমার নাভিশ্বাস ওঠে।

বিশ্বাস করবেন না, মাসখানেক হল এক সুইস খবরের কাগজে দেখি, এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন, প্লেটে যে গ্রেভি পড়ে থাকে, তার উপর রুটি টুকরো টুকরো করে ফেলে সেই গ্রেভি চেটেপুটে নেওয়া (জর্মন শব্দ tunken) ব্যাকরণসম্মত—অর্থাৎ কায়দাদুরস্ত—কি না?

উত্তরে এক 'খানদানী মনিষ্যি' বলেছেন, কিছুকাল পূর্বেও এ-অভ্যাস কি বাড়িতে, কি রেস্তোরাঁয়, কি ব্যানকুয়েটে সর্বত্রই অতিশয় নিন্দনীয় বলে গণ্য করা হত, কিন্তু আজকের বিশ্বময় খাদ্যাভাবের দিনে বাড়িতে—আপন ডাইনিং রুমে কর্মটি ক্ষমার্হ।

মুর্গির ঠ্যাংটি হাতে তুলে নিয়ে 'কড়কড়ায়তে, মড়মড়ায়তে' বাড়িতে বেশির ভাগ ইউরোপীয়ই করে, কিন্তু বাইরে নৈব নৈব চ। তবে কোন কোন জর্মন এবং সুইস্ রেস্তোরাঁয় রোস্ট সার্ভ করবার সময় মুর্গির ঠ্যাংগুলো উপরের দিকে সাজিয়ে রাখে এবং ঠ্যাংগুলোর ডগায় বাটার পেপারের ক্যাপ পরিয়ে দেয়, যাতে করে আপনি হাত নোংরা না করে ঠ্যাংটা চিবুতে পারেন। এ ব্যবস্থা দেখে ইংরেজের জিভে জল আসে, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে বলে, 'জর্মনরা বর্বর!'

অপিচ এসপেরেগাস এবং আর্টিচোক ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া গো-হত্যার ন্যায় মহাপাপ—খেতে হয় হাত দিয়ে।

ইংরেজ যদিস্যাৎ কখনো রাইস-কারি কিংবা ইটালিয়ান রিসোত্তো (এক রকমের কিমা-পোলাও) খায়, তবে টেবিল কিংবা ডেসার্ট স্পুন দিয়ে সে খাদ্য মুখে তোলে। তাই দেখে ফরাসী-ইতালী আঁতকে ওঠে—বলে, কী বর্বরতা! একটা আস্ত চামচ মুখে পুরছে—বাপ্স্। তারা রাইস-কারি খায় ডান হাতে কাঁটা নিয়ে—বিনা ছুরিতে। তাই দেখে চীনা ভদ্রসন্তান আবার ভিরমি যায়। বলে, একটা আস্ত ফর্ক মুখে ঢোকাচ্ছে—কী বর্বরতা! তার চেয়ে চপস্টিক কত পরিষ্কার, কত পরিপাটি।

আর বঙ্গসন্তান আমি বলি, এ সবকটা পদ্ধতিই বর্বর না হোক, অন্তত নোংরা। ফর্ক, স্পুন, এমন কি চপস্টিক পর্যন্ত আমার আপন আঙুলের চেয়ে নোংরা। সব চেয়ে বড়ীয়া হোটেলের স্পুন নিয়ে আপনি আচ্ছাসে ন্যাপকিন দিয়ে ঘষুন—দেখতে পাবেন ন্যাপকিন কালো হয়ে গেল। অথচ আপনি হাত ধুয়ে যে খেতে বসেন, তখন কাপড়ে আঙুল ঘষলে কাপড় ময়লা হয় না।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি টেবিলে বসে খাওয়াতে। টেবিল ক্লথ বাঁচিয়ে, ছুরি-কাঁটা না বাজিয়ে, জল খাওয়ার সময় গ্লাসে ঠোঁটের দাগ না লাগিয়ে টেবিলের তলায় পাশের কিংবা আসনের লোকের পায়ে গুত্তা না মেরে আপন গেলাস আর পরের গেলাসে খিচুড়ি না পাকিয়ে, আঁত্রের ফর্ক আর জয়েন্টের ফর্কে গোলমাল না বাধিয়ে, প্লেট শেষ হওয়ার পূর্বে ছুরি-কাঁটা পাশাপাশি না রেখে, ডাইনে-বাঁয়ে সব কিছু রদ্দিবরবাদ না করে, এবং আহারান্তে ঘোত ঘোত করে ঢেকুর না তুলে আহার করা আমার পক্ষে কঠিন, সুকঠিন। বিলিতি ডিনার খেতে পারেন মাত্র ম্যাজিশিয়ানরাই যাঁদের হাত-সাফাই আছে, যাঁরা চিড়িতনের টেক্কাকে বেমালুম হরতনের নয়লা বানিয়ে দিতে পারেন।

এবং সব চেয়ে গর্ভ-যন্ত্রণা, খাওয়ার দিকে আপনি সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে পারবেন না। এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আপনাকে মধুর মধুর বাক্যালাপ করতে হবে। আবহাওয়া থেকে আরম্ভ করে আপনাকে রিলেটিভিটি পর্যন্ত কপচাতে হবে। আবার শুধু গল্প করলে চলবে না—সঙ্গে সঙ্গে খেতে হবে। এর পরিমাণ ঠিক রাখা সেও এক কঠিন কর্ম। আপনি যদি প্রধান অতিথি হন, তবে আপনাকে বকর বকর করতে হবে বেশি, যদি আমার মতো ব্যাক-বেঞ্চার হন, তবে চুপ করে সব কিছু শুনে যেতে হবে—তা সে যতই নিরস নিরানন্দ হোক না কেন?

বলুন তো মশাই, ভোজনের নেমন্তন্ন কি এগজামিনেশন হল?

* * *

নয়রাট লোকটি খুশ গল্প করে ঘরবাড়ি জমজমাট করে রাখতে চান সে কথাটা দু মিনিটেই বুঝে গেলুম, আর গৃহিণীর ভাবসাব দেখে অনুমান করলুম ইনিও সাদাসিধে লোক, লৌকিকতার বড় ধার ধারেন না। খানা-টেবিলের পাশে পৌঁছেই বললেন, 'এ বাড়িতে পোলিশ গর্ভমেন্ট, (পোল্যান্ডের ইতিহাসে এত ঘন ঘন অরাজকতা আর বিদ্রোহ হয়েছে যে, জর্মন ভাষায় 'পোলিশ গভর্নমেন্ট' বলতে 'এলো-মেলো' 'ছন্নছাড়া' বোঝায়) যে যেখানে খুশি বসতে পারেন।'

নয়রাট বাধা দিয়ে বললেন, 'সে কি করে হয়? আমি বসব আমার পশ্চাদ্দেশের উপর, তুমি বসবে—।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা রাগ করে বললেন, 'ছিঃ, পেটার, ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে এই আজ সকালে; আর এর-ই ভিতর তুমি আরম্ভ করে দিয়েছ যত সব অশ্লীল কথা! তার উপর উনি আবার বিদেশী।'

নয়রাট বললেন, 'দেখো, প্রিয়া, তুমি অনেকগুলো ভুল করেছ। প্রথমত তুমি বিলক্ষণ জানো, আমি দিশি-বিদেশীতে কোন ফারাক দেখতে পাই নে। যার সঙ্গে আমার মনের মিল, রুচির মিল হয় সে-ই আমার আত্মজন। কি বলেন আলিসাহেব?'

আমি বললুম, 'অতি খাঁটি কথা। তবে ভারতীয় ঋষি বলেছেন, "আমি" "তুমি"তে পার্থক্য করে লঘুচিত্তের লোক, যার চরিত্র উদার তার কাছে সর্ব বসুধা আত্মজন।'

নয়রাট গুম্‌ মেরে শুনলেন। অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় নাড়িয়ে শেষটায় বললেন, 'এটা হজম করতে আমার একটু সময় লাগবে—ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার রান্নার মতো।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভয়ঙ্কর চটে যাওয়ার ভান করে (আমার তাই মনে হল) বললেন, 'দেখো, পেটার, তুমি খাওয়া বন্ধ করে এখ্‌খুনি রেস্তোরাঁ যাও; না হলে এই ডিশ ছুঁড়ে তোমার মাথা ফাটাব।'

পেটার অতি ধীরে ধীরে আরেক চামচ টমাটো সুপ গিলে নিয়ে প্রথম গিন্নিকে শুধালেন, আরও সুপ আছে কি না, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সবাইকে আত্মজন করা কি কখনো সম্ভব? এই দেখুন না, সেদিন ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, একজোড়া ফেল্সি নূতন জুতো কিনবে—দাম চল্লিশ ফ্রাঁ (৩৮৲)। আমি বললুম, আমার অত টাকা নেই, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললে, সে আমার কাছ থেকে টাকা চায় না, তার মা আসছেন দু'দিন পরে, তিনি টাকাটা দেবেন। কি আর করি বলুন তো? তদ্দণ্ডেই টাকাটা ঝেড়ে দিলুম। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার মা! বাপরে বাপ্! আপনি কখনো ম্যান-ইটার বাঘের মুখোমুখি হয়েছেন?'

আমি কিছু বলবার পূর্বেই ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমাকে বললেন, 'দোহাই মা-মেরির! এই পেটারটা যে কি মিথ্যাবাদী আপনাকে কি করে বোঝাই? (পেটারের আপত্তি শোনা গেল, 'ডার্লিং, অশ্লীল গল্পের চেয়ে গালি-গালাজ অনেক বেশি খারাপ') আমার মা যাতে বড়দিন একা-একা না কাটান তার জন্য নিজে আমাকে না বলে লুৎর্সেন গিয়ে তাঁকে এখানে নিয়ে এল। তার পর বছরের শেষ রাত্রে তাঁর সঙ্গে ধেই ধেই করে নাচলে ভোর চারটে অবধি—ওঁর সঙ্গে নাচলে অন্তত পঁচিশটা নাচ, আমার সঙ্গে দুটো, জোর তিনটে। বুড়িকে শ্যাম্পেন খাইয়ে খাইয়ে টং করিয়ে দিয়ে, যত সব অদ্ভুত পুরানো রাশান আর পোলিশ নাচ। কখনো সে মাটিতে বসে উবু থাবড়ায়—মা তখন তার চতুর্দিকে পাঁই পাঁই করে চক্কর খাচ্ছেন—কখনো বাঁদরের মত লম্ফ দিয়ে ছাতে মাথা ঠোকে—মা তখন ১৫ ডিগ্রীতে কাত হয়ে স্কার্ট তুলেছেন হাঁটু অবধি। তারপর তাঁকে কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে বাঁই বাঁই করে ঘুরলে ঝাড়া দশ মিনিট। বাদবাকি নাচলে-ওলা-নাচনে-ওলীরা ততক্ষণে ফ্লোর তাদের জন্য সাফ করে দিয়ে আপন আপন টেবিলে চলে গিয়েছে। অরকেস্ট্রাও বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়েছে, একটা নাচের জন্য ওরা বাজনা বাজায় দশ, জোর পনেরো মিনিট—ঐ মাৎসুর্কা না কি পাগলা নাচের জন্যে ওরা বাজনা বাজালে পাকা এক ঘণ্টা। নাচের শেষে মা তো নেতিয়ে পড়ল চেয়ারে, ওদিকে কিন্তু চোখ বন্ধ করে বুড়ি মিটমিটিয়ে হাসছে—খুশিতে ডগোমগো!'

পেটার বললেন, 'ডার্লিং, কিন্তু সে রাত্রের সব চেয়ে সেরা নাচের জন্য কে প্রাইজ পেল সেটা তো বললে না।'

তারপর আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'মা পেলেন ফার্স্ট প্রাইজ, আমি সেকেন্ড। তাই তো আমি শাশুড়িদের বিলকুল পছন্দ করি নে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, ''আচ্ছা আহাম্মুক তো! নাচের পয়লা প্রাইজ হামেশাই রমণী পায়। দুসরাটা পুরুষ। এটা হচ্ছে শিভালরি। তোমাকে কি করে পয়লা প্রাইজ দিত?'

পেটার আমার দিকে মুখ করে বললেন, 'গিন্নীর রাগ, আমি ওর সঙ্গে নাচলুম না কেন? আচ্ছা মশায়, বলুন তো, আপনি যদি কবিতা পড়ে শোনান, খোশগল্প করেন, বাজনা বাজান কিংবা কালোয়াতি করেন তবে যে সমে সমে মাথা নাড়তে পারে তাকে আদর-কদর করবেন, না আপন স্ত্রীকে? যেহেতু তিনি আপন স্ত্রী! রসের বাজারে আপন পর করা যায়?'

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, 'তাই তো আমি নিবেদন করলুম, ''যাঁর চরিত্র উদার—অর্থাৎ যিনি রসিক জন—তাঁর কাছে সব বসুধা আত্মজন''।'

পেটার নয়রাট বললেন, 'গিন্নী অবশ্যি একটা কথা ঠিক বলেছেন, আমরা কেউ এটিকেটের ধার ধারি নে। এ বিষয়ে চমৎকার একটা ''ট্যুনিস'', ''শেলে''র গল্প আছে। ''ট্যুনিস-শেল''-কে চেনেন?'

আমি বললুম, 'ঠিক মনে পড়ছে না।"

"আগাগোড়া একটি "প্রতিষ্ঠান" বলতে পারবেন। 'ট্যুনিস্" কথাটা এসেছে লাতিন "আন্তনিয়ুস" থেকে। আন্তনিয়ুস গালভরা, গেরেমভারী খানদানী ঐতিহাসিক নাম। আর ট্যুনিস অতিশয় প্লিবিয়ান অপভ্রংশ—নামটাতেই তাই একটুখানি রসের আমেজ লাগে।'

আমি বললুম, 'আমাদের "পঞ্চানন" নামটাও গেরেমভারী কিন্তু তার গার্হস্থ্য সংস্করণ "পাঁচু"টাতেও ঐরকম রসসৃষ্টি হয়।'

'তাই নাকি? আপনারাও তাহলে এ রসে বঞ্চিত নন? আর "শেল" কথাটার মানে "ট্যারা"। বুঝতেই পারছেন পিতৃদত্ত নাম নয়, পাড়াদত্ত। এবং নাম থেকেই বুঝতে পারছেন, এরা দুজন ড্যুক ব্যারন নন—খাঁটি ওয়ার্কিং কেলাস। খায়দায়, ফুর্তিফার্তি করে, ফোকটে দু পয়সা মারার তালে থাকে, কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ আর বিয়ার-খানায় আড্ডা জমাতে পারলে এরা আর কিছু চায় না।

'একদিন হয়েছে কি, ট্যুনিস্-শেল রাস্তায় একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে—তা ওরা হামেশাই ওরকমধারা রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়, না হলে গল্পই বা জমবে কি করে?'

'ট্যুনিস্ বললে, "চ, শেল; এই দিয়ে উত্তমরূপে আহারাদি করা যাক।" দুজনা ঢুকল গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় আর অর্ডার দিলে দুখানা কটলেটের।

'ওয়েটার এসে ছুরিকাঁটা আর দুখানা প্লেট সাজিয়ে দিয়ে আনল একখানা বড় ডিশে করে দুখানা কটলেট।'

নয়রাট বললেন, 'কটলেট তো আর অ্যারোপ্লেনের স্ক্রু নয় যে ফিতে দিয়ে মেপেজুপে কিংবা ছাঁচে ঢেলে, ঠিক একই সাইজে বানানো হবে, কাজেই একখানা কটলেট আরেকখানার চেয়ে সামান্য একটু বড় হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?'

'ট্যুনিস তাই ঝপ করে বড় কটলেটখানা আপন প্লেটে তুলে নিল। শেল চুপ করে দেখল। তারপর আস্তে আস্তে ছোট কটলেটখানা তুলে নিয়ে ট্যুনিসকে বললে, 'ট্যুনিস, তুই আদব-কায়দা একদম জানিস নে।"—যেন নিজে সে মহা খানদানী ঘরের ছেলে।

'ট্যুনিস শুধালে, "কেন, কি হয়েছে?"

'শেল বললে, "ভদ্রতা হচ্ছে, যে ডিশ থেকে প্রথম খাবার তুলবে, সে নেবে ছোট টুকরোটা।

'ট্যুনিস বললে, "অ। আচ্ছা, তুই যদি প্রথম নিতিস তবে তুই কি করতিস?"

'শেল দম্ভ করে বলল, "নিশ্চয়ই ছোট কটলেটটা তুলতুম।"

'তখন ট্যুনিস বললে, "সেইটেই তো পেয়েছিস, তবে ভ্যাচর ভ্যাচর করছিস কেন"?'

নয়রাট গল্প শেষ করে খানাতে মন দিলেন।

বলতে পারব না, আমার পাঠকদের গল্পটা কি রকম লাগল—আমার কিন্তু উত্তম মনে হল, তাই প্রাণভরে খানিকক্ষণ হেসে নিলুম।

নয়রাট বললেন, 'তাই যখন কেউ এটিকেট নিয়ে বড্ড বেশি কপচাতে শুরু করে তখনই আমার এই গল্পটা মনে পড়ে আর হাসি পায়। আরে বাবা, সংসারে থাকবি মাত্র দুদিন। তার ভিতর কত হাঙ্গামা, কত হুজ্জত। সেই সব সামলাতে গিয়েই প্রাণটা খাবি খায়। তার উপর যদি এটিকেটের নাগপাশ দিয়ে সর্বাঙ্গ আর নবদ্বার বেঁধে দাও (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার আপত্তি শোনা গেল, "পেটার, আবার অশ্লীল কথা!") তবে দম ফেলবে

কি করে? হাঁচবার এটিকেট, কাশবার এটিকেট, থুথু ফেলবার এটিকেট, গা চুলকাবার এটিকেট— প্রাণটা যায় আর কি।'

আমি সায় দিলুম।

তখন নয়রাট শুধালেন, 'বলুন তো, কি সে জিনিস যা চাষা অনাদরে, তাচ্ছিল্যে, এমন কি বলতে পারেন, ঘেন্নাভরে রাস্তায় ফেলে দেয়, আর ভদ্রলোক সেটাকে ধোপদুরস্ত দামী রুমালে ঢেকে, পকেটে পুরে অতি সন্তর্পণে বাড়ি নিয়ে আসেন?'

আমি খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললুম, 'তা তো জানি নে।'

বললেন, 'সিকনি। চাষা ফাঁত করে রাস্তায় নাক ঝেড়ে ওদিকে আর তাকায় না, ভদ্রলোক রুমাল খুলে ছিঁক করে তারই উপর একটুখানি নাক ঝেড়ে সেটিকে সযত্নে ভাঁজ করে, পকেটে পুরে বাড়ি ফেরেন।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা হঠাৎ বললেন, 'পেটার, তুমি তো বকবক করে এটিকেটের নিন্দাই করে যাচ্ছ, ওদিকে একদম ভুলে গিয়েছ, ভদ্রলোক প্রাচ্যদেশীয়, সেখানে এটিকেটের অন্ত নেই; এদেশে তো প্রবাদই রয়েছে, "ওরিয়েন্টাল্‌ কার্টসি"। যে আচার ওঁদের প্রিয় তুমি তাই নিয়ে মস্করার পর মস্করা করে যাচ্ছ।'

পেটার বললেন, 'আদপেই না। আমি তো ভদ্রতার (ম্যানার্স) নিন্দে করছিনে, আমি করছি এটিকেটের। দুটো তো এক জিনিস নয়।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের দেশে ব্যবস্থাটা কি রকম?'

আমি বললুম, 'অনেকটা আপনাদের দেশেরই মতো। অর্থাৎ, ভদ্রতারক্ষার চেষ্টা আমরাও করে থাকি তবে এটিকেটের বাড়াবাড়ি দেখলে তাই নিয়ে আপনার-ই মতো টীকাটিপ্পনী কেটে থাকি। তবে কি না ভারতবর্ষ বিরাট দেশ—তার নানা প্রদেশে নানা রকমের এটিকেট। এই ধরুন লখ্‌নউ। সেখানে কোনো খানদানী বাড়িতে নিমন্ত্রণে যেতে হলে বাড়িতে উত্তমরূপে আহারদি সেরে যেতে হয়। কারণ, খানার মজলিসে গল্প উঠবে, কোন্‌ মৌলানা দিনে আড়াই তোলা খেতেন, কোন্‌ সাহেব-জাদা দুই তোলা, কোন্‌ পীর-জাদা এক তোলা আর কোন্‌ নওয়াব একদম খেতেনই না। অথচ সংস্কৃত আপ্তবাক্য এ বিষয়ে যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা এ এটিকেট আদপেই মানতেন না।'

কর্তা-গিন্নি উভয়েই শুধালেন, 'আপ্ত-বাক্য কি?'

আমি বললুম,—

'পরান্নং প্রাপ্য দুর্বুদ্ধে, মা প্রাণেষু দয়াং কুরু।
পরান্নং দুর্লভং লোকে প্রাণাঃ জন্মনি জন্মনি।

অর্থাৎ—

ওরে মূর্খ, নেমন্তন্ন পেয়েছিস, ভালো করে খেয়ে নে। প্রাণের মায়া করিস নি, কারণ ভেবে দেখ, নেমন্তন্ন কেউ বড় একটা করে না। বেশি খেয়ে যদি মরে যাস তাতেই বা কি—প্রাণ তো ভগবান প্রতি জন্মে ফ্রি দেয়, তার জন্য তো আর খর্চা হয় না।

* * *

আমি বললুম, 'চমৎকার রান্না হয়েছে'—রান্না সত্যই মামুলী রান্নার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছিল, পোশাকী বান্না বললেও অত্যুক্তি হয় না। তারপর জিজ্ঞেস করলুম, 'রুশ কায়দায় মাছ কি করে রাঁধতে হয়?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আপনার বুঝি রান্নার শখ?'

আমি বললুম, 'না; তবে আমার মা খুব ভালো রাঁধতে পারেন আর নূতন নূতন দিশী-বিদেশী পদ শেখাতে তাঁর ভারি আগ্রহ। আমি প্রতিবার দেশ-বিদেশ ঘুরে যখন বাড়ি ফিরি তখন সবাই আমাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নানা রকম গল্প শোনে, মাও শোনেন, কিন্তু বলার প্রথম ধাক্কা কেটে যাওয়ার পর তিনি আমাকে একলা-একলি শুধান, নূতন রান্না কি কি খেলুম। আমি ভালো ভালো পদগুলোর নাম করলে পর মা শুধাতেন ওগুলো কি করে রাঁধতে হয়। গোড়ার দিকে রন্ধনপদ্ধতি খেয়াল করে শিখে আসতুম না বলে মাকে কষ্ট করে এক্‌স্‌পেরিমেন্ট করে করে শেষটায় পদটা তৈরি করার পদ্ধতি বের করতে হত। এখন তাই মোটামুটি পদ্ধতিটা লিখে নিই; মাকে বলা মাত্রই দুই ট্রায়েলের পরই ঠিক জিনিস তৈরি করে দেন।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বলেন কি?'

বললুম, 'হ্যাঁ, আশ্চর্য হবারই কথা। আমিও একদিন মাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তিনি কোনো পদ না দেখে না চেখে তৈরি করেন কি করে? মা বলেছিলেন—এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে—"আরে বাপু, রান্না মানে তো হয় সেদ্ধ করা, নয় তেলে-ঘিয়ে ভাজা, কিংবা শুকনো শুকনো ভাজা অথবা শিকে ঝলসে নেওয়া। এর-ই একটা, দুটো কিংবা তিনটে কায়দা চালালেই পদ ঠিক উতরে আসবে। আর তুইও তো বলেছিস আমাদের দেশের বাইরে এমন কোনো মশলা জন্মায় না যা এদেশে নেই। তা হলে তুই যা বিদেশে খেয়েছিস, আমি তৈরি করতে পারব না কেন"?'

তারপর বললুম, 'অবশ্য মা আমাকে কখনো একস্‌পেরেগাস্‌ কিংবা আর্টিচোক খাওয়ান নি কারণ ওগুলো আমাদের দেশে গজায় না। তাই নিয়ে মায়েরও কোনো খেদ নেই—কারণ যে সব শাক-সবজি আমাদের দেশে একদম হয় না সেগুলোর কথা আমি মায়ের সামনে একদম চেপে যেতুম।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বুদ্ধিমতী মেয়ে, বললেন, 'ওঃ, পাছে তাঁর দুঃখ থেকে যায়, তিনি তাঁর ছেলের সব প্রিয় খাদ্য খাওয়াতে পারলেন না।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি যে তরো-বেতরো রান্না শেখার জন্য উঠে পড়ে লেগে যেতেন তার আরও একটা কারণ রয়েছে। রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট। আর আমার মা—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'থামলেন কেন?'

আমি লজ্জার সঙ্গে বললুম, 'নিজের মায়ের কথা সত্যি হলেও বলতে গেলে কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকে। আপনারা হয়তো ভাববেন ফুলিয়ে বলছি।'

নয়রাট এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন, এখন হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'ব্যস! হয়েছে। আপনাকে আর এটিকেট দেখাতে হবে না। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আপনাকে বলে নি, এ বাড়িতে এটিকেট বারণ?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা তাড়াতাড়ি বললেন, 'ছিঃ, পেটার, তুমি ওরকম কড়া কথা কও কেন?'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত হয়ে বললুম, 'আদপেই না। ওঁর ধমক থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আপনারা সরল প্রকৃতির লোক, আপনাদের সামনে সব কিছু অনায়াসে খুলে বলা যায়। তা হলে শুনুন, যা বলেছিলুম, রান্না হচ্ছে পুরোদস্তুর আর্ট বিশেষ আর আমার মা খাঁটি আর্টিস্ট। ঠিক আর্ট ফর আর্টস সেক নয়, অর্থাৎ তিনি মনের আনন্দে খুদ-খুশির জন্য রেঁধেই যাচ্ছেন, কেউ খাচ্ছে না, কিংবা খেয়েও কেউ ভালোমন্দ কিছু বলছে না—তা নয়। তিনি রান্নার নূতন নূতন টেকনিক শিখতে ভালোবাসতেন সত্যকার আর্টিস্ট যে রকম নূতন

নূতন টেকনিক শিখতে ভালোবাসে। আপনি ভালো প্যাস্টেল-পেন্টিং করতে পারেন, কিন্তু অয়েলপেন্টিং দেখে কিংবা তার কথা শুনে আপনারও কি ইচ্ছে হবে না সেই টেকনিক্ রপ্ত করার? কিংবা আপনি উড্‌কাট করেন—যদি লাইন এন্‌গ্রেভিং, এচিং, মেদজোটিন্ট, আকওয়াটিন্টের খবর পান, তবে সেগুলোও আয়ত্ত করার বাসনা আপনার হবে না?

'অথচ দেখুন, খাঁটি আর্টিস্ট অজানা জিনিস আয়ত্ত করার জন্য যত উদ্‌গ্রীবই হোক না কেন, হাতের কাছের সামান্যতম মালমশলাও সে অবহেলা করে না—নানা রঙের মাটি, শাক-সবজি থেকেও নূতন রঙ আহরণ করার চেষ্টা করে।

'ভারতবর্ষের যে প্রান্তে আমার দেশ, সেখানে সব সময় জাফরান পাওয়া যায় না। তাই মা তারই একটা "এরজাৎস" সব সময়ে হাতের কাছে রাখেন। বুঝিয়ে বলছি—

'আমাদের দেশে এক রকম ফুল হয় তার নাম শিউলি। শিউলির বোঁটা সুন্দর কমলা রঙের আর পাপড়ী সাদা। ফুল বাসি হয়ে গেলে মা সেই বোঁটাগুলো রোদ্দুরে শুকিয়ে বোতলে ভরে রাখেন। সেই শুকনো বোঁটা গরম জলে ছেড়ে দিলে চমৎকার সুগন্ধ আর কমলা রঙ বেরয়। মেয়েরা সাধারণত ঐ রঙ দিয়ে শাড়ি ছোপায়। মা খুব সরু চালের ভাত ঐ রঙে ছুপিয়ে নিয়ে চিনি, কিসমিস, বাদাম দিয়ে ভারি সুন্দর 'মিঠাখানা' তৈরি করেন।

'এটা মায়ের আবিষ্কার নয়। কিন্তু তবু যে বললুম, তার কারণ প্রকৃত গুণী কলাসৃষ্টির জন্য দেশী-বিদেশী কোনো উপকরণ অবহেলা করেন না।'

নয়রাটদের বাড়িতে এটিকেট বারণ, তবু আপন মায়ের কথা একসঙ্গে এতখানি বলে ফেলে কেমন লজ্জা পেলুম।

* * *

রুশ কবি পুশ্‌কিনের রচিত একটি কবিতার সারমর্ম এই,—

'হে ভগবান, আমার প্রতিবেশীর যদি ধনজনের অন্ত না থাকে, তার গোলাঘর যদি বারো মাস ভর্তি থাকে, তার সদাশয় সচ্চরিত্র ছেলেমেয়ে যদি বাড়ি আলো করে রয়, তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি যদি দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, তবু, তাতে আমার কণামাত্র লোভ নেই; কিন্তু তার দাসীটি যদি সুন্দরী হয় তবে—তবে, হে ভগবান, আমাকে মাপ করো, সে অবস্থায় আমার চিত্তচাঞ্চল্য হয়।'

পুশ্‌কিন সুশিক্ষিত, সুপুরুষ এবং খানদানী ঘরের ছেলে ছিলেন, কাজেই তাঁর 'চিত্তদৌর্বল্য' কি প্রকারের হতে পারত সেকথা বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। এইবারে সবাই চোখ বন্ধ করে ভেবে নিন কোন্ জিনিসের প্রতি কার দুর্বলতা আছে।

আমি নিজে বলতে পারি, সাততলা বাড়ি, ঢাউস মোটরগাড়ি, সাহিত্যিক প্রতিপত্তি, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব এ সবের প্রতি আমার কণামাত্র লোভ নেই। আমার লোভ মাত্র একটি জিনিসের প্রতি—অবসর। যখনই দেখি, লোকটার দু'পয়সা আছে অর্থাৎ পেটের দায়ে তাকে দিনের বেশির ভাগ সময় এবং সর্বপ্রকারের শক্তি এবং ক্ষমতা বিক্রি করে দিতে হচ্ছে না, তখন তাকে আমি হিংসে করি। এখানে আমি বিলাসব্যসনের কথা ভাবছি নে, পেটের ভাত, '—'র[১] কাপড় হলেই হল।

অবসর বলতে আমি কুঁড়েমির কথাও ভাবছি নে। আমার মনে হয়, প্রকৃত ভদ্রজন অবসর পেলে আপন শক্তির সত্য বিকাশ করার সুযোগ পায় এবং তাতে করে সমাজের

১ শব্দটা গ্রাম্য; কিন্তু পূজনীয় হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে শব্দটিকে অবহেলা করেন নি বলে আমি ড্যাস দিয়ে সারলুম। তিনি গুরুজন—তাঁর শাস্ত্রাধিকার আছে।

কল্যাণলাভ হয়। এই ধরুন, আমার বন্ধু শ্রী'ক' দাশগুপ্ত। বদ্যির ছেলে—পেটে অসীম এলেম, তুখোড় ছোকরা, তালেবর ব্যক্তি। সদাগরী আপিসে কর্ম করে, বড় সায়েবকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়—মোটা তন্‌খা ভী পায়।

বয়স তার এখনো তিরিশ পেরোয় নি। পার্টিশেনের পর মারোয়াড়ী কারবারীরা যখন 'বস্'কে ঘায়েল করে ব্যবসা কেনবার জন্য উঠেপড়ে লাগল, তখন আমার এই বদ্যির ব্যাটা সায়েবকে এমন সব 'কৌশল' বাতলালে যে উল্টে ওনারা চোখের জলে নাকে জলে।

সায়েবও বড় নেমকহালাল[২] লোক। প্রায়ই 'হ্যালো, ড্যাস-গুপ্‌টা' বলে বাড়িতে ঢোকেন, 'লৌচি' (লুচি) খেয়ে যান, ড্যাস্-গুপ্‌টার ছেলেদের জন্য পূজার বাজারে দু'চারখানা 'ডৌটি' (ধুতি)ও রেখে যান। আমি বরাবর সকালটা দাশগুপ্তের বাড়িতে কাটাই, তাই সায়েবের সঙ্গে মাঝে মাঝে মোলাকাত হয়ে যায়। লোকটি এদেশে-আসা সাধারণ ইংরেজদের মত গাড়ল নয়, ইংরিজি শোলোক খাসা কপচাতে পারে, অর্থাৎ মধুরকণ্ঠে উচ্চ-স্বরে শেলি-কীটস্ আবৃত্তি করতে পারে।

সায়েবের কথা উপস্থিত থাক। দাশগুপ্তের কথায় ফিরে যাই।

আমি জানি দাশগুপ্ত কোনো চেম্বার অব্ কমার্সের বড়কর্তা হবার জন্য লালায়িত নয়। দেড় হাজার টাকার মাইনেকেও সে থোড়াই কেয়ার করে।

আমি জানি, আজ যদি তাকে কেউ পাঁচশ টাকা প্রতি মাসে দেয়, তবে সে কলকাতা শহরের হেথা-হোথা সর্বত্র দশখানা নাইট স্কুল খুলবে। এখন সে আপিসে দিনে সাত ঘণ্টা কাটায়—নাইট স্কুল খোলবার মোকা পেলে সে পরমানন্দে দিনে চোদ্দ ঘণ্টা সেগুলোর তদারকিতে, ক্লাস নেওয়াতে কাটাবে। বিশ্বাস করবেন না, সে তার উড়ে চাকরটাকে স্বাক্ষর করার জন্য উড়ে কায়দায় বর্ণমালা পর্যন্ত শিখিয়েছে—চোখ বন্ধ করে মাথা দুলিয়ে দিব্য বলে যায়,—

'ক' রে কমললোচন শ্রীহরি।
করেন শঙ্খ-চক্রধারী।
'খ' রে খগ-আসনে খগপতি।
খটস্তি লক্ষ্মী-সরস্বতী।
'গ' রে গরুড়—ইত্যাদি—

(আমার সহৃদয় উড়িষ্যাবাসী পাঠকবৃন্দ যেন কোনো অপরাধ না নেন—যদি নামতাতে কোনো ভুল থেকে যায়; আমি দাশগুপ্তের মুখে মাত্র দু'তিনবার শুনেছি; কেউ যদি আমাকে পুরো পাঠটা পাঠিয়ে দেন, তবে বড় উপকৃত হই)।

অর্থাৎ আজ যদি দাশগুপ্তকে পেটের ধান্দায় আপিস না যেতে হয়, তবে সে তার জীবন্মৃত্যুর চরম কাম্য কাজে ফলাতে পারবে। কে ক'লক্ষ মণ পাঠ কিনল, কে ধাপ্পা এবং ঘুষ দিয়ে ক'খানা ওয়াগন বাগালে তাতে দাশগুপ্তের কোনো প্রকারের চিত্তদৌর্বল্যও (হেথাকার ভাষায় 'দিল্‌চস্‌পী) নেই। দেড় হাজার টাকার মাইনে কমে গিয়ে পাঁচশ হলে সে দুম করে মোটরখানা বিক্রি করে দিয়ে ট্রামে চড়ে ইস্কুলগুলোর তদারক করবে।

আপনি বিচক্ষণ লোক, আপনি শুধাবেন, এ পাগলামি কেন?

এটা পাগলামি নয়।

---

২ 'নেমকহারাম' অর্থাৎ 'অকৃতজ্ঞ', সমাসটা বাংলায় চলে। 'নেমকহালাল' ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ 'কৃতজ্ঞ'। 'নেমকহারাম' 'নেমকহালাল' কথাগুলো কিন্তু 'কৃতজ্ঞ' 'অকৃতজ্ঞের' চেয়ে জোরদার। 'নমক' 'নুন'—তার 'অপমান' (হারাম) কিংবা 'সম্মান' (হালাল)।

আসলে দাশগুপ্ত ইস্কুল মেস্টার। তার বাবা টোলে আয়ুর্বেদ শেখাতেন, তার ঠাকুরদাও তাই, তাঁর বাপও তাই, তাঁর উপরের খবর জানি নে।

এবং আমার সুহৃদ যে কী অদ্ভুত ইস্কুল-মেস্টার সে কথা কি করে বোঝাই? চাকরির ঝামেলার মধ্যিখানেও সে একটা নাইট ইস্কুল চালায়।

একদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দেখি, সে তার ইস্কুলে ইংরেজী পড়াচ্ছে। চেঁচিয়ে বলছে, 'আই গো!'

ছোঁড়ারা তীব্রকণ্ঠে ঐক্যস্বরে বলছে, 'আই গো!'

'উই গো!'

'উই গো!'

'ইউ গো!'

'ইউ গো!'

'হী গোজ!'

'হী গোজ!'

'রাম গোজ!'

'রাম গোজ!'

'শ্যাম গোজ!'

'শ্যাম গোজ!'

দাশগুপ্ত সর্দার-পোড়োর মত বলে যাচ্ছে আর ছোঁড়ারা চীৎকার করে দোহার গাইছে।

সর্বশেষে দাশগুপ্ত লাফ দিয়ে উচ্চতম কণ্ঠে চেঁচাল, 'রাম অ্যান্ড শ্যাম গো গো গো!'

দাশগুপ্তের স্বপ্ন কখনো বাস্তবে পরিণত হবে না। এমন দিন কখনো আসবে না যে, সে পেটের চিন্তার ফৈসালা করে নিয়ে তামাম শহর নাইট স্কুলে নাইট স্কুলে ছয়লাপ করে দিতে পারে।

দাশগুপ্তের কথা যাক। আমি তার উল্লেখ করলুম নয়রাট-জীবনটা তুলনা দিয়ে খোলসা করার জন্য।

ইয়োরোপে এ জিনিসটা হামেশাই হচ্ছে।

নয়রাট মেট্রিক পাস করেন ১৮ বছর বয়সে, সংসারে ঢোকেন ১৯ বছর বয়সে। তারপর ঝাড়া ছাব্বিশটি বছর ব্যবসা-বাণিজ্য করে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে দেখেন এতখানি পুঁজি জমেছে যে বাকি জীবন তাঁকে আর সংসার খরচের জন্য ভাবতে হবে না।

নয়রাটের ভাষাতেই বলি,

'টাকা জমানোর নেশা আমাকে কখনো পায় নি। আমি জানি এ দুনিয়ার বহু লোকই আমার ধারণা নিয়ে সংসারে ঢোকে কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত ধর্মচ্যুত হয়। জীবনে আমার কতকগুলো শখ ছিল—কিন্তু হিসেব করে দেখলুম, সেগুলো বাগে আনতে হলে পেটের একটা ফৈসালা পয়লাই করে নিতে হবে। তাই খাটলুম ছাব্বিশ বছর ধরে একটানা। আমার অসুখবিসুখ করে না, আমি একদিনের তরে কাজে কামাই দিই নি—ঐ শুধু বিয়ের সময় যে সাতদিন হনিমুনে কাটাই বাধ্য হয়ে তারই জন্য ছুটি নিতে হয়েছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'তা ছুটি নিয়েছিলে কেন? আমি বলি নি, তোমার আপিসঘরে, কিংবা সেখানে জায়গা না হলে তোমার গুদোমঘরে পাদ্রী ডেকে মন্ত্র পড়লেই হবে।'

নয়রাট বললেন, 'অন্য মতলব ছিল, ডার্লিং, তোমাকে তো আর সব কিছু খুলে বলি নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে খুলে কই।

'বিয়ে করেই বউকে নিয়ে চলে গেলুম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। সে গাঁটা খুঁজে বের করতে আমায় বেশ বেগ পেতে হয়েছিল এবং সে গাঁ থেকেও আধ মাইল দূরে একটি 'শালে' ভাড়া নিলুম সাতদিনের জন্য। সেখানে ইলেকটিরিক আছে—ব্যস্ আর কিছু না। জলের কল না, খবরের কাগজ না, দুধওয়ালা দুধ পর্যন্ত দিয়ে যায় না।'

'রাত্তিরের ডিনার খেয়েই আমরা সে বাড়িতে গিয়ে উঠলুম।

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়িতে ঢুকেই সোহাগ করে বললে—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'চোপ্।'

নয়রাট বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা" চোপ্।' তারপর আমাকে বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে কমিয়ে-সমিয়ে বলছি—বাদবাকিটা পরে আপনাকে একলাএকলি বলব।'

'ভোর তিনটের সময় আমি চুপসে খাট ছেড়ে উঠে পা টিপে টিপে নামলুম নিচের তলায়। পিছনের বাগানে গিয়ে সেখান থেকে জল সংগ্রহ করে গেলুম রান্নাঘরে। সেখানে নাকে-মুখে বিস্তর ধুঁয়ো গিলে ধরালুম উনুন। তারপর বেকন ফ্রাই করে, গরম কফি, টোস্ট ইত্যাদি বানিয়ে যাবতীয় বস্তু একখানা বিরাট খুঞ্চাতে সাজিয়ে গেলুম উপরের তলায় ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার বিছানার কাছে। আস্তে আস্তে জাগিয়ে বললুম, "ব্রেকফাস্ট তৈরি।"

'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে (আবার "চোপ" এবং "আচ্ছা, আচ্ছা, চোপ্" শোনা গেল), "ডার্লিং", তুমি আমাকে কত ভালোবাসো—এই ভোরে এই শীতে আমাকে কিছু না বলে তুমি এত সব করেছ।"

'আমি বললুম, "ডার্লিং না কচু, ভালোবাসা না হাতি। আমি এসব তৈরি করে আনলুম শুধু তোমাকে দেখাবার জন্য যে, বাদবাকি জীবন তোমাকে এই রকম ধারা করতে হবে। আর আমি শুয়ে শুয়ে ব্রেকফাস্ট খাবো"।'

আমি প্রাণ খুলে হাসলুম।

দেখি নয়রাটও মিটমিটিয়ে হাসছেন। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'আপনি এই তাড়িখানার বেহুদা প্রলাপটা বিশ্বাস করলেন?'

আমি বললুম, 'কেন করব না? শাদীর পয়লা রাতে শুধু ইরানেই নয়, আরও মেলা দেশে মেলা বর বেড়াল মেরেছে, এ তো আর নূতন কথা কিছু নয়। এবারে সুইস সংস্করণটি শেখা হল এই যা।'

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'সে আবার কি?'

আমাকে বাধ্য হয়ে শাদীর পয়লা রাতে বেড়াল মারার গল্পটা বলতে হল, কিন্তু নয়রাটের মত জমাতে পারলুম না—রসিয়ে গল্প বলা আমার আসে না, সে আমার বন্ধুবান্ধব সকলেই জানেন।

দুজনেই স্বীকার করলেন, ইরানী গল্পটাই ভালো।[৩]

তখন ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটারের বকুনিতে অনেকগুলো ভুল রয়েছে। প্রথমত আমরা হনিমুন যে বাড়িতে কাটাই, সেখানে গ্যাস ছিল, উনুন ধরাবার কথাই ওঠে না, দ্বিতীয়ত পেটার কক্‌খনো ব্রেকফাস্ট খায় না এবং সর্বশেষ বক্তব্য, যে-ব্রেকফাস্টের

৩ 'পঞ্চতন্ত্র ১ম পর্ব, দ্রষ্টব্য।

বর্ণনা সে দিল সেটা ইংলিশ ব্রেকফাস্ট। কোনো কন্‌টিনেন্টাল শূয়ারের মতো ব্রেকফাস্টের সময় একগাদা বেকন আর আণ্ডা গেলে না। পেটার গল্পটা শুনেছে নিশ্চয়ই কোনো ইংরেজের কাছ থেকে, আর সেটা পাচার করে দিলে আপনার উপর দিয়ে।'

পেটার বললেন, 'রেমব্রান্ট একবার এক ভদ্রলোকের মায়ের পট্রেট এঁকেছিলেন। ভদ্রলোক ছবি দেখে বললেন, তাঁর মায়ের সঙ্গে মিলছে না। রেমব্রান্ট বললেন, "একশ বছর পর আপনার মায়ের সঙ্গে কেউ এ ছবি মিলিয়ে দেখবে না—তারা দেখবে ছবিখানি উতরেছে কিনা"।'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটি ভালো কি না, সেইটেই হচ্ছে আসল কথা। ঘটেছিল কি না, সে প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর; আপনি কি বলেন?'

আমি বললুম, 'সুন্দর-ই সত্য—না ঘটলেও ঘটা উচিত ছিল।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'বটে!'

নয়রাট বললেন, 'আমার শখ ছিল দাবা-খেলাতে এবং সে ব্যসনে মেতে আমার কত সময়-সামর্থ্য বরবাদ গিয়েছে তার হিসেব-নিকেশ আমি কখনো করি নি। দাবা-খেলা আমি আরম্ভ করি সাত বছর বয়সে। আমার বাবা কাকা দুজনেই পাঁড় দাবাড়ে ছিলেন আর কাকা রোজ রাত্তিরে বাবার সঙ্গে দাবা খেলতে আসতেন। এক রাত্রে আসতে পারলেন না জোর বরফের ঝড় বইছিল বলে, আর ওদিকে বাবা তো মৌতাতের সময় হন্যে হয়ে উঠলেন। আমি থাকতে না পেরে বললুম, "তা আমার সঙ্গেই খেলো না কেন?" বাবা তো প্রথমটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, কিন্তু জানেন তো, দাবার নেশা কী নিদারুণ জিনিস—বরঞ্চ মদের মাতাল খুনীর সঙ্গে এক টেবিলে মদ খেতে রাজি হবে না, দাবার মাতাল তার সঙ্গে খেলতে কণামাত্রও আপত্তি জানাবে না। বাবা অত্যন্ত তাচ্ছিল্যভরে খেলতে বসলেন, প্রথম দু'বাজি জিতলেনও কিন্তু তৃতীয় বাজি হল চালমাত এবং তারপর তিনি আর কখনো জেতেন নি। তবে তাঁর হল বুড়ো হাড়, এখনো খুব শক্ত শক্ত চালের চমৎকার চমৎকার উত্তর বাতলে দিতে পারেন।'

আমার আশ্চর্য লাগল, কারণ শরৎ চাটুজ্জেও কৈলাস খুড়োর বর্ণনাতেও ঐ কথাই বলেছেন; খুড়োর শেষ বয়সে আটপৌরে খেলা ভুলে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কঠিন সমস্যা সমাধানের জন্য খেলোয়াড়রা তাঁর কাছে যেত। সে কথাটা নয়রাটকে বলতে তিনি বল্লেন, 'অতিশয় হক্‌ কথা। পৃথিবীতে মেলা ধর্ম আছে—তাই ক্রীশ্চান, জু এবং দাবাড়ে। দাবাখেলা ধর্মের পর্যায়ে পড়ে, আর যারাই এই ধর্ম মানে তারা সব-ভাই-সব-ব্রাদার। দাবাড়েদের "পেন্‌ফ্রেন্ড" পৃথিবীর সর্বত্র যে রকম ছড়ানো তার সঙ্গে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না।'

তারপর বললেন, 'সেই যে বাবা দাবা ধরিয়ে দিলেন তারপর ওর হাত থেকে আমি আর রেহাই পাই নি। একবার এক পাঁড় মাতালকে বলতে শুনেছিলুম, সে নাকি জীবনে মাত্র একবার মদ খেয়েছে। আমরা সবাই আসমান থেকে পড়লুম, উল্লুকটা বলে কি—উদয়াস্ত যে লোকটা 'ট্যানিসে"র উপর থাকে, সে কি না জীবনে কুল্লে একটিবার মদ খেয়েছে। বেহেড মাতাল এরেই কয়। তখন মাতাল বললে সে মদ খেয়েছে একবারই—তারপর থেকে এ অবধি শুধু তার খোঁয়ারিই ভাঙছে।'

আমি বললুম, 'ওমর খৈয়াম এ বাবদে যা নিবেদন করেছেন সেটা ঠিক হুবহু এর সঙ্গে খাপ খায় না, তবু অনেকটা এরই কান ঘেঁষে। খৈয়াম বলেছেন, "রোজার পয়লা রাত্তিরে অ্যায়সা পীনা পীউংগা যে তারই নেশার বেহুঁশীতে কেটে যাবে রোজার ঝাড়া পুরো

মাসটা। হুঁশ হবে ঈদের দিন। ঈদ মানে পরব (পরব par excellence), পরব মানতে হয়, না হলে জাত যাবে, ধর্ম যাবে, তাই তখন ফের বসে যার সুরাহী পেয়ালা প্রিয়া নিয়ে।" তারপর খৈয়াম কি করেছিলেন সে হদিস তাঁর রুবাইতে মেলে না, তবে বিবেচনা করি, দুসরা রমজান তক্ তিনি তাঁর কায়দা-কানুনে কোনো রদ্‌বদল করেন নি।'[৪]

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা এতক্ষণ কোন কথা বলেন নি। এখন বললেন, 'আমি তো এ রুবাই ফিটজিরাল্ডে পাই নি। আপনি কি ফার্সীতে পড়েছেন?'

আমি বললুম, 'ফিটজিরাল্ড তো তর্জমা করেছেন মাত্র বাহাত্তর না বিরাশীটি রুবাইয়াৎ। ওমরের নামে প্রচলিত আছে আট শ' না এক হাজার, আমি ঠিক জানি নে। তবে এ রুবাইটি আপনি নিশ্চয়ই হুইনসফিল্ড কিংবা নিকোলার অনুবাদে পাবেন। এঁরা ওমরের প্রায় কোনো রুবাই[৫]-ই বাদ দেন নি।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আপনি যে বললেন, "ওমরের নামে প্রচলিত "রুবাইয়াৎ" তার অর্থ কি। আপনি কি বলতে চান, এগুলো ওমরের রচনা নয়?'

আমি বললুম, 'গুণীদের মুখে শুনেছি, ওমরের বেশির ভাগ রুবাইয়াতের মূল বক্তব্য ছিল, "এই বিরাট বিশ্ব-সংসার কোন্ নিয়মে চলে, কি করলে ঠিক কর্ম করা হয় এসব বোঝা তোমার আমার সাধ্যের বাইরে। অতএব যে দু'দিন এ সংসারে আছ সে দু'দিন ফুর্তি করে নাও; মরার পর কে কোথায় যাবে, কি হবে, না হবে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।" তারপর থেকে অন্য যে কোনো কবি এই মতবাদ প্রচার করে নূতন রুবাই লিখতেন তিনি তক্ষুনি সেটা ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতেন। তার কারণও সরল। ওমর রাজানুগ্রহ পেয়েছিলেন, প্রধান মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলুকও ছিলেন তাঁর ক্লাসফ্রেন্ড। তাই তিনি নির্ভয়ে ইসলাম বিরোধী এই চার্বাকী মতবাদ প্রচার করে যেতে পেরেছিলেন; কিন্তু পরের আমলে আর সব কবির সৌভাগ্য তা হয় নি—তাঁরা মোল্লাদের বিলক্ষণ ডরাতেন। তাই তাঁরা তাঁদের বিদ্রোহী মতবাদ ওমরের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আপন প্রাণ বাঁচাতেন—ওদিকে যা বলবার তাও প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে যেতেন।

'তাই দেখতে পাবেন, হাফিজের (এবং অন্য আরও কয়েক কবির) দিওয়ানে (তথাকথিত 'কম্‌প্লীট ওয়ার্কসে') ওমরের কবিতা, আবার ওমরের দিওয়ানে হাফিজের কবিতা। এ জট ছাড়িয়ে ওমরের কোন্‌গুলো, হাফিজের কোন্‌গুলো সে বের করা আজকের দিনে অসম্ভব।'

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর কোনো কম্মের নয়। তার স্বর্গপুরীর বর্ণনাতে তিনি বলেছেন,

"সেই নিরালা পাতায়-ঘেরা
বনের ধারে শীতল ছায়
খাদ্য কিছু, পেয়ালা হাতে,
ছন্দ গেঁথে দিনটা যায়।
মৌন ভাঙ্গি তার কাছেতে
গুঞ্জে তবে মঞ্জু সুর
সেই তো সখি স্বর্গ আমার,
সেই বনানী স্বর্গপুর।"

---

৪ সুপীরা মদ্য 'ভগবদ্-প্রেম' অর্থে ব্যাখ্যা করেন।

৫ 'রুবাই' একবচন, 'রুবাইয়াৎ' বহুবচন।

'অত সব বয়নাক্কার কী প্রয়োজন।

'এক দাবাতেই যখন তাবৎ কিস্তি মাত হয়?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কো শুধালেন, 'ওমর সম্বন্ধে নানারকমের আজগুবি গল্প শোনা যায়—আমার মন সেগুলো মানতে রাজি হয় না, কিন্তু সেগুলো মানা না-মানার চেয়েও বড় প্রশ্ন, খুদ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে, ইসলামের মত কট্টর ধর্মাবলম্বীদের দেশে তিনি তাঁর বিদ্রোহ জাহির করলেন কোন্ সাহসে? বুঝলুম না হয় রাজা আর প্রধানমন্ত্রী তাঁকে রক্ষা করছিলেন কিন্তু সেইটেই তো শেষ কথা নয়। সে যুগে দেশের পাঁচজন কি ভাবতো না ভাবতো তার হয়তো খুব বেশি মূল্য ছিল না কিন্তু মোল্লা সম্প্রদায়? সে যুগের রাজারাও তো ওদের সঙ্গে চলতেন।'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু ভেবে দেখুন তো, রাজাতে পোপেতে যদি ঝগড়া লাগে তবে শেষ পর্যন্ত কি হয়? হুকুম চালাবার জন্য রাজারা সৈন্যের উপর নির্ভর করেন। সৈন্যরা যদি রাজার প্রতি সহানুভূতি রাখে তবে তারা হুকুম পাওয়া মাত্রই মোল্লাদের ঠ্যাঙাতে রাজি; পক্ষান্তরে তারা যদি মোল্লাদের মতবাদে বিশ্বাস রাখে তবে তারা বিদ্রোহ করে, অর্থাৎ রাজাকে ধরে ঠ্যাঙায়।

'এ তো হল কমন-সেন্স। তাই এস্থলে প্রশ্ন ইরানের লোক সে আমলে কতখানি ইসলাম-অনুরাগী ছিল?

'ইতিহাস থেকে আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে—কিন্তু থাক, এসব কচকচানি হয়তো হ্যার নয়রাট পছন্দ করছেন না—'

নয়রাট বললেন, 'ফের এটিকেট? আর এটিকেট হলই বা—আমি আপনার বক্তব্যটা শুনছি ইন টার্মস্ অব্ চেস্। আপনি এখন ওপনিং গেম্ আরম্ভ করেছেন, তারপর মিড্ গেম্ আসবে—আমি দেখছি আপনি ঘুঁটিগুলো কি কায়দায় এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন—যা বলছিলেন বলে যান।'

আমি বললুম ইরানের সভ্যতা সংস্কৃতি আরবদের চেয়ে বহু শত বৎসরে খানদানী। ইরান ইসলাম প্রচারের বহু পূর্বেই রাজ্য-বিস্তার করতে গিয়ে গ্রীসের সঙ্গে লড়েছে, ভারতের পশ্চিম-সীমান্ত দখল করেছে, মিশনারীদের সঙ্গে টক্কর দিয়েছে, রোমানদের বেকাবু করেছে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হিসেবে ইরান বহু শত বৎসর ধরে পৃথিবীর পয়লা শক্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। পৃথিবীর সম্পদ ইরানে জড়ো হয়েছিল বলে ইরানীরা যে স্থাপত্য, যে ভাস্কর্য নির্মাণ করেছিল তার সঙ্গে তুলনা দেবার মতো কলানিদর্শন আজও পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। আর বিলাসবাসনের কথা যদি তোলেন তবে আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস ইরানীরা যে রকম পঞ্চেন্দ্রিয়ের পূর্ণতম আনন্দ গ্রহণ করেছে সেরকম ধারা তাদের পূর্বে বা পরে কেউ কখনো করতে পারে নি।

'এই ধরুন না, আরব্য-উপন্যাস। অথচ বেশির ভাগ গল্পে যে ছবি পাচ্ছেন সেগুলো আরবের নয়, ইরানের—আমার ব্যক্তিগত 'ফেন্সি' মত নয়, পণ্ডিতেরা এ কথাই বলেন।

'মনে পড়ছে সেই গল্প?—যেখানে এক সুন্দরী তরুণী এসে এক ঝাঁকা-মুটেকে নিয়ে চলল হরেক রকমের সওদা করতে। মাছমাংস, ফলমূল কেনার পর সে তরুণী যে সব সুগন্ধি দ্রব্য কিনল তার সব কটা জিনিসের অনুবাদ কি ইংরিজী, কি ফরাসী, কি বাঙলা কোনো ভাষাতেই সম্ভব হয় নি—কারণ, এসব জিনিসের বেশির ভাগই আমাদের অজানা। এমন কি আজকের দিনের আরবরা পর্যন্ত সে-সব বস্তু কি, বুঝিয়ে বলতে পারে না। তুলনা দিয়ে বলছি, আজকের দিনে প্যারিসে যে পঁচিশ রকমের সেন্ট বিক্রি হয় সেগুলোর বয়ান, ফিরিস্তি, অনুবাদ কি এস্‌কিমো ভাষায় সম্ভবে?

'ইরানের তুলনায় সে-যুগে আরবরা ছিল প্যারিসের তুলনায় অনুন্নত—অর্থাৎ সভ্যতা-সংস্কৃতি নিম্ন পর্যায়ে। সেই আরবরা যখন ধর্মের বাঁধনে একজোট হয়ে ইরানে হানা দিল তখন বিলাস-ব্যসনে ফুর্তি-ফার্তিতে বেএক্তেয়ার ইরানীরা লড়াইয়ে হেরে গেল। আপনাদের ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত দিতে গেলে গ্রীস-রোমের কাহিনী বলতে হয়, সে কাহিনী আমার বলার প্রয়োজন নেই। সেটা হবে "সুইটজারল্যান্ডে ঘড়ি আনার মত"।

'ইরানীরা মুসলমান হয়ে গেল, কেন হল সে-কথা আরেকদিন হবে, যারা হতে চাইল না অথচ জানত দেশে থাকলে অর্থনীতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন হতেই হবে, তারা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল আমার দেশ ভারতবর্ষে—সে ইতিহাসও এস্থলে অবান্তর।

'আরবরা মরুভূমির সরল, প্রিমিটিভ মানুষ; তারা ইরানের বিলাস-ব্যভিচার দেখে স্তম্ভিত—"শক্‌ট্", "আউট-রেজ্‌ড্"। আর ইরানীরাও আরবদের বেদুইন ধরন-ধারণ দেখে ততোধিক স্তম্ভিত এবং "শক্‌ট্"।

'তদুপরি আরেকটা কথা ভুললে চলবে না, আরবরা সেমিটি বংশের (ইহুদী গোত্রের সঙ্গে তাদের "মেলে"), আর ইরানীরা আর্য। জীবনাদর্শ ভিন্ন ভিন্ন; ধর্ম এক হলে কি হয়? প্যারিসের ক্রিশ্চান আর নিগ্রো ক্রিশ্চান কি একই ব্যক্তি?

'এইবার মোদ্দা কথায় ফিরে যাই ঃ ইরানীরা মুসলমান হল বটে (এবং এদের অনেকেই খাঁটি মুসলিম) কিন্তু তাদের মজ্জাগত মদ্যাদি পঞ্চমকার ছাড়তে পারলো না। তাই ইরানের জনসাধারণ ওমরের মদ্য-দর্শনবাদ খুশীসে বরদাস্ত করে নিল।

'দেশের লোক যখন গোপনে গোপনে মদ খায় তখন রাজার আর কি ভাবনা? মোল্লারা যা বলে বলুক, যা করে করুক—এবং একথাও রাজার অজানা ছিল না যে, বহু লোক আপন হারেমে বসে ঐতিহ্যগত মদ্যপানে কার্পণ্য করেন না।

'তাই ওমর বেঁচে গেলেন, রাজাও কোনো মুশকিলে পড়লেন না।

* * *

নয়রাট বললেন, 'আপনাদের ওমর খৈয়াম যা আমার ট্যুনিস-শেল্‌ও তা।'

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে শুধালুম, 'ট্যুনিস-শেল্ নিয়ে তো সব রসিকতার গল্প, আর খৈয়াম তো রচেছেন চতুষ্পদী।'

নয়রাট বললেন, 'মিলটা অন্য জায়গায়। আপনিই বললেন না, দুনিয়ার যত ঈশ্বর-বিদ্রোহী, মদ্যোৎসাহী চতুষ্পদী—তা সে ওমরের হোক, হাফিজের হোক, আত্তারের হোক, সব কটা এসে জুটেছে ওমরের চতুর্দিকে, ঠিক তেমনি রসিকতার গল্পে নায়ক যদি মাত্র দুজন হয়, আর তার একজন আরেক জনের উপর টেক্কা মারার চেষ্টা করে তবে শেষ পর্যন্ত সেগুলো ট্যুনিস-শেলের নামে চালু হবেই হবে। এগুলোকে তাই সাইক্‌ল্ (চক্র) বলা হয়। ওমর সাইক্‌ল্, ট্যুনিস-শেল সাইক্‌ল্ কিম্বা পল্‌ডি সাইক্‌ল্। ওমর যে-রকম ইরানের, ট্যুনিস-শেল্ তেমনি জর্মনীর কলোন শহরের আবার পল্‌ডি সুইটজারল্যান্ডের আপনাদের ভারতবর্ষে এরকম সাইক্‌ল্ আছে?'

আমি বললুম, 'এস্তার! হর-পার্বতী সাইক্‌ল্, গোপালভাঁড় সাইক্‌ল্, শেখ চিল্লী সাইক্‌ল এবং আরও বিস্তর। কিন্তু পল্‌ডি সাইক্‌লের বিশেষত্ব কি?'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি হলেন অতিশয় খানদানী ঘরের ছেলে, উত্তম বেশভূষায় ছিমছাম না হয়ে বেরোন না, সকলের সঙ্গে অতিশয় ভদ্র ব্যবহার—এ তো সব হল; কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, তিনি একটি পয়লা নম্বরের বক্কেশ্বর, আনাড়ির চূড়ামণি—বে অকুফের শিরোমণি। দু-একটি উদাহরণ দিচ্ছি—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'কিন্তু প্লীজ, অশ্লীলগুলো না।'

নয়রাট বেদনাতুরতার ভান করে বললেন, 'ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে নিয়ে ঐ তো বিপদ। একশ বার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, শ্লীল-অশ্লীল—একেবারে স্বতঃসিদ্ধরূপে, অর্থাৎ perse—পৃথিবীতে নেই, যেরকম নিজের থেকে "ডার্ট" বা ময়লা বলে কোন জিনিস হয় না। অস্থানে পড়লেই জিনিস ডার্ট হয়। ডাস্টবিনের ভিতরকার ময়লা ময়লা নয়—একথা কেউ বলে না, "ডাস্টবিন ময়লা হয়ে গিয়েছে, ওটা সাফ করো", বলে, "ডাস্টবিন ভর্তি হয়ে গিয়েছে।" ঠিক তেমনি সুন্দরীর ঠোঁটের উপর লিপস্টিক ডার্ট নয়, কিন্তু যদি সেই লিপস্টিক আমার গালে লেগে যায়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার! আবার!'

আমার মনে হল, ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাড়াবাড়ি করছেন, তাই নয়রাটকে সমর্থন করার জন্য গুনগুন করলুম,

'অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে
ঘুমে ঢুলুঢুলু আঁখি'

দুজনেই জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

আমি সালঙ্কার সবিস্তার নন্দকুমার গণ্ডে চন্দ্রাবলীর তাম্বুলরাগের বর্ণনা দিলুম।

নয়রাটকে আর পায় কে?—চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'শুনলে গিন্নি, শুনলে? শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয়দের স্বয়ং ভগবান, আমাদের যেরকম যীশুখ্রীস্ট। তিনি যদি রাধা ভিন্ন অন্য রমণীকে দয়া দেখাতে পারেন, তবে আমার গালে কিংবা ইভনিং শার্টে লিপস্টিক আবিষ্কার করলে তুমি মর্মাহত হও কেন?'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী ঢিড্‌ মিথ্যেবাদী রে, বাবা! আমি আর মা-বোন ভিন্ন অন্য মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে হলে যে পুরুষ—হ্যাঁ পুরুষই বটে—শব্দের জন্য পকেট-ডিক্সনারি বের করে তার গালে লিপস্টিক! ডু লিবার হ্যার গট ফন বেনটাইম (বাঙলায়—"হে পিণ্ডিদাদন খানের মা কালী!")'

আমি বললুম, 'কিন্তু হ্যার নয়রাট, একটা ভুল করবেন না। দেবতা যা করবার অধিকার রাখেন, সাধারণ মানুষের তা নেই। কিন্তু সে কথা থাক, শ্লীল,-অশ্লীল সম্বন্ধে আপনি কি যেন বলছিলেন?'

নয়রাট বললেন, 'Perse' বাই ইটসেলফ যে রকম ডার্ট হয় না, ঠিক তেমনি স্ব-হক্কে কোনো জিনিস অশ্লীল নয়। উদাহরণ দিয়ে বলি—যেখানে বাইবেল পাঠ হচ্ছে, সেখানে হঠাৎ পেটের ব্যামো নিয়ে আরম্ভ করা অশ্লীল এবং তার চেয়েও ভালো দৃষ্টান্ত, ডাক্তাররা যেখানে যৌন সম্পর্কের আলোচনা করছেন, সেখানে বেমক্কা বাইবেল পাঠ আরম্ভ করা তার চেয়েও বেশি অশ্লীল।

'অর্থাৎ বক্তব্য বস্তু প্রতীয়মান, জাজ্বল্যমান করার জন্য যে কোন দৃষ্টান্ত, যে কোন তথ্য, যে কোন গল্প শ্লীল—তা সে পঁচিশবার দাস্তের বয়ানই হোক, গণিকাজীবনকাহিনীই হোক। পক্ষান্তরে ইর্‌রেলেভেন্ট আউট অব প্লেস (বেমক্কা) জিনিস, তা সে ধর্মসঙ্গীতই হোক আর টমাস আকুনিয়াসের জীবনই হোক।'

আমার আশ্চর্য লাগল। কারণ দেশের ভটচাজ মশাই ('পদটীকা' দ্রষ্টব্য) এবং কাবুলের মৌলানা মীর আসলম ('দেশে-বিদেশে' দ্রষ্টব্য) ঐ একই কথা বলেছেন।

আমি বললুম, 'খাঁটি কথা। কিন্তু এসব থাক না এখন। বরঞ্চ একটা পল্‌ডি গল্প বলুন

নয়রাট বললেন, 'সেই ভালো।'

'পিয়ন পল্‌ডিকে মনি অর্ডারের টাকা দিলে। পল্‌ডি দিল জোর টিপস্। পাশে বসেছিলেন বন্ধু, তিনি বললেন, 'পল্‌ডি, অত বেশি টিপস্ দিলে কেন?' পল্‌ডি পরম সন্তোষ সহকারে মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'ঐ তো! কিসসু জানো না, কিসসু সমঝো না; জোর টিপস্ দিলে ঘন ঘন মনি অর্ডার নিয়ে আসবে না?'

আমার হাসি শেষ হবার পূর্বেই নয়রাট বললেন, 'কিংবা ধরুন, পল্‌ডির বুকে ব্যথা। ডাক্তার অনেকক্ষণ ধরে বুক-পিঠ বাজিয়ে বললেন, ঠিক ডায়গ্‌নোজ করতে পারছি নে। তবে মনে হচ্ছে অত্যধিক মদ্যপানই কারণ।'

পল্‌ডি হেসে বললেন, 'তাই নিয়ে বিচলিত হবেন না, ডাক্তার, আমি না-হয় আরেকদিন আসব, যেদিন আপনি অত্যধিক মদ্যপান করে মাতাল হয়ে যান নি।'

নয়রাট বললেন, 'পল্‌ডি রসিকতাতে শুধু থাকে রস। ও-গুলোর ভিতর দিয়ে পল্‌ডির দেশ, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর পাওয়া যায় না কিন্তু ট্যুনিস-শেলের গল্পের ভিতর দিয়ে জর্মনি, কলোনের শ্রমিকশ্রেণী এবং তাদের জীবনধারণ সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায় এবং তাতে করে গল্পগুলো বেশ একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের রঙ ধরে। এই ধরুন পাদ্রী সম্প্রদায়কে নিয়ে আমরা প্রায়ই ব্যঙ্গ করে থাকি। তার-ই একটা ট্যুনিস-শেল্ সাইক্লে বেশ খানিকটে রসের সৃষ্টি করেছে।

'ট্যুনিস আর শেল্ একখানা দশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়েছে (কটলেটের গল্পে পূর্বেই বলেছি তারা হরদম রাস্তায় টাকা কুড়িয়ে পায়) এবং ঝগড়া লেগে গিয়েছে টাকাটার ওপর কার হক্ক। ট্যুনিস বলে সে আগে দেখেছে; শেল্ বলে সে আগে কুড়িয়ে নিয়েছে এবং পজেশন ইজ থ্রি-ফোর্থ অব ল'। তারপর এ বলে ও মিথ্যেবাদী ও বলে এ মিথ্যেবাদী। করতে করতে হঠাৎ ট্যুনিস বললে, "তাই সই, মিথ্যেবাদী হওয়াটাও কিছু সোজা কর্ম নয়, আমি হচ্ছি পাঁড় মিথ্যেবাদী আর তুই হচ্ছিস পেঁচি (এমেচার) মিথ্যেবাদী।" শেল্ বললে, "গাঁজা, ঠিক তার উল্টো।"

'তখন স্থির হল পাল্লা দিয়ে দুজনে মিথ্যে কথা বলবে, যে সব চেয়ে বেহুদা বেশরম মিথ্যে বলতে পারবে, টাকাটা সে-ই পাবে।

'তখন ট্যুনিস বিসমিল্লা বলে আরম্ভ করলে,—

"পরশুদিন ঘরে মন টিকছিল না বলে বাইরে এসে এক লম্ফে চলে গেলুম আমেরিকায়। সেখানে পৌঁছলুম এক সমুদ্রপারের 'লিডো'তে। দেখি হাজার হাজার মেয়েমদ্দ সেখানে চান করছে, সাঁতার কাটছে। আর ছুঁড়িগুলো কী বেহায়া! আমার এই একটা নেক্‌টাইয়ের কাপড় দিয়ে তিনটে মেয়ের সুইমিং কস্টুম হয়ে যায়। (ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'পেটার, আবার?' নয়রাট বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, টাপেটোপে বলছি'।) আমার ভয়ঙ্কর রাগ হল। করলুম কি, সব কটা হুলো-মেনিকে ধরে একটা ব্যাগে পুরে দিলুম আরেক লাফ। এবারে পৌঁছলুম, ফুজি-আমা পাহাড়ের কাছে। ব্যাগের ভিতর তিন হাজার বেড়াল ক্যাঁও ক্যাঁও করছিল বলে আমার দারুণ বিরক্তি বোধ হল! তাই আস্ত ব্যাগটা গিলে ফেলে গোটা আড়াই ঢেকুর তুললুম, তারপর—"

'শেল্ বাধা দিয়ে বললে, "এতে আর মিথ্যে কোন্‌খানটায় হল? আমি তো তোর সঙ্গেই ছিলুম, পষ্ট দেখলুম, তুই এসব করছিলি"।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা গল্পটা আগে শোনেন নি বলে হাসলেন। আমিও বললুম, 'এ গল্পটা ভারি নতুন ধরনের। শেলের উত্তরটা অত্যন্ত আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা এখনো শেষ হয় নি।'

আমরা বললুম, 'সে কি কথা?'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটি যদিও খাস কলোন শহরের, তবু তার টেকনিকে একটু চীনা পদ্ধতি এসে গিয়েছে। এ গল্পে দুটো "সারপ্রাইজ", কিংবা বলতে পারেন দুটো কিক আছে। খুলে বলছি :

'ট্যুনিস্ আর শেল্ যখন রাইন নদীর পাড়ের রেলিঙে ভর করে মিথ্যের জাহাজ ভাসাচ্ছিল, তখন এক পাদ্রী সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্তসৌন্দর্য নিরীক্ষণ করছিলেন। অনিচ্ছায় কিংবা স্বেচ্ছায়ও হতে পারে, ট্যুনিস শেলের বিকট মিথ্যের বহর তাঁর কানে এসে পৌঁচেছিল। থাকতে না পেরে বললেন, "ছি, ছি, বাছারা; এ-রকম ডাহা মিথ্যে তোমরা মুখ দিয়ে বার করছো কি করে? জানো না, মিথ্যা কথা মহাপাপ? আমি জীবনে কখনো মিথ্যা বলি নি।"

'ট্যুনিস পাদ্রীর কথা শুনে প্রথম হকচকিয়ে গেল, তারপর থ মেরে গেল। সম্বিতে ফিরে শেষটায় ক্ষীণকণ্ঠে, বাজি হারার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেলকে বললে, "ভাই শেল্, নোটটা ওকেই দে, টাকাটা ওরই পাওনা। তুই এ-রকম পাঁড় মিথ্যে বলতে পারবি নে; আম্মো পারবো না"।'

আমি বললুম, 'খাসা গল্প; এটা মনে রাখতে হবে।'

ফ্রান্ৎসিস্কা বললেন, 'কিন্তু আমি জানি, পেটার ওখানে থাকলে প্রাইজটা সে-ই পেত।'

আমি নয়রাটকে বললুম, 'গল্পটি সুন্দর, কিন্তু এতে টিপিকাল কলোনের কি আছে? আমাদের মোল্লা-পুরুত সম্বন্ধেও তো এরকম বদনাম আছে।'

নয়রাট বললেন, 'আমি জানতুম না। তবে শুনুন আরেকটা—আর এর জবাব আপনি দিতে পারবেন না।

'ট্যুনিস-শেল্ আবার একখানা দশ টাকার নোট পেয়েছে (ট্যুনিস-শেল্ সাইক্লের ভিতরে এ হচ্ছে "নোটের সাব্-সাইকেল্")। এবারে ঝগড়া হয় নি। দুজনে সেই টাকা দিয়ে মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে পড়েছে রাস্তায়। পুলিশ তাদের পৌঁছে দিয়েছে হাসপাতালে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভেঙেছে আর নেশা কেটেছে। দেখে চতুর্দিক ফিটফাট, ছিমছাম। ট্যুনিস শুধালে, "ওরে শেল্, এ আবার এলুম কোথায়?" শেল্ বললে, "আমিও তাই ভাবছি। দাঁড়া, দেখে আসছি।"

'শেল্ গেল ঘরের বাইরে। পাঁচ সেকেন্ডের ভিতর ছুটে এসে বললে, "ওরে ট্যুনিস —আমরা ভারতবর্ষে পৌঁছে গিয়েছি—রাতারাতি আমাদের ভারতে পাচার করে দিয়েছে।"

'ট্যুনিস তো তাজ্জব!' শুধালে, "কি করে জানলি?"

'বললে, "করিডরে মোটা হরপে লেখা আছে", "Die Toiletten befinden sich auf jenseits des Ganges".'

নয়রাট বললেন, 'অর্থাৎ, "করিডরের দুপাশে বাথরুমের ব্যবস্থা আছে।" এখন 'করিডর' শব্দ জর্মনে Gang আর Gang-এর দুপাশে—অর্থাৎ ষষ্ঠীতৎপুরুষ Ganges, তার মানে বাথরুম গঙ্গার (নদীর) দুপারে।'

'তাই ট্যুনিস-শেল্ রাতারাতি ভারতে পৌঁছে গিয়েছে।'

নয়রাট বললেন, 'দেশভ্রমণের গল্পই যদি উঠল তবে সেই সাবসাইক্লই চলুক।'

আমি বললুম, 'উত্তম প্রস্তাব।'

নয়রাট বললেন, 'ট্যুনিস-শেল্ পেটের ধান্দায় হামবুর্গ গিয়ে জাহাজের খালাসির চাকরি নিয়ে পৌঁচেছে গিয়ে ইস্তাম্বুল শহরে, সেখানে—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'না, পেটার, ওটা চলবে না।'

নয়রাট ব্যথা-ভরা নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গল্পটা কিন্তু ছিল খাসা; তার আর কি করা যায়! তবে তাদের নিয়ে যাই নিউ ইয়র্কে।

'হয়েছে কি, ট্যুনিসের এক মামা নিউ ইয়র্কে দুপয়সা রেখে মারা গিয়েছে। ট্যুনিস উকিলের চিঠি পেয়েছে তাকে সেখানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে নিজের সনাক্ত দিয়ে টাকাটা ছাড়িয়ে আনতে হবে। ওদিকে ট্যুনিস আবার ভয়ানক ভীতু ধরনের লোক। একা বিদেশ যেতে ডরায়—শেল্‌কে বললে, "ভাই, তুই চ।" শেল্ ভাবলে—আর আমিও তাই ভাবতুম,—মন্দ কি, ফোকটে মার্কিন মুল্লুকটা দেখা হয়ে যাবে।

'তারা নিউ ইয়র্ক পৌঁছল ঠিক বড়দিনের দিন। তামাম মার্কিন দেশ ঝেঁটিয়ে এসে জড়ো হয়েছে নিউ ইয়র্কে পরব করার জন্য, সব হোটেল আগা গোড়া ভর্তি, করিডরে পর্যন্ত ক্যাম্প কট্ পেতে শোবার ব্যবস্থা ফালতো গেস্টদের জন্য করা হয়েছে।

'মহা দুর্ভাবনায় পড়ল দুই ইয়ার। ডিসেম্বরের শীতে আশ্রয় না পেলে শীতেই অক্কা-লাভ। দুই বন্ধু কলোন গির্জের মা-মেরিকে স্মরণ করে এক ডজন মোমবাতি মানত করলে। আপনি তো মুসলমান, এসব মানেন না, কিন্তু—'

আমি বললুম, "আলবত মানি। একশবার মানি। কলকাতায় মৌলা আলীর দর্গায় মোমবাতি মানত কবলে বহু বাসনা পূর্ণ হয়। আর আমাদের দেশে এমন জায়গাও আছে যেখানে মানত করলে মোকদ্দমা পর্যন্ত জেতা যায়।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'ডিভোর্স পাবার দরগা আছে?'

আমি বললুম, 'বিলক্ষণ, তবে সেখানে স্বামী-স্ত্রীকে একসঙ্গে গিয়ে কামনাটা জানাতে হয়।'

নয়রাট আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' তারপর গল্পের খেই তুলে নিয়ে বললেন, 'কলোনের মা-মেরি বড় জাগ্রত দেবতা। একটা হোটেলে শেষটায় একটা ডবল রুম জুটে গেল, কিন্তু ব্যবস্থাটা শুনে দুই ইয়ারই আঁতকে উঠলেন।

'ঘর পঞ্চাশ তলায়, আর লিফট্ বিগড়ে গিয়েছে।

'দুইজনাই একসঙ্গে বললে, "হে মা-মেরি, এতটা দয়াই যখন করলে, তখন লিফট্‌টা সারাতে পারলে না মা"?'

আমি বললুম, 'আমাদের গোপালভাঁড়ও তাই বলেছিল,—

"এত দয়াই যদি করলি, মা কালী,
তবে আরেকটু দয়া করে,
বনে আছে দেদার ফড়িং
খা না দুটো ধরে"।'

নয়রাট বললেন, 'গল্পটা কি?'

আমি বললুম, 'আপনাকে একদিন সময়মত আমাদের "গোপালভাঁড়-সাইক্ল" শোনাব, তার অনেকগুলি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার সামনে বলা চলবে না।'

নয়রাট বললেন, 'তবে নিয়ে চলুন আপনাদের ডিভোর্স-দর্গায়।'

সিগরেট ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা ভাঁড়ারঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আমি বললুম, 'অত তাড়া কিসের? ভারত যাবার জাহাজ আরও সপ্তাহখানেক পর ছাড়ে।'

নয়রাট বললেন, 'তখন ট্যুনিস শেল্‌কে বললে, "ভাই, এ ছাড়া আর উপায় যখন নেই তখন চ, সিঁড়ি ভাঙি আর কি?"

'শেল্‌ বললে, "একটা ব্যবস্থা করলে হয় না, প্রতি তলা উঠতে উঠতে তুই এক-একটা করে গল্প বলবি আর তাতেই মশগুল হয়ে আমরা পঞ্চাশতলা বেয়ে নেব। তুই তো মেলা গল্প জানিস।"

'ট্যুনিস বললে, "যা বলেছিস, সাধে কি আর তোকে সঙ্গে এনেছিলুম? তবে শোন," বলে আরম্ভ করলে সিঁড়ি ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলা।'

নয়রাট বললেন, 'সে কত বাহারে গল্প! আমি গল্প কলেক্‌ট্‌ করি নে, কিন্তু আমার এক বন্ধু আছেন, তাঁর সঙ্গে আমি আপনাকে আলাপ করিয়ে দেব, তিনি সব ক'টা জানেন।

'তা সে কথা থাক।'

'ট্যুনিস আর শেল্‌ এক এক তলার সিঁড়ি ভাঙে আর ট্যুনিস এক একখানা জান্‌-তর্‌-র্‌-র্‌ গল্প ছাড়ে। হেসেখেলে বিন্‌ মেহন্নত, বিন্‌ কসরতে তারা পঁচিশতলা এক ঝটকায় মেরে দিলে।

'তখন ট্যুনিস বললে, "ভাই শেল্‌, আমার সব গল্প খতম। আর কোন গল্প মনে পড়ছে না।"

তখন শেল্‌ বললে, "ঘাবড়াস নি। আমারও কিছু পুঁজি আছে।"

'বলে তখন শেল্‌ আরম্ভ করল গল্প বলতে। সেও কিছু কম বাহারে নয়, তবে ট্যুনিস তালেবর ব্যক্তি, তার সঙ্গে তুলনা হয় না।

'করে করে তারা আরও চব্বিশখানার সিঁড়ি ভাঙলে—গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে।

'মাত্র একতলা বাকি। শেল্‌ দুম্‌ করে মাটিতে বসে পড়ল। এক ঝটকায় হোক আর উনপঞ্চাশ ঝটকায়ই হোক পা-গুলো তো আর গল্প শুনতে পায় না। শেল্‌ ক্লান্তিতে নেতিয়ে পড়ে বললে, "ভাই আমার গুদোমও খতম।"

'তখন ট্যুনিশ বললে, "কুছ পরোয়া নদারদ। আমার একখানা গল্প মনে পড়েছে—একদম সত্যি গল্প।—আমরা ফ্লাটের চাবি সঙ্গে আনতে ভুলে গিয়েছি"।'

* * *

লঞ্চ খেতে এসে তখন প্রায় চায়ের সময় হয়ে গিয়েছে অথচ গাল-গল্পের কম্বলের ভিতর এমনি ওম জমে গিয়েছে যে সে কম্বল ফুটো করে বেরতে ইচ্ছে করে না। শীতের দেশ তো—উভয়ার্থে শীতের দেশ, ইয়োরোপীয়দের মনেও শীত; আড্ডা জমিয়ে সঙ্গ-সুখের আলিঙ্গনে সেটাকে গরম করতে জানে না—তাই এদের কুণ্ডুলিতে বহুদিন পরে যেন 'বসন্ত রেস্টুরেন্টে'র আনন্দ পেলুম।

শেষটায় একটা হাফ্‌-মোকা পেয়ে বললুম, 'আমি তা হলে উঠি।'

নয়রাট একটি কথা বললেন, 'কেন?'

আমি একটু অবাক হয়ে গেলুম। এরকম অবস্থায় সচরাচর বলা হয়, 'সে কি কথা? এখনই যাবেন কেন?' কিংবা 'বড্ড কাজ পড়ে আছে বুঝি?' অথবা অন্য কিছু। আমার কোনো জবাব যোগাল না।

নয়রাট বললেন, 'দেখুন মশাই, আপনাকে বলি নি, কিন্তু আপনাকে আমি বিলক্ষণ চিনি। গেল কয়েকদিন ধরে যখনই লেকের পাড় দিয়ে কাজ-কর্মে কোথাও যেতে হয়েছে, তখনই আপনাকে দেখেছি, ঐ একই বেঞ্চের উপর—তাও আবার একই পাশে—বসে আছেন। শুনেছি, ইংলন্ডের পার্কে চেয়ারে বসলে তার জন্যে ট্যাক্স দিতে হয়—'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, 'সেখানে দম ফেলতেও ট্যাক্স দিতে হয় এবং তারই ভয়ে কেউ যদি দম বন্ধ করে, তবে মবে গিয়ে তাকে ডেথ্‌-ট্যাক্স দিতে হয়।'

নয়রাট বললেন, 'তাহলে বিবেচনা করি সেখানে বিয়ের উপরও ট্যাক্স আছে। আহা, ইংলন্ডে জন্মালে হত।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা বললেন, ''আহা আমি যদি তিব্বতে জন্মাতুম। সেখানে প্রত্যেক রমণীর পাঁচটা করে স্বামী থাকে। আর সব কটাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়।'

আমি বললুম, 'ষাট, ষাট (ইংরিজিতে tut tut), ও রকম অলুক্ষণে কথা কইবেন না।'

সমস্বরে, 'কেন?'

আমি বললুম, 'তাহলে আসছে জন্মে পেটারকে জন্মাতে হবে ইংলন্ডে আর মাদাম ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা (বলে তাঁর দিকে 'বাও' করে বললুম), আপনাকে জন্ম নিতে হবে তিব্বতে।'

দুজনাই কিচির-মিচির করে উঠলেন। তার থেকে যে প্রশ্ন ওতরালো তার মোটামুটি জিজ্ঞাসা, 'আসছে জন্মে' কথাটার মানে কি? আমরা তো মরে গিয়ে হয় স্বর্গে যাব, কিংবা নরকে, কিংবা কল্পুর হয়ে যাব, 'আসছে জন্মে' তার অর্থ কি?

আমি বললুম, 'এই যে পেটার শুধালেন, আমি বেঞ্চিতে সর্বসময় বসে থাকি কেন? তার অর্থ আমি চলাফেরা, হাঁটাহাঁটি করি না কেন? সুইট্‌জারল্যান্ডে যদি ইংলিশ্‌ কায়দায় বেঞ্চিতে বসতে হত তাহলে ট্যাক্স দিয়ে দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যেতুম সেকথা আমি খুব ভালো করেই জানি কিন্তু চলাফেরা করলে আমাকে খেসারতি দিতে হবে অনেক বেশি।'

লাইন কোন্‌ দিকে চলেছে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা যেন তার খানিকটা আভাস পেয়েছেন বলে মনে হল। পেটার কিন্তু রাত-ভর হদিস না পেয়ে শুধালেন, 'এর কোনো মানে হয় না, আপনি রাস্তায় হাঁটছেন, তার জন্য ট্যাক্স দিতে হবে কেন? ইংলন্ডের মতো বর্বর দেশেও ও-রকম ট্যাক্স নেই।'

আমি বললুম, 'পরজন্মে মানুষ এ পৃথিবীতে আসে পূর্বজন্মের কামনা নিয়ে। আমি সমস্ত দিন যতদূর সম্ভব চুপচাপ বসে থাকি যাতে করে ভগবান পরজন্মে আমাকে এমন জায়গায় বসান যেখানে আমাকে কোন কিছু না করতে হয়। আমি যদি হাঁটাহাঁটি করি. তবে ভগবান ভাববেন, আমি ঐ কর্মই পছন্দ করি, আর আমাকে এ জগতে পাঠাবেন পোস্টম্যান করে। তখন মরি আর কি, জলঝড়ে, বিষ্টিতুফানে এর বাড়ি ওর বাড়ি চিঠি-পার্শেল বয়ে বয়ে।'

ফ্রান্‌ৎসিস্‌কা শুধালেন, 'আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারছি নে কিন্তু কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছি। আপনি বলতে চান, মানুষ মরে গিয়ে এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। সে কি করে হয়?'

জ্ঞানী পাঠক! অপরাধ নেবেন না। আপনি সেস্থলে থাকলে আমার অনেক পূর্বেই বুঝে যেতেন, 'জন্মান্তরবাদ' এরা জানে না এবং আপনি সেইটি বুঝতে পেরে তক্‌খুনি তার শাস্ত্রসম্মত সদুত্তর দিয়ে দিতেন। কিন্তু আমি তো পণ্ডিত নই, দেশ আমাকে আদর করে না, দেশ আমাকে খেতে-পরতে দেয় না, তাই তো আমি লক্ষ্মীছাড়া গৃহহারা হয়ে গিয়েছি বিদেশ, আমি অতশত বুঝতে পারব কি করে?

তদুপরি আরেক কথা আছে। আমি মুসলমানের ছেলে। ইসলাম জন্মান্তরবাদ মানে না; যদিও প্রাগৈতিহাসিক যুগে মক্কাবাসীরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতো। সেই যুগের একটি আরবী কবিতা এই সুবাদে মনে পড়ল।

কবিতাটির গীতিরস বাঙলাতে অনুবাদ করার মত বাঙলা-ভাষা-জ্ঞান আমার নেই

কিন্তু কল্পনা-চতুর পাঠক হয়তো আমার অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি পেরিয়ে গিয়ে ঠিক তত্ত্বটি সমঝে যাবেন। মরুভূমির আরব বেদুইন প্রিয়াকে উদ্দেশ করে বলছে,

প্রিয়ে,
আরবভূমি মরুভূমি, নীরস কর্কশ
তোমার আমার প্রেমের সুধাশ্যামলিম-রস
কেউ বুঝতে পারল না।
তাই সর্বদেহমনহৃদয় দিয়ে প্রার্থনা করি,
তুমি যেন এমন দেশে জন্মাও,—
—আসছে জন্মে—
কত শত শতাব্দীর পরে তা জানিনে,
যেখানে মানুষ জলে ডুবে আত্মহত্যা করার
আনন্দ অনায়াসে অনুভব করতে পারে।

এর টীকা অনাবশ্যক। আরব দেশে হাঁটু-জলের বেশি গভীরতর কোনো প্রকার নদীপুকুর নেই। তাই কবি জন্মান্তরে সেই দেশের কামনা করেছেন যেখানে মানুষ জলে ডুবে চরম শান্তি পায়।

সে দেশ বাঙলা দেশ। চেরাপুঞ্জির দেশ, যেখানে সব চেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। নদীনালা, পুকুর-হাওরে জলের থৈ থৈ।

আরব বেদুইন কবি এই দেশই মনে মনে কামনা করেছিল।

* * *

আমি বললুম, 'আসছে জন্মের কথা থাক। আপনি যে এ জন্মের কাহিনী আরম্ভ করেছিলেন সেইটি তো শেষ করলেন না। আপনি বলছিলেন আপনার গুটিকয়েক শখ পূরণ করার জন্য আপনি একটানা ছাব্বিশ বছর খেটে পয়সা জমিয়ে এখন দিব্য আরাম করতে পারছেন। আপনার শখগুলো কি?'

নয়রাট বললেন, 'এক নম্বর দাবা-খেলা আর দু নম্বর—বলতে একটু বাধোবাধো ঠেকছে।'

আমি বললুম, 'এইবার আপনারা ভদ্রতা আরম্ভ করলেন!'

নয়রাট বললেন, 'ভদ্রতায় ঠেকছে না। ঠেকছে অন্য জায়গায়। তবু না হয় বলেই ফেলি। আমি যখন ইস্কুল যেতুম তখন একটি জারজ ছেলেকে আমার ক্লাসের ছেলেরা বড় ক্ষ্যাপাত—ছেলেরা এ বিষয়ে যে কী রকম ক্রূর আর নিষ্ঠুর হতে পারে তার বর্ণনা আপনি নিশ্চয়ই মোপাসাঁয় পড়েছেন। আমি তখনো গল্পটি পড়ি নি কিন্তু আজ মনে হয় ছেলেটির দুর্দৈব কাহিনী মোপাসাঁ শতাংশের একাংশও বর্ণনা করতে পারেন নি। আমার নিজের বিশ্বাস যৌনবোধ না জন্মানো পর্যন্ত মানুষের মনে স্নেহ করুণা ইত্যাদি কোনো প্রকারের সদ্‌গুণ দেখা দেয় না। তাই বালকেরা হয় সচরাচর অত্যন্ত নিষ্ঠুর—আমি ক্লাসের আর সকলের চেয়ে ছিলুম বয়সে একটু বড়, আমার তখন নিজের অজানাতেই যৌনবোধ আরম্ভ হয়েছে এবং তাই ঐ হতভাগ্য ছেলেটার জন্য আমার হৃদয়ে গভীর বেদনার উদ্রেক হত। কিন্তু বয়সে বড় হলে কি হয়, আমি ছিলুম একে রোগাপটকা, তার উপর মারামারি হাতাহাতির প্রতি আমার আন্তরিক ঘৃণা। তাই আমি তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য না করতে পেরে মনে মনে বড় লজ্জা বোধ করতুম। তবে সুযোগ পেলেই, আর পাঁচটা ছেলের চোখের আড়ালে ওর হাতে একটা চকলেট দিতুম, রাস্তায় দেখা হলে একটা আইসক্রীম খাইয়ে দিতুম।

'প্রথম যে-দিন তাকে চকলেট দিয়েছিলুম সেদিন সে আমার দিকে বদ্ধ ইডিয়টের মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল, তারপর দরদর করে তার দু চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে এসেছিল। ক্লাসের তিরিশটে কসাইয়ের ভিতরেও যে একটি ছেলে গোপনে গোপনে তার জন্য হৃদয়ে দরদ ধরে এর কল্পনাও যে কখনো তার মনের কোণে ঠাঁই দিতে পারে নি।'

তাকিয়ে দেখি ফ্রান্‌ৎসিস্‌কার চোখ ছলছল করছে। অথচ তিনি নিশ্চয়ই এ-কাহিনী আগে শুনে থাকবেন। মনে মনে বললুম, নয়রাট সত্যই সহধর্মিণী পেয়েছেন। বাইরে বললুম, 'থামলেন কেন?'

বললেন, 'এখনো বাধো-বাধো ঠেকছে। তবু বলছি, কারণ এ বিষয়ে আমি মিশনারি।'

'ছেলেটাকে ধমক দিয়ে বললুম, "এই ফুল। চোখ মুছে ফেল। আর সবাই দেখে ফেললে তোকে জ্বালাবে আরও বেশি, আমাকেও রেহাই দেবে না।"

'চোখের জলের সঙ্গে আনন্দ আর কৃতজ্ঞতা মিশে গিয়ে তার চেহারা যে কি রকম বিকৃত হয়ে গিয়েছিল তার ছবি আমি আজও দেখতে পাই।

'আপনাকে কি বলবো, তারপর সেদিন ক্লাসে বসে যখনই আড়নয়নে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি, সে চোখ বন্ধ করে আছে, তার ঠোঁটের কোণে গভীর প্রশস্তির মৃদু হাস্য, আর গালের আপেল দুটো খুশিতে উপরের দিকে উঠে চোখ দুটো যেন চেপে ধরেছে। আমি তো ভয়ে মরি, মূর্খটা আবার কি বলতে গিয়ে কি না বলে ফেলে।

'তার পর দিন থেকে আরম্ভ হল আরেক আজব কেচ্ছা। ছেলেরা রুটিনমাফিক তাকে 'ব্যা—ড' বললে, চুলে ধরে টান দিলে, অন্যান্য প্রকরণেরও কোনো খাঁকতি হল না কিন্তু সেও রুটিনমাফিক চিৎকার চেঁচামেচি গালাগাল দিলে না—সে দেখি, চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে হাসছে। আমি ভাবলুম, হয়েছে, ছোঁড়াটা বোধ করি ক্ষেপে গেছে।

'বহু পরে সে আমাকে একদিন বলেছিল, সে নাকি তখন খুশিতে ডগো মগো, তার নাকি ভারি আনন্দ, তার আর কি ভয়, এই ক্লাসেই তার একটি বন্ধু রয়েছে, সে তাকে চকলেট খাইয়েছে।'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা। ফার্সীতে প্রবাদ আছে,—

"দুশ্‌মন্ চি কুনদ্, আগর্ মেহেরবান বাশদ্ দোস্ত!"

"দুশ্‌মন্ কি করতে পারে, দোস্ত যদি মেহেরবান হয়!"

নয়রাট উল্লসিত হয়ে ফ্রান্‌ৎসিস্‌কাকে বললেন, 'বউ, প্রবাদটা টুকে নাও তো, কাউকে দিয়ে ফার্সীতে লিখিয়ে নিজে জর্মনে গথিক হরফে তর্জমা লিখে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবো।'

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এতদিন ধরে আমি জুতসই একটা প্রবাদের সন্ধানে ছিলুম—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

তারপর বললেন, 'ছোঁড়াটা অদ্ভুত। আমাকে বিপদে না ফেলার জন্য আমার কাছে এসে ন্যাওটামি করতো না। একলা-একলি দেখা হলে শুধু আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি মুচকি হেসে চোখ বন্ধ করত।

তার কয়েকদিন পরে আমার জন্মদিন। ক্লাসের ছোঁড়াগুলোর প্রতি যদিও আমি ঐ ছোকরাটাকে জ্বালাতন করার জন্য বিরক্ত হতুম তবু অন্য বাবদে ওরাই তো আমার সঙ্গী; তাই তাদের নেমন্তন্ন করলুম, আর না করলে মা-ই বা কী ভাববে? তারা আমার জন্য উপহার আনলে বই, পেন্সিল, ছুরি, কলের লাটিম এবং আর পাঁচটা জিনিস। আমরা কেক, লেম্‌নেড খাচ্ছি, জোর হৈ-হুল্লোড় চলছে, এমন সময় বাড়ির দাসী আমার কানে কানে

বললে, "ছোটবাবু, তোমার জন্য একটি ছেলে নিচের তলায় গেটে দাঁড়িয়ে। কিছুতেই উপরে আসতে চায় না; তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

'আমার সব বন্ধুই তো গটগট করে উপরে আসে। এ আবার কে?

'গিয়ে দেখি সেই পাগলা। হাতে এক ঢাউস বাক্স। লজ্জায় লাল হয়ে বললে—"তোর জন্মদিনে একটা প্রেজেন্ট এনেছি। ছোট্ট একটা পাল-লাগানো ইয়ট"।'

'বলে কি? 'ইয়ট' তখন আমাদের স্বপ্নের বাইরে। পুরো বছরের জলখাবারের পয়সা জমালেও আমাদের ক্লাসের ধনী ছোকরা আডলফ্ পর্যন্ত 'ইয়ট' কিনতে পারে না—তখনো জানতুম না, সে পয়সাওলা ছেলে।

'লজ্জায় আমার মাথা কাটা গেল। বললুম, "তুই উপরে চ, কেক খাবি।"

'বললে, "না, ভাই, তুই যা, উপরে আরও অনেক সব রয়েছে।"

'আমি তাকে জোর করে উপরে টেনে নিয়ে এলুম। কোত্থেকে সাহস পেলুম আজও জানি নে। বোধ হয় ইয়টের কৃতজ্ঞতায়।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'ছিঃ, ও জিনিস নিয়ে ঠাট্টা করবেন না।'

নয়রাট বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। তার পর উপরে কি হল ঠিক বলতে পারব না। প্রথমটায় সবাই থ মেরে গেল। তারপর একে একে সক্কলেই পাগলার সঙ্গে শেক-হ্যান্ড করলে। তার চোখ দিয়ে আবার সেই পয়লা দিনের মতো ঝরঝর করে জল নেমে এল।

'সেই দিনই আমি মনস্থির করলুম, বড় হলে আমি সর্বত্র এরকম ছেলেদের অন্যায় অত্যাচার থেকে বাঁচাবো। ভগবান আমাকে আজ দেখিয়ে দিয়েছেন, এ শক্তি আমার ভিতরে আছে।'

নয়রাট হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন, 'এখ্খুনি আসছি; আমি একটা টেলিফোন করতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

বুঝলুম, বিনয়ী লোক, লজ্জা ঢাকবার অবকাশ খুঁজছেন।

[ময়ূরকণ্ঠী—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

হিটলারের শেষ প্রেম

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে রাত দশটার সময় হামবুর্গ বেতার কেন্দ্র তার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রোগ্রাম হঠাৎ বন্ধ করে দিয়ে ঘোষণা করলো—

"আমাদের ফ্যুরার আডল্‌ফ হিটলার বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

যে-সময়ে এ নিদারুণ ঘোষণাটি করা হয়, তখন প্রোগ্রামমাফিক কথা ছিল, 'ইঁদুর ধ্বংস করার উপায়।" এই নিয়ে হিটলার-বৈরীরা এখনো ঠাট্টা-মস্করা করেন।

যেসব জর্মন বেতার-ঘোষণাটি শুনেছিল, তাদের অনেকেই যে বিরাট শক্ পেয়েছিল, সে নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এদের অনেকেই সরলচিত্তে বিশ্বাস করতো, আশা রাখতো—যে হিটলার ক্রমাগত পঁচিশ বৎসর বহু উৎকৃষ্ট সংকটে যেন ভাগ্যবিধাতার অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে, অবলীলাক্রমে বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান করে সে-সব সংকট উত্তীর্ণ হয়েছেন এবারেও তিনি আবার শেষ মোক্ষম ভেল্কিবাজি দেখিয়ে তাবৎ মুশকিল আসান করে দেবেন। তার অর্থ; যে-সব রুশ সৈন্য বার্লিন অবরোধ করেছে তারা স্বয়ং হিটলার-চালিত আক্রমণে খাবে প্রচণ্ডতম মার, ছুটবে মুক্তকচ্ছ হয়ে মস্কো বাগে। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন ইংরেজ সৈন্যও পড়ি-মরি হয়ে ফিরে যাবে আপন আপন দেশে। রাহুমুক্ত ফ্যুরার—পথপ্রদর্শক সর্বোচ্চ নেতা পুনরায় ইয়োরোপময় দাবড়ে বেড়াবেন।

এরা যে মোক্ষম শক্ পেয়েছিল সে তো বোঝা গেল। কিন্তু তার চেয়েও মোক্ষমতর শক্ পেল কয়েকদিন পর যখন বেতার ঘোষণা করলে, হিটলার আত্মহত্যা করার পনেরো ঘণ্টা পূর্বে এফা ব্রাউন নামক একটি কুমারীকে বিয়ে করেন। কারণ, জর্মনির দশ লক্ষের ভিতর মাত্র একজন হয়তো জানতো যে, হিটলারের একটি প্রণয়িনী আছেন এবং তাঁর সঙ্গে তিনি স্বামী-স্ত্রীরূপে বছর বারো-তেরো ধরে জীবনযাপন করছেন। নিতান্ত অন্তরঙ্গ যে কয়েকজন এই "গুপ্তি প্রেমের" খবর জানতেন, তাঁরা এ-বাবদে ঠোঁট সেলাই করে কানে ক্লরফর্ম ঢেলে পুরো পাক্কা নিশ্চুপ থাকতেন। কারণ হিটলারের কড়া আদেশ ছিল, তাঁর এই গুপ্তিপ্রেম সম্বন্ধে যে-কেউ খবর দেবে বা গুজব রটাবে, তিনি তার সর্বনাশ করবেন। তার কারণও সরল। তাঁর প্রপাগান্ডা মিনিস্টার গ্যোবেল্‌স্ দিনে দিনে বেতারে খবরের কাগজের মারফতে হিটলারের যে মূর্তি গড়ে তুলেছিলেন (আজকের দিনের ইংরেজিতে "তার যে 'ইমেজ' নির্মাণ করেছিলেন") সেটি সংক্ষেপে এই : হিটলার আজীবন ব্রহ্মচারী, তাঁর ধ্যানধারণাসাধনা সর্বশক্তি তিনি নিয়োগ করেন একমাত্র জর্মনির মঙ্গলসাধনে। হিটলার স্বয়ং অন্তরঙ্গ জনকে একাধিকবার বলেছেন, "জর্মনিই আমার বঁধু (বাগদত্তা দয়িতা)।" এমন কি তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরও তত্ত্বতাবাশ করেন না। এটা সত্য, এ নিয়ে কোন ঢাক ঢাক গুড় গুড় ছিল না। গোড়ার দিকে তিনি তাঁর বিধবা একমাত্র সৎদিদিকে মিউনিকের নিকটবর্তী তাঁর বের্ষটেশগার্ডেনের বাড়ি বের্গহফে গৃহকর্ত্রী রূপে রাখেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে সে বাড়িতে এসে পৌঁছলেন এফা ব্রাউন। যা আকছারই হয়—ননদিনী ঠাকুরঝির সঙ্গে লাগল কোঁদল। হিটলারের অন্যতম বন্ধু বলেন, এস্থলে আরও আকছারই যা হয় তাই হল। পুরুষমানুষ, তায় হিটলারের মতো কর্মব্যস্ত পুরুষ, এ-সব মেয়েলী কোঁদলে কিছুতেই প্রবেশ করে একটা ফৈসালা করে দিতে সম্পূর্ণ নারাজ। তিনি চুপ করে বসে "যাত্রাগান দেখলেন"—অবশ্য অতিশয় বিরক্তিভরে। শেষটায় দিদিই হার মানলেন। হিটলার-ভবন ত্যাগ করে মিউনিকে আপন একটি ছোট্ট বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। হিটলার এরপর তাঁকে আর কখনো তাঁর নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেননি। তার

কিছুদিন পর সৎদিদি দ্বিতীয় বিবাহ করেন। হিটলার এটাতে ভয়ঙ্কর চটে যান। কেন, তা জানা যায়নি। বিবাহ-উৎসবে উপস্থিত তো হলেনই না, সামান্য একটি প্রেজেন্টও পাঠালেন না। উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র চিরতরে সম্পূর্ণ ছিন্ন হল।

হিটলারের আপন মায়ের পেটের একটি সুন্দরী বোনও ছিল। তাঁকেও তিনি একবার তাঁর বাড়ি বের্গহফে নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু তিনি ঐ বাড়ির আরাম আয়েসে এতই সুখ পেলেন যে, কাটালেন মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘকাল। হিটলার বিরক্ত হলেন এবং শেষ পর্যন্ত বোনের বিদায় নেওয়ার পর তাঁকে আর কখনো নিমন্ত্রণ জানাননি। এ ননদীর সঙ্গে এফা ব্রাউনের কলহ হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে ঐতিহাসিকরা নীরব। ভাইবোন বলতে ইনিই হিটলারের একমাত্র মায়ের পেটের বোন। তাঁর বিখ্যাত ভ্রাতা আডল্‌ফ হিটলারের মৃত্যুর পরও অবহেলিত এই বোন কয়েক বৎসর বেঁচে ছিলেন।

এই আপন বোন ও পূর্বে বর্ণিত সেই সৎদিদি ছাড়া হিটলারের ছিলেন একটি বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ঐ সৎদিদির বড় ভাই। নানা দেশে বহু কর্মকীর্তি করার পর ইনি এলেন বার্লিনে—তাঁর সৎভাই জর্মনির কর্ণধার হয়েছেন খবর শুনে। নাৎসি পার্টির দু-একজনকে চিনতেন বলে তাঁদের কৃপায় পারমিট যোগাড় করে খুললেন বার্লিনের উপকণ্ঠে একটা মদের দোকান—বার। পার্টি-মেম্বাররা সেখানে যেতেন তো বটেই, তদুপরি বিশেষ করে সেখানে হুল্লোড় লাগাতেন দুনিয়ার যত খবরের কাগজের রিপোর্টার। ওনাদের মতলব, হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে তস্য অগ্রজ ভ্রাতার কাছ থেকে গোপন তথ্য, রসালো চুট্‌কিলা সংগ্রহ করে আপন আপন কাগজে টকঝাল পরিবেশন করা।

কিন্তু ব্রাদার আলওয়া হিটলার ছিলেন ঝাণ্ডু শুঁড়ি। পাছে তাঁর কোনো বেফাঁস কথা কনিষ্ঠ ফ্যুরার আডলফের কানে পৌঁছে যায় এবং তিনি চটেমটে তাঁর মদের দোকানের পারমিটটি নাকচ করে দেন সেই ভয়ে তিনি ফ্যুরার সম্বন্ধে একটি মাত্র কথা বলতে রাজি হতেন না। অনুজ যে কারণে-অকারণে ফায়ার হয়ে যান সেটা বড় বেরাদার বিলক্ষণ জানতেন।...হিটলারও তাঁর সম্বন্ধে কখনো কোনো কৌতূহল দেখাননি।

পূর্বেই বলেছি, হিটলার দাদা দিদি বোনের সঙ্গে তাঁর যে কোনো প্রকারের সম্পর্ক ছিল না, সেটা দিদি বোনের পাড়াপ্রতিবেশী সখাসখী সবাই জানতেন। তাঁরাও সেটা আর পাঁচজনকে বলতেন। "আহা! ফ্যুরার জর্মনির ভবিষ্যৎ নিয়ে এমনই আকণ্ঠ নিমগ্ন যে তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন সম্বন্ধেও অচেতন।" ক্রমে ক্রমে, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে "মৈত্র মহাশয় যাবে সাগর-সঙ্গমে", এ-স্থলে জর্মনিরও নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে সংবাদটি রটে গেল, আবাল্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয় প্রভু হিটলার তাঁর সব আত্মজনকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র জর্মনির জন্য আত্ম-বিসর্জন দিচ্ছেন।

প্রপাগান্ডা মন্ত্রী গ্যোবেল্‌স্ ঠিক এইটেই চাইছিলেন। তিনি সেই গুজবের দাবাগ্নিতে দিলেন ঘন ঘন কুলোর বাতাস। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এ 'সত্য তত্ত্ব'। বিশ্বজন আগের থেকেই জানতো, হিটলারের জীবনধারণ পদ্ধতি ছিল চার্চিল এবং স্তালিন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চার্চিলের মুখে জাগ্রতাবস্থায় সর্বক্ষণ অ্যাম্মোটা সিগার এবং বেলা-অবেলায় এক পেট খাঁটি স্কচ হুইস্কি। স্তালিনের ঠোঁটেও তদ্বৎ—তবে সিগারের বদলে খাঁটি রাশান পাপিরসি (সিগারেট) এবং স্কচের বদলে তিনি অষ্টপ্রহর পান করতেন, হুইস্কির চেয়েও কড়া মাল ভোদকা শরাব। দুজনাই সর্ববিধ গোস্ত গব গব করে গিলতেন। পক্ষান্তরে হিটলার ধূম্র এবং মদ্যপান করতেন না এবং তিনি ছিলেন ভেজিটারিয়ান। কাজেই তাঁকে জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীরূপে বিশ্বজনের সম্মুখে তুলে ধরতে ডঃ গ্যোবেল্‌সের কল্পনার আশ্রয় অত্যধিক নিতে হয়নি।

হিটলারের মৃত্যুসংবাদ জর্মন জনগণকে যে শক্ দিয়েছিল, তারপর তারা যে মোক্ষমতর শক পেল তার সঙ্গে এটার কোনো তুলনাই হয় না।

যুদ্ধ-শেষে কয়েক দিন পর (মে ১৯৪৫) যে রুশ সেনাপতি জুকফ্ বার্লিন অধিকার করেন তিনি প্রচার করলেন, আত্মহত্যা করবার পূর্বে হিটলার তাঁর এ রক্ষিতাকে বিয়ে করেন।

সর্বনাশ! বলে কি! সেই জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী যিনি

"দারাপুত্র পরিবার
কে তোমার তুমি কার?"

কিংবা "কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ" ধ্যানমন্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে সুদীর্ঘ পঞ্চবিংশ বৎসর জর্মনির জন্য বিনিদ্র ত্রিযামা যামিনী যাপন করলেন তিনি কিনা শেষ মুহূর্তে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্যবশত "ধর্মচ্যুত" হয়ে বিবাহ করলেন একটা "রক্ষিতাকে"! এ যে মস্তকে সর্পদংশন।

আজ যদি শুনতে পাই (এবং এটা অসম্ভব তথা আমি মাপ চেয়ে নিয়ে বলছি) যে-ডিউক অব উইনজার তাঁর দয়িতার সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনার্থে অবহেলে ইংলন্ডের সিংহাসন ত্যাগ করেন, তিনি তাঁর সেই বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করে প্যারিসের কোনো গণিকালয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তবে কি সেটা পয়লা ধাক্কাতেই বিশ্বাস করবো?

জর্মনির জনসাধারণ প্রথমটায় এ সংবাদ বিশ্বাস করতে চায়নি।

কিন্তু ব্যাপারটা তখন দাঁড়িয়েছে এই : যতক্ষণ ম্যাজিশিয়ান তার ভানুমতী খেল দেখায় ততক্ষণ দর্শক বেবাক নির্বাক হয়ে তাই দেখে, কিন্তু যে-মুহূর্তে বাজিকর "গুড নাইট" বলে অন্তর্ধান করে তন্মুহূর্তেই আরম্ভ হয় বিপুল কলরব। কী করে এটা সম্ভব হল, কী করে ওটা সম্ভব হল?—তাই নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডা! এবং দু'একটি লোক যারা ম্যাজিকের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচিত তারা অল্পবিস্তর পাকা সমাধানও তখন দেয়।

এস্থলেও তাই হল। হিটলার ম্যাজিশিয়ান যখন তাঁর শেষ খেলা দেখিয়ে ইহলোক থেকে অন্তর্ধান করলেন তখন আরম্ভ হল তুমুলতর অট্টরোল। এবং এস্থলেও যাঁরা হিটলারের অন্তরঙ্গজন—হিটলারী ম্যাজিকের অর্থাৎ এফা ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানতেন—তাঁরা এ-বাবদে ঈষৎ ছিটেফোঁটা ছাড়তে আরম্ভ করলেন। এঁদের কাহিনী অবিশ্বাস করার উপায় ছিল না।

ইতিমধ্যে হিটলারের খাস চিকিৎসক ডাক্তার মরেল ধরা পড়েছেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি যা বলেন সেটা আমাদের ভাষায় বলতে গেলে, "হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এফা ব্রাউন আর হিটলার একসঙ্গে বাস করতেন বই কি—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—এবং কিছু-একটা হত হয়তো—হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ।"

এ সময় হিটলারের উইল দলিলটি আবিষ্কৃত হয়। এটি তিনি তাঁর বিবাহের পরমুহূর্তেই ডিকটেট করে টাইপ করান এবং আপন স্বাক্ষর দেন। তাতে অন্যান্য বক্তব্যের ভিতর আছে :

"যদ্যপি আমার সংগ্রামের সময় বিবাহ এবং তজ্জনিত দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো আস্থা আমার ছিল না, তথাপি এখন, আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি মনস্থির করে একটি রমণীকে বিবাহ করছি। আমাদের ভিতর ছিল বহু বৎসরের বন্ধুত্ব (ফ্রেন্ডশিপ—জর্মনে ফ্রয়েন্টশফট) এবং বার্লিন যখন চতুর্দিক থেকে শত্রুসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত তখন তিনি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার অদৃষ্টের অংশীদার হবার জন্য এখানে এসেছেন। তিনি সম্পূর্ণ

স্বেচ্ছায় আমার স্ত্রীরূপে আমার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করবেন। আমি জনসেবায় নিয়োজিত ছিলুম বলে যে ক্ষতি হয়েছিল (অর্থাৎ একে অন্যের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলুম—অনুবাদক) তার ক্ষতিপূরণ এর দ্বারা হবে।"[১]

এই এফা ব্রাউন রমণীটি কে?

আমি ইতিপূর্বে 'হিটলারের শেষ দশ দিবস' তথা হিটলারের প্রেম সম্বন্ধে নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখার সময় উল্লেখ করি যে আমার জানামতে হিটলার তাঁর জীবনে সবসুদ্ধ ১/২+১+১/২= দুইবার ভালোবেসেছিলেন। প্রথম হাফ প্রেমকে ইংরাজিতে 'কাফ লভ্' বলে। বাছুরের মতো ড্যাবডেবে চোখে দয়িতার দিকে তাকানো আর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র মতো গোপনে দীর্ঘশ্বাস ফেলা—বাঙাল দেশে যাকে বলে ঝুরে মরা। কারণ হিটলার তাঁর হৃদয়েশ্বরীর সঙ্গে কখনো সাহসভরে আলাপচারী তো করেনইনি, এমন কি চিঠিপত্রও লেখেননি। হিটলার তখন ইংরিজিতে যাকে বলে 'টীন এজার'। এ-প্রেমটাকে সত্যকার রোমান্টিক প্লাতনিক প্রেম বলা যেতে পারে।

এর প্রায় বাইশ বৎসর পরে, যৌবনে, হিটলার পুরো-পাক্কা ভালোবেসেছিলেন গেলী রাউবাল নামক এক কিশোরীকে। এটিকে আমি পুরো এক নম্বর দিয়ে পূর্বোল্লিখিত "হিটলারের প্রেম" প্রবন্ধ রচনা করি। এটি স্থান পেয়েছে মল্লিখিত 'রাজা উজির' পুস্তকে। এ-অধম পারতপক্ষে কাউকে কখনো আমার নিজের লেখা পড়ার সলা-উপদেশ দেয় না, তবে যাঁরা রগরগে রোমান্টিক প্রেমের গল্প ছাড়া অন্য রচনা পড়তে পারেন না, তাঁরা এটি পড়ে দেখতে পারেন।

এই কিশোরী আত্মহত্যা করেন। হিটলারও হয়তো সেই শোকে আত্মহত্যা করতেন যদি না তাঁর কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধু—তাঁর ফোটোগ্রাফার বন্ধু, হফ্‌মান প্রধানত—যদি তাঁকে শব্দার্থে তিন দিন তিন রাত্রি চোখে চোখে রাখতেন।

এই দুটি—১/২+১ প্রেম হয়ে যাওয়ার পর হিটলার আরেক ১/২ প্রেমে পড়েন—জীবনে শেষবারের মতো। এফা ব্রাউনের সঙ্গে। এটাকে আমি হাফ প্রেম বলছি এই কারণে যে, আজ পর্যন্ত উভয়ের কোনো অন্তরঙ্গজনই এঁদের ভিতর সঠিক কি সম্পর্ক ছিল সেটা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলতে পারেননি। এফা ছিলেন অতিশয় নীতিনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত ভদ্রঘরের কুমারী। হিটলার ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রতি তিনি কদাচ আকৃষ্ট হননি। যে-রমণী তার দয়িতের সঙ্গে সহমরণ বরণ করার জন্য স্বেচ্ছায় শত্রুবেষ্টিত পুরীতে প্রবেশ করে তাকে "রক্ষিতা" আখ্যা দিলে নিশ্চয়ই তার প্রতি অবিচার করা হয়।

পক্ষান্তরে এ-তত্ত্বটিও নিষ্ঠুর সত্য যে হিটলার সুদীর্ঘ বারো বৎসর ধরে এফাকে বিয়ে করতে রাজি হননি। তিনি অবশ্য তার জন্য একাধিক যুক্তি দেখিয়েছেন। সেগুলো বিশ্বাস করা-না-করা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও রুচির উপর নির্ভর করে। আমার মনে হয় তার সব কটা ভুয়ো নয়। এবং হিটলার সর্বদাই এ-জাতীয় আলোচনার সর্বশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ করে বলতেন, "জর্মনি ইজ মাই ব্রাইড" = জর্মনি আমার (জীবনমরণের) বধূ। এরই ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তাঁর শেষ উইল-এ।

১ বৈদিক যুগে আমাদের ভিতর সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তার সমাধান এখনো হয়নি। এস্থলে লক্ষণীয় হিটলার নিজেকে আর্য বলে শ্লাঘা অনুভব করতেন। তাই হয়তো প্রথমে কিছুটা আপত্তি জানানোর পর এই সতীদাহে সম্মত হন। পাঠক এ-নিয়ে চিন্তা করতে পারেন।

অতএব এফা না ছিলেন হিটলারের রক্ষিতা, না ছিলেন তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী। সর্ব ঐতিহাসিক তাই বলেছেন, 'এ মোস্ট আনডিফাইন্ড স্টেট'—অর্থাৎ এঁদের ভিতর ছিল এমন এক সম্বন্ধ যেটা কোনো সংজ্ঞার চৌহদ্দিতে পড়ে না।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে। বাঘা ঐতিহাসিক (যদ্যপি আমার বিচারে তিনি ট্রেভার রোপার, বুলক, নামিরের ইত্যাদির কাছেই আসতে পারেন না) শয়রার—যাঁর নাৎসিদের সম্বন্ধে বিরাট ইতিহাসের উপর নির্ভর করে নির্মিত একটা অতিশয় রসকষহীন ফিল্ম ১৯৬৯-এর গোড়ার দিকে কলকাতা তক পৌঁছেছিল—ইনি বলছেন, যে গেলী রাউবালের সঙ্গে হিটলারের প্রণয় হয় তাঁর আত্মহত্যার এক বা দুই বৎসর পর হিটলারের সঙ্গে এফা ব্রাউনের পরিচয় হয়। এ তথ্যটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য নয়। কারণ একাধিক ঐতিহাসিক বলেন আত্মহত্যা করার কয়েক দিন পূর্বে গেলী তার মামা (সম্পর্কে) হিটলারের স্যুট সাফসুতরো করার সময় পকেটে হিটলারকে লিখিত এফা ব্রাউনের একখানা 'প্রেমপত্র' পেয়ে যায়। গেলী আত্মহত্যা করার পর তার মা বলেন, এই চিঠিই গেলীকে আত্মহত্যার দিকে শেষ ঠেলা দেয়,—অবশ্য এ-কথা কারুর কাছেই অবিদিত ছিল না গেলীর মা এফাকে এমনই উৎকট ঘৃণা করতেন যে পারলে তার চোখ দুটো ছোবল মেরে তুলে নিয়ে, রোস্ট করে তাঁর প্যারা কুকুরকে খেতে দিতেন।

গেলী হয়তো চিঠিখানা পেয়েছিল কিন্তু সে-চিঠি যে তার হৃদয়ে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সে বিশ্বাস আমার হয় না। কারণ গেলীকে যিনি সবচেয়ে বেশি চিনতেন সেই হফ্‌মান বলেছেন, গেলী ভালোবাসত ভিয়েনাবাসী এক কলেজের ছোকরাকে, সে প্রকৃতপক্ষে কখনো তার মামার প্রেম নিবেদনের প্রতিদান দেয়নি। তদুপরি আরেকটি কথা আছে, হিটলার তখন গেলীর প্রেমে অর্ধোন্মাদ। এফার সঙ্গে এমনি গতানুগতিক আলাপ হয়েছে। সে মজে গিয়ে হিটলারকে প্রেমপত্র লিখেছে—তরুণীরা আকছারই এ-রকম করে থাকে—এবং হিটলার এ-ধরনের চিঠি পেতেন গণ্ডায় গণ্ডায় এবং নিশ্চয়ই এফার এ চিঠি সিরিয়াসলি নেননি।

হিটলারের সঙ্গে এফার প্রথম পরিচয় হল হিটলার-সখা ফোটোগ্রাফার হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে। মধ্যবিত্ত সমাজের কুমারী কন্যা যতখানি লেখাপড়া করে সেইটে সেরে তিনি হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে অ্যাসিসটেন্টের কর্ম নেন। তাঁর কাজ ছিল, খদ্দেরদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা এবং ডার্করুমে কিছুটা সাহায্য করা। সেই সূত্রে হফ্‌মান নিতান্ত প্রফেশনালি হিটলারের সঙ্গে এফার আলাপ করিয়ে দেন।

হিটলারের কৈশোর ও প্রথম যৌবন কাটে ভিয়েনা নগরে। সে নগরের নাগরিকরা ডানসিং, ফ্লার্টিং, প্রণয়-মিলন, পরকীয়া শিভালরিতে অনায়াসে প্যারিসের সঙ্গে পাল্লা দেয়। হিটলারও রমণীসঙ্গ খুবই পছন্দ করতেন। জর্মনির সর্বময় কর্তা হওয়ার পর তিনি তাঁর অন্তরঙ্গজনকে একাধিকবার গল্পচ্ছলে বলেছেন, "এসব বড় বড় হোটেলের গাড়োয়ালরা যে পুরুষ ওয়েটার রাখে তার মত ইডিয়টিক আর কী হতে পারে! এটা তো জলের মতো স্বচ্ছ যে সুন্দরী যুবতী ওয়েট্রেস রাখলে ঢের ঢের বেশি খদ্দের জুটবে। আমার জীবনে ট্র্যাজেডি যে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে যখন আমি কোন স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েটে বসি, আমাকে বাধ্য হয়ে ডাইনে এবং বাঁয়ে বসাতে হয় এই বুড়ি-হাবড়িকে। কারণ তাঁদের স্বামীরা দুই বুড়ো-হাবড়া রাষ্ট্রমন্ত্রী বা ভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।...ওঃ, সে কি গব্বযন্ত্রণা! খুশ এখতেয়ার থাকলে তার বদলে আমি যে-কোনো অবস্থায় ছোট্ট একটি নাম-না-জানা ওয়েট্রেসের সঙ্গে (মেয়েদের বেতন কম বলে কন্টিনেন্টে ছোট রেস্তোরাঁই ওয়েট্রেস

রাখে) দু'দণ্ড রসালাপ করতে করতে না হয় সামান্য ডাল-ভাতই (ওদেশের ভাষায় দুই পদী খানা) খাবো—জাহান্নামে যাক স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েটের বাহান্ন-পদী কোর্মা-কালিয়া বিরয়ানি-তন্দুরী (ওদের ভাষায় শ্যাম্পেন কাভিয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি)।"

তাই হিটলারের অ্যারোপ্লেনে রাখা হত খাবসুরৎ হুরী, স্টুয়ার্ডেস। কিন্তু এ-কথা সবাই বলেছেন, হিটলার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোক ছিলেন না।

এস্থলে নাগর পাঠককে সবিনয় নিবেদন করি, এফা ব্রাউন ছিলেন সত্যসত্যই চিত্তহারিণী অসাধারণ সুন্দরী। কিশোরী-যুবতীর সেই মধুর সঙ্গমস্থলে। কিন্তু এ-বেরসিক লেখক নারী-সৌন্দর্য বর্ণনে এযাবৎ বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি বলে নাগর রসিক পাঠককে এস্থলে সে-রস থেকে সে বঞ্চিত করতে বাধ্য হল।

এফা সুন্দরী তো ছিলেনই তদুপরি স্টুডিয়োতে যে-সব খানদানী বিত্তশালিনী তরুণী যুবতী ছবি তোলাতে আসতেন, এফা তাঁদের আচার-আচরণ থেকে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাদের বেশভূষা এবং অলঙ্কারাদি।...পরবর্তীকালে যখন তাঁর অর্থের কোনই অভাব ছিল না তখনো তাঁর বেশভূষাতে রুচিহীন আড়ম্বরাতিশয্য প্রকাশ পায়নি। তাঁর অর্থবৈভব শুধু একটি অলঙ্কারে প্রকাশ পেত। তাঁর বাঁ হাতে বাঁধা থাকত মহার্ঘ্য বিরল হীরেতে বসানো একটি ছোট্ট রিস্টওয়াচ। জর্মনির মত দেশের ফ্যুরার যদি প্রিয়াকে তাঁর জন্মদিনে একটি হাতঘড়ি উপহার দেন, তবে সেটি কি প্রকারের হবে, সেটা কল্পনা করার ভার আমি বিত্তশালী পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি।

গোড়ার দিকে হিটলার এফাকে খুব বেশি একটা লক্ষ্য করেননি।

এদিকে গেলীর মৃত্যুর পর হিটলারের জীবন বড়ই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল।

সখা হফ্‌মান তখন তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য সুযোগ পেলে হিটলারের প্রিয় অবসর যাপন পদ্ধতি অবলম্বন করতেন। হিটলারকে নিয়ে যেতেন মিউনিকের আশপাশের হ্রদবনানীতে পিকনিকে। সঙ্গে থাকতেন হফ্‌ম্যানের স্ত্রী, ফোটো স্টুডিয়োর দু-একজন কর্মচারী এবং এফা ব্রাউন।

ক্রমে ক্রমে হিটলার শ্রীমতী এফা ব্রাউনের প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলেন।

এর পর দেখা গেল, হফ্‌ম্যান যদি পক্ষাধিককাল কোন পিকনিকের ব্যবস্থা না করতেন তবে স্বয়ং হিটলার তাঁর ফ্ল্যাটে উপস্থিত হয়ে বলতেন, "হেঁ হেঁ এদিক দিয়ে যাচ্ছিলুম, তাই আপনার এখানে ঢুঁ মারলুম।" তারপর কিঞ্চিৎ ইতিউতি করে বলতেন, "যা ভাবছিলুম...একটা পিকনিকের ব্যবস্থা করলে হয়, আপনারা তো আছেনই, আর হেঁ হেঁ ঐ ফ্রলাইন ব্রাউনকে সঙ্গে নিয়ে এলেও মন্দ হয় না,—কি বলেন?"

তখনো হিটলার এফার প্রেমে নিমজ্জিত হননি—এবং কখনও হয়েছিলেন কি না, সে-বাবদে আমার মনে গভীর সন্দেহ আছে। পরবর্তী কাহিনী পড়ে সুচতুর—অন্তত আমার চেয়ে চতুর—পাঠক-পাঠিকা প্রেম বাবদে আপন আপন অভিজ্ঞতা-প্রসূত কূটবুদ্ধি দ্বারা আপন আপন সুচিন্তিত এবং/কিংবা সহৃদয় অভিমত নির্মাণ করে নিতে পারবেন।

ইতিমধ্যে কিন্তু শ্রীমতী এফা হিটলার প্রেমের অতলান্ত সমুদ্রের গভীর থেকে গভীরতরে বিলীন হচ্ছেন। আর হবেনই না কেন? যদ্যপি হিটলার তখনো রাষ্ট্রনেতা হননি, তথাপি তাবৎ জর্মনির সবাই তখন জানত, রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিন্ডেনবুর্গ যে কোনো দিন তাঁকে ডেকে বলবেন প্রধানমন্ত্রীরূপে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে। এবং তদুপরি, পূর্বেই বলেছি, হিটলার ছিলেন রমণীচিত্তহরণের যাবতীয় কলাকৌশলে রপ্ত। এবং সর্বোপরি তিনি প্রায়ই অবরেসবরে এফাকে দিতেন ছোটখাটো প্রেজেন্ট।

বিত্তশালীজন তার দয়িতাকে যে-রকম দামী দামী ফার কোট, মোটরগাড়ি দেয়, সে রকম আদৌ ছিল না—তিনি দিতেন চকলেট, ফুল বা ভ্যানিটি কেস (আমাগো রাষ্ট্রভাষায় যারে কয়, "ফুটানি কী ডিবিয়া")।

সব ঐতিহাসিক বলেছেন, এফা ছিলেন "রাদার এম্‌টি-হেডেড" অর্থাৎ সরলা বুদ্ধিহীনা। কিন্তু তাতে কি এসে যায়? অস্মদ্দেশীয় এক বৃদ্ধ চাটুয্যে "মহারাজ"কে জনৈক অর্বাচীন শুধিয়েছিল প্রেমের খবর তিনি রাখেন কি, তিনি বৃদ্ধ, তাঁর ক'টা দাঁত এখনো বাকি আছে? গোস্‌সাভরে তিনি যা বলেন তার মোদ্দা—"ওরে মূর্খ, প্রেম কি চিবিয়ে খাবার জিনিস যে দাঁতের খবর নিচ্ছিস? প্রেম হয় হৃদয়ে।" বিলকুল হক কথা। এবং সঙ্গে সঙ্গে এটাও বলতে পারতেন, প্রেম নামক আদিরসটি মস্তিষ্ক থেকে সঞ্চারিত হয় না।

তাই এফা ঐ সব চকলেটাদি সওগাত বান্ধবী, সহকর্মীদের ফলাও করে দেখাত, পিকনিকের বর্ণনা ফলাওতর করে সবিস্তর বাখানিত এবং ভাবখানা এমন করত যে, হিটলার তার প্রেম রীতিমত ডগোমগো-জরোজরো-মরোমরো।

এস্থলে ইয়োরোপীয় সরলা কুমারীরা যা সর্বত্রই করে থাকে (এবং অধুনা কলকাতা-ঢাকাতে তাই হচ্ছে) এফা তাই করলেন। নির্জনে একে অন্যে যখন দুঁহুঁ দুঁহুঁ, কুঁহুঁ কুঁহুঁ তখন আশ-কথা পাশ-কথার মাঝখান দিয়ে—যেন টেবিলের ফুলদানির দেখা-না-দেখার ফুলের মাঝখান দিয়ে, জর্মনে একে বলে 'থ্রু দ্য ফ্লাওয়ারস'—বিবাহ নামক সেই প্রাচীন সনাতন প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা দিলেন। নিশ্চয়ই একাধিকবার।

পূর্বেই বলেছি, হিটলার কিন্তু পৈতে ছুঁয়ে কসম খেয়ে বসে আছেন, বিবাহ-বন্ধন নামক উদ্বন্ধনে তিনি—কাট্যা ফালাইলেও—দোদুল্যমান হতে নিতান্তই অনিচ্ছুক। এবং ঝাণ্ডু ডিপ্লোমেট এই অস্বস্তিকর বাক্যালাপ কি করে এড়াতে হয়, সেটা খুব ভালো করেই জানতেন।

এটা বুঝতে সরলা, নীতিশীল পরিবারে পালিতা এফার একটু সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে তাঁর রক্ষণশীল পিতামাতা এফার সঙ্গে হিটলারের 'ঢলাঢলি'র খবর পেয়ে গিয়েছেন। তাঁরা মেয়েকে বুঝিয়ে দিলেন হয় হিটলার তোমাকে বিয়ে করুক, নয় তুমি তার সঙ্গ ত্যাগ কর।

পিতামাতার প্রতি বিনম্রা এই কুমারী তখন কি করে?

হঠাৎ ঐ সময়ে একদিন হফ্‌মান সখা হিটলারকে টেলিফোন করলেন, "যদ্দূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আমার বাড়ি চলে আসুন।"

হিটলার : "কেন, কি হয়েছে?"

হফ্‌মান : "আসুন না; সব কথা এখানে হবে।" হফ্‌মান এবং হিটলার দুজনেই জানতেন তাঁদের টেলিফোনের কথাবার্তা পুলিশ ট্যাপ্ করে।

হিটলার কয়েক মিনিটের মধ্যেই হফ্‌মানের ফ্ল্যাটে পৌঁছলেন। শুধোলেন, "কি হয়েছে? ব্যাপার কি?"

হফ্‌ম্যান : "বড় সিরিয়াস। এফা পিস্তল দিয়ে বুকে গুলি মেরে আত্মহত্যা করার চেষ্টা নেয়। তাকে অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়—"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় হিটলার বাধা দিয়ে বললেন, "কিন্তু জানাজানি হয়নি তো—তাহলেই তো সর্বনাশ!"

এস্থলে লক্ষণীয় যে হিটলার দুঃসংবাদ পাওয়া মাত্রই সর্বপ্রথম নিজের স্বার্থের কথাই ভেবেছেন। তাঁর পার্টি এবং বিশেষ করে গ্যোবেল্‌স্ সাধারণ্যে তাঁর যে "ইমেজ" গড়ে

তুলছিলেন, সেটা জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারীর। এখন যদি তাঁর দুশমন কম্যুনিস্টরা জেনে যায় যে, তিনি গোপনে একটা মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করতেন এবং সেই সরলা কুমারী যখন যুক্তিসঙ্গত নীতিসম্মত পদ্ধতিতে হিটলারকে সেই ভাব-ভালোবাসার অন্তে যে প্রতিষ্ঠান থাকে, অর্থাৎ বিবাহ, সেটা প্রস্তাব করে তখন তিনি ধড়িবাজ, কাপুরুষ, বেইমানের মতো মেয়েটাকে ধাপ্পা মারেন, এবং ফলে ভগ্নহৃদয়া কুমারী আত্মহত্যার চেষ্টা করে, তবেই তো চিত্তির! যে নাৎসি পার্টির নেতা এ-রকম একটা পিশেচ সে পার্টির কী মূল্য? এই বেইমান পার্টিতে আস্থা রাখবে কোন্ ভদ্র ইমানদার জর্মন? এবং ভুললে চলবে না, মাত্র বছর দুই পূর্বে গেলী রাউবালও আত্মহত্যা করে—যদিও সে সময় কম্যুনিস্টরা সেই সুবর্ণ-সুযোগের সিকি পরিমাণ ফায়দাও ওঠাতে পারেনি, অর্থাৎ একসপ্লয়েট করতে পারেনি।

কিন্তু মাভৈঃ। কন্দর্প-নির্মিত এ-সব সংকটে প্রায়শ তিনি বিধাতার ন্যায়-নীতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে প্রেমিক-প্রেমিকার তাবৎ মুশকিল আসান করে দেন।

হফ্‌মান সঙ্গে সঙ্গে হিটলার তথা নাৎসি পার্টির জীবনমরণ সমস্যা সমাধান করে বললেন, "নিশ্চিন্ত থাকুন। জানাজানি হয়নি। কারণ এফাকে অচৈতন্য অবস্থায় যে সার্জনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তিনি আমার নিকট-আত্মীয়। তাকে এমনভাবে কড়া পাহারায় রেখেছেন যে, পুলিশ পর্যন্ত সেখানে পৌঁছতে পারেনি। তিনি স্বয়ং আমাকে খবরটা জানিয়েছেন।"

তখন, এই প্রথম হিটলার প্রেয়সীর অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। না—ফাঁড়া কেটে গিয়েছে, তবে এফা রক্তক্ষরণহেতু বড্ডই দুর্বল।

শুধু এফার ফাঁড়া কেটে গেল তাই নয়, স্বয়ং হিটলার এবং নাৎসি পার্টিরও ফাঁড়া কেটে গেল। অবশ্য কিছুটা কানাঘুষো হয়েছিল, কিন্তু জানাজানি হয়নি।

ব্যক্তিগত সম্পর্কে হিটলার যে খুব একটা নেমকহারাম ছিলেন তা নয়। এই আত্মহত্যার প্রচেষ্টা থেকে হিটলার বুঝে গেলেন এফার প্রেম কতখানি গভীর—বল্লভার ব্রেন-বাক্সে কিছু থাক আর নাই থাক, তার গলা থেকে নাভি কুণ্ডলী অবধি জুড়ে বসে আছে একটা বিরাট হৃদয়—সেখানে না আছে ফুসফুস না আছে লিভার স্প্লীন কিডনি না আছে অন্য কোনো যন্ত্রপাতি।

এ-হেন হৃদয়কে তো অবহেলা করা যায় না।

এতদিন হিটলার যে-প্রেম করতেন এফার সঙ্গে সেটার পদ্ধতি ছিল মোটামুটি জর্মন কলেজ-স্টুডেন্টরা তাদের বান্ধবীর (ফ্রয়েন্ডিন—গার্ল ফ্রেন্ডের) সঙ্গে যে ভাবে করে থাকে। অর্থাৎ সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর এফা তাঁর নাইটগাউন ইত্যাদি রাত্রের পোশাক একটি অতি ছোট্ট স্যুটকেসে পুরে চুপিসাড়ে ঢুকতেন হিটলারের ফ্ল্যাট বাড়িতে। বাড়ির পাঁচজন জেগে ওঠার পূর্বেই, ভোরবেলা, ফের চুপিসাড়ে চলে যেতেন আপন ফ্ল্যাটে।

এবারে হিটলার করলেন ভিন্ন ব্যবস্থা। ততদিনে তিনি রীতিমত বিত্তশালী হয়ে গিয়েছেন। হিটলারের আপন কর্মস্থল ম্যুনিক শহরে তিনি এফার জন্য ছোট্ট একটি ভিলা, মোটর কিনে দিলেন এবং মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অর্থাৎ তিনি হিটলারের একমাত্র রক্ষিতা হিসাবে হিটলারমণ্ডলীতে আসন পেলেন। এস্থলে "রক্ষিতা" বলাটা হয়তো ঠিক হল না। কারণ ইয়োরোপের প্রায়ই অনেকে কয়েক বৎসর পরে এই রক্ষিতাকে বিয়ে করে তাকে সমাজে তুলে নেন। সমাজপতিরাও বধূর অতীত সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তোলেন না। আরেকটি দৃষ্টান্ত দিই : এদেশে যদি বিয়ের তিন চার মাস পর কোনো রমণী বাচ্চা প্রসব করে, তবে হইচই পড়ে যায়। ইয়োরোপে আদৌ

না। আমার যতদূর জানা গির্জা পর্যন্ত কোনো প্রশ্ন না তুলে বাচ্চাটাকে ব্যাপ্টিস্ট করে তাকে ধর্মত সমাজে তুলে নেয়।

অবশ্য হিটলার সমস্ত ব্যবস্থাটা করলেন অতিশয় গোপনে। পূর্বেই বলেছি, তাঁর এবং এফার চাকর মেড্ তথা অতিশয় অন্তরঙ্গজন হাড়ে মাসে জানতেন যে তাঁরা যদি এই প্রণয়লীলা নিয়ে সামান্যতম আলোচনা করেন—বাইরের লোককে খবরটা জানাবার তো কথাই ওঠে না—তাহলে তিনি পার্টির জব্বর পাণ্ডাই হন আর জমাদারনীই হোক, তাঁরা যে তদ্দণ্ডেই পদচ্যুত বহিষ্কৃত হবেন তাই নয়, কপালে গুম-খুনও অনিবার্য। কারণ হিটলার বহু বিষয়ে নির্মম। দেশের কর্ণধার হওয়ার পূর্বে এবং পরেও হিটলার হিমলার বিস্তর গুম-খুন করিয়েছেন।

ওদিকে এফার যে ধার্মিক চরিত্রশীল জনক-জননী হিটলারের সঙ্গে তাঁদের কুমারী কন্যার অন্তরঙ্গতার কঠোর কঠিনতম প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, তাঁরাও এ-ব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে নিলেন। এটাকে প্রতিরোধ করলে একগুঁয়ে মেয়ে যদি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে, এবং যদি সফল হয়ে যায়!

আমার দুঃখ শুদ্ধ-পাঠটি আমার মনে নেই : মোটামুটি যে মেয়ে—

"মরণেরে করিয়াছে জীবনের প্রিয়।
কারো কোনো উপদেশে কান দিবে কি ও?"

এফার নিতান্ত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গজন ছাড়া আর সবাই বিশ্বাস করতো, এফা ফোটোগ্রাফ দোকানে কাজ করেন। তিনি হফ্‌মানের স্টুডিয়োতে প্রতিদিন হাজিরা দিতেন।

এর কিছুদিন পর ১৯৩৩-এর ৩০-এ জানয়ারি হিটলার হয়ে গেলেন জর্মনির কর্ণধার—প্রধানমন্ত্রী চ্যানসেলার। তাঁকে তখন স্থায়ীভাবে বাস করতে হল বার্লিনে—ম্যুনিক পরিত্যাগ করে। এখন তিনি এফাকে নিয়ে পড়লেন বিপদে। এতদিন শুধু কম্যুনিস্টরাই তাদের আধা-পাকা গোয়েন্দাগিরি করেছে হিটলারের। এবার জুটলো তাবৎ মার্কিন খবরের কাগজের দুঁদে দুঁদে রিপোর্টার—পূর্বোক্ত "ঐতিহাসিক" শায়রারও তাদেরই একজন। এদের চোখ দু-নলা বন্দুকের মতো গভীর অন্ধকারেও এক্স-রে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে জানে শিকারের দিকে। এবং কারও যে কোনো ব্যক্তিগত জীবনের প্রাইভেসি থাকতে পারে সেটা তাদের শাস্ত্রে—আদৌ যদি তাদের কোনো শাস্ত্র থাকে—লেখে না। পাঠক শুধু স্মরণে আনুন ইংলন্ডের রাজা যখন মিসেস সিমসনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন তখন সে "কেচ্ছা"কে তারা কী কেলেঙ্কারির রূপ দিয়ে দিনে দিনে রসিয়ে রসিয়ে মার্কিন কাগজে প্রকাশ করেছে! তার তুলনায় হিটলার কোন্ ছার। ব্যাটা আপস্টার্ট যুদ্ধের সময় ছিল নগণ্য করপরেল—তার আবার প্রাইভেট লাইফ। সেটাকেও আবার রেহাই দিতে হবে। ছোঃ!

কাজেই এফাকে বার্লিনে আনা অসম্ভব।

ফলস্বরূপ ১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫-এ হিটলারের আত্মহত্যা করা পর্যন্ত সুদীর্ঘ বারোটি বৎসর—কবির ভাষায় নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর—এফা পেলেন আগের তুলনায় অল্পই, এবং ক্রমশ হ্রাসমান। তাই সহমরণের বহু আগের থেকেই এফা একাধিক বন্ধুবান্ধবীকে বিষণ্ণকণ্ঠে বলেছেন, ১৯৩৩-এর জানুয়ারি (অর্থাৎ হিটলার যেদিন চ্যানসেলর হন) আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা নির্মম দিবস (ট্রাজিক ডে, 'ট্রাগিশা টাখ')।"

যেদিন মিত্রপক্ষ ফ্রান্সে অবতরণ করে কালক্রমে জর্মনি জয় করে সেটাকে বলা

হয় ডী-ডে (D-Day)। সেটা ৬ই জুন ১৯৪৪। ১৯৩৩-এর ৩০ জানুয়ারিতেই কিন্তু আরম্ভ হয় অভাগিনী এফার ডী-ডে। কিন্তু এসব কথা পরে হবে।

বার্লিনে কর্মব্যস্ত হিটলার ম্যুনিকে আসার সুযোগ পেতেন কমই। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যুনিকে ট্রাঙ্ককল করে তাঁর সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আলাপ করে নিতেন। এবং টেলিফোন লাইনটি এমনভাবে নির্মিত ছিল যে, এফা হিটলার কনকশান হয়ে যাওয়া মাত্রই দুই প্রান্তের টেলিফোন অপারেটররা কিছুই শুনতে পেত না।...এবং যে স্থলে ট্রাঙ্ককলের অষ্টপ্রহর ব্যাপী এহেন সুবিধা সেখানে চিঠিচাপাটির বিশেষ প্রশ্ন ওঠে না—ওদিকে আবার চিঠিপত্র লেখার ব্যাপারে হিটলার ছিলেন হাড় আলসে। (জর্মনে "স্টিন্ডফেতের শ্রাইবফাউল" দু = গন্ধময় লেখন-আলসে)। যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন আক্ষরিক অর্থে হিটলারের দম ফেলার ফুরসৎ নেই, ক্রমাগত একটার পর আরেকটা মিলিটারি কনফারেন্স হচ্ছে—তখন তিনি তাঁর অন্তরঙ্গতম ভ্যালে লিঙেকে বলতেন, "হে লিঙে, তুমি ঝপ করে এফাকে দুটি লাইন লিখে দাও না।" তখন প্রায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় হিটলারের কোনো-না-কোনো কর্মচারী প্লেনে করে ম্যুনিক যাচ্ছে। ঘণ্টা তিনেকের ভিতর চিঠি এফার হস্তগত হত।

ভ্যালে বলতে ভৃত্যও বোঝায়। কাজেই পাঠক নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়ে শুধাবেন, "কী! চাকরকে দিয়ে প্রিয়ার উদ্দেশে চিঠি লেখানো! সখ্‌ৎ বেআদবী তো বটেই—তার চেয়ে বটতলার 'সচিত্র প্রেমপত্র' থেকে দু-পাতা কেটে নিয়ে খামে পাঠিয়ে দেওয়া ঢের ঢের বেশি শৃঙ্গাররসসম্মত!" কিন্তু পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিই—হিটলার, এফা ও ভ্যালে লিঙে তিনজনই ছিলেন নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এমন কি লিঙের সামাজিক (রাজনীতির কথা হচ্ছে না) প্রতিষ্ঠা ছিল হিটলারের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের। তদুপরি, হিটলারের হাজার হাজার খাস সেনানীর (এস.এ.) মাঝখান থেকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর লিঙেকে বেছে নেওয়া হয়েছিল এবং সেনাবাহিনীতে তিনি ছিলেন প্রায় কর্নেলের কাছাকাছি। এবং সর্বশেষ বক্তব্য, হিটলার ম্যুনিকে এলেও তাঁর অধিকাংশ সময় কাটতো রাষ্ট্রকার্যে। সে-সময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা এফাতে লিঙেতে সময় কাটাতেন গালগল্প করে। এফা জানতেন, পুরুষদের ভিতর লিঙেই দশ-বারো বছর ধরে হিটলারের সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং হিটলারও তাঁর সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলতেন। এফা মেয়েদের ভিতর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তিনী। অতএব দুজনার ভিতর একটা অন্তরঙ্গতা জমে ওঠা খুবই স্বাভাবিক। আমার মনে হয়, এফা এই লিঙেকে তাঁর হৃদয়বেদনা যতখানি খুলে বলেছেন, অন্য আর কাউকে অতখানি বলেননি।[২]

অন্যত্র সবিস্তর লিখেছি, হিটলারের মৃত্যুর পর লিঙে রুশহস্তে বন্দী হন এবং দীর্ঘ দশ বৎসর রুশ-কারাগারের দুঃসহ ক্লেশ সহ্য করার পর জর্মনিতে ফিরে এসে হিটলার সম্বন্ধে একখানি চটি বই লেখেন। এফা সম্বন্ধে কৌতূহলী পাঠক এই পুস্তিকায়ই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বিশ্বাস্য খবর পাবেন। হিটলার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিবিন্দু থেকে, কিন্তু এফা সম্বন্ধে লিখেছেন বড়ই দরদ-ভরা ভাষায়। তিনি

২ এফার সঙ্গে লিঙের আরেকটা মিল আছে। বার্লিন যখন প্রায় চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত, শেষ পরাজয় সুনিশ্চিত, কিন্তু পালাবার পথ তখনো ছিল, সে-সময় হিটলার লিঙেকে ডেকে বলেন, "তুমি আপন বাড়ি চলে যাও।" লিঙে অসম্মতি জানান এবং সংক্ষেপে যা বলেন তার মোদ্দা : যাঁকে আমি এত বৎসর ধরে সেবা করেছি তাঁকে তাঁর শেষ মুহূর্তে আমি ত্যাগ করতে পারবো না। এবং সবাই জানেন, এফাও হিটলারের কড়া আদেশ সত্ত্বেও তাঁকে ত্যাগ করেননি।

ইচ্ছে করলেই হিটলার-এফার সম্পর্ক সম্বন্ধে রগরগে মার্কিনী ভাষায় "কেলেঙ্কারি কেচ্ছা" লিখতে পারতেন—কোনো সন্দেহ নেই রুশ দেশ থেকে পশ্চিম জর্মনিতে ফেরা মাত্রই মার্কিন রিপোর্টাররা তাঁকে চেপে ধরে, অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে হিটলার এফার নব "বিদ্যাসুন্দরে"র জন্য পাম্প করেছিল কিন্তু সে সময় বিশেষ কিছু তো বলেনই নি, পরেও পুস্তিকা রচনাকালে লিখেছেন যেটুকু নিতান্তই না লিখলে সত্য গোপন করে এফার প্রতি অবিচার করা হয়। এই অন্তর্নিহিত শালীনতাবোধ ছিল বলেই হিটলার ও এফা উভয়েই তাঁকে বন্ধুর চোখে দেখতেন। এটা এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া আজগুবি ব্যাপার নয়। এ দেশের পাঠান দাসবংশের ইতিহাস যাঁরা মন দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই এর সত্যতার নজির সে-ইতিহাসে পাবেন। এবং লিঙে তো কিছু ক্রীতদাস নন!

তাই এফাতে লিঙেতে এমনিতেই চিঠিপত্র চলতো। হিটলার সেটা জানতেন। তাই তিনি যে কাজকর্মে আকণ্ঠ নিমগ্ন, তিনি যে ফোন করার জন্য মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করে পাঁচ মিনিটের তরেও আপন খাস কামরায় যেতে পারছেন না, এটা তাঁর গাফিলতি নয়, বস্তুত তাঁর এই অপারগতা সম্বন্ধে তিনি নিজেকে দোষী মনে করেন—এসব কথা লিঙেকে গুছিয়ে লিখতে বলতেন।

হিটলার যে এফাকে কখনো বার্লিন আসতে দিতেন না তা নয়। অবশ্য অতিশয় কালেকস্মিনে জব্বর পার্টি-পরবের স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েট না থাকলে অন্তরঙ্গজন তথা এফার সঙ্গে তিনি ডিনার-লাঞ্চে বসতেন। এফাকে তাঁর বাঁ-দিকের চেয়ারে বসাতেন। এফা ঠিকমত খাচ্ছেন কিনা, তাঁর পছন্দসই খানা তৈরি হয়েছে কিনা তাই নিয়ে পুতু-পুতু করতেন এবং সবাই বুঝতে পারতো তিনি এফাকে সর্বাপেক্ষা বেশি সম্মান দেখাচ্ছেন। কিন্তু যেদিন স্টেট-ব্যাঙ্কুয়েট বা বাইরের লোক খানা খেতে আসতো, সেদিন এফাকে উপরের তলায় হিটলারের চারজন মহিলা সেক্রেটারি ও তাঁর খাদ্যরন্ধনের অধিকর্ত্রীর[৩] সঙ্গে খানা খেতে হত। অবশ্য এ ব্যবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হল, যখন হিটলারের দফতরের এক উচ্চ অফিসার, ফেগেলাইন বিয়ে করলেন এফার এক বোনকে। তখন হিটলার-সমাজের একটুখানি বৃহত্তর চক্রে এফাকে পরিচয় দেওয়া হত সম্মানিত অফিসার ফেগেলাইনের শ্যালিকারূপে। মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ির মেয়ের বর!

৩ ইংরেজের স্নবারির "বামনাই"য়ের দুই চূড়ান্ত বেশরম, বেহায়া উদাহরণ পাঠক এস্থলে পাবেন। হিটলার নিরামিষাশী ছিলেন ও তদুপরি তাঁকে বিশেষ বিশেষ খাদ্য খেতে হত; অর্থাৎ তিনি ডায়েট খেতেন। সে-সব বিষয়ে রান্না বড় বড় হোটেলের "শেফ"-রাও রাঁধতে জানে না। তাই ডাক্তারদের আদেশে তাঁকে নিযুক্ত করতে হয় একটি অতিশয় উচ্চশিক্ষিতা মহিলাকে। ইনি সর্বোচ্চ সম্মানসহ এম. ডি. পাস করার পর বিশেষভাবে স্পেশালাইজ করেন কিভাবে বিশেষ বিশেষ খাদ্য দিয়ে রুগীকে সারানো যায় (আমাদের কবিরাজ ঠাকুমা-দিদিমা যা করে থাকেন) এবং যারা শীতের দেশে নিরামিষাশী তাদের খাদ্য কিভাবে তৈরি করতে হয়—যাতে করে মাছ-মাংসের অভাব পরিপূরণ করা যায়। ইংরেজ এই সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বার বার "কুক", "পাচিকা", "রাঁধুনী বাম্নী", "বাবুর্চি" বলে তাচ্ছিল্যভরে উল্লেখ করে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। তিনি প্রায়ই এঁর সঙ্গে ডিনার খেতেন। ভাবটা এই, ছোট জাতের হিটলার আর "রাঁধুনী", "বাবুর্চি" ছাড়া কার সঙ্গে হৃদ্যতা করবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে অকস্মাৎ ইংরেজের স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায় এবং মহিলার পাণ্ডিত্যের কথা বলতে বেবাক ভুলে যায়। এবং ভুলে যায় বলতে, মহিলাতে হিটলারেতে খেতে খেতে "মোচার ঘন্টে কতখানি গুড় দিতে হয়" সে নিয়ে আলোচনা হত না। আলোচনা হত স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান নিয়ে।...এবং পূর্বেই বলেছি, লিঙের শিক্ষাদীক্ষা পদমর্যাদা "ভুলে গিয়ে" ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে "ভ্যালে চাকর" নামে তাঁকে হীন করার চেষ্টা করেছে।...হিটলারের আদশ সত্ত্বেও তিনি লিঙেরই মতো হিটলারকে ত্যাগ করতে সম্মত হননি। আমার যতদূর জানা, তিনি বার্লিনে নিহত হন। প্রভুভক্তির ফলস্বরূপ।

বিরাট বিরাট লক্ষজন পরিপূর্ণ সভাতে, যেখানে হিটলার ওজস্বিনী বজ্রভাষিণী থাণ্ডারী লেকচার ঝাড়বেন, সেখানেও তাঁকে বিশেষ আসন দেওয়া হত না। তাঁর এবং হিটলারের আর পাঁচজন কর্মচারীর সঙ্গে তিনি সবার সঙ্গে মিশে গিয়ে দয়িতের জনগণমনচিত্তহারিণী বক্তৃতা শুনতেন।

হায়! একে কি বলবো—"বড় দুঃখে সুখ" বা "বড় সুখে দুঃখ"? আমি এ-বাবদে মূর্খ—আমার বিদগ্ধ, সম্মানিত সখা "শিব্রাম" এরকম একটা মোকা পেলে ঝপ্ করে একটা অকল্পনীয় পান্ করে খপ করে একটা আরও অচিন্তনীয় সুমধুর সুভাষিত ম্যাক্সিম বানিয়ে ফেলতেন পুরো দেড় গণ্ডা শব্দ ব্যবহার না করেই। এই একটা ব্যাপারে লোকটা মক্ষী-চোস্ কঞ্জুস। অভিধানের শব্দ-ভাণ্ডার যেন ব্যাঙ্কের ভল্টে লুকানো চিত্রতারকাদের—সকলের না কারও-কারোর—ইনক্যাম-ট্যাক্স অফিসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ট প্রদর্শন সম্পদ।

আমি কিন্তু দেখছি এর ট্র্যাজিক দিকটা। পিতামহ ভীষ্মের পরই যে বীরকে এ-ভরত সর্বসম্মত স্বীকৃতি দিয়েছে তিনি একচক্রা ভদ্রোত্তম কমান্ডর-ইন-চীফ্ ফীল্ড-মার্শাল কর্ণ। তিনি যখন কুরুপ্রাঙ্গণে শৌর্যবীর্য দেখাচ্ছেন, তখন মাতা কুন্তী তাঁর প্রতি-সাফল্যে কি তাঁর মাতৃগর্ব, মাতৃশ্লাঘা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন? শাস্ত্রোদ্ধৃতি দিতে পারবো না, তবে বাল্যবয়সের আমার সংস্কৃত শিক্ষার প্রথম গুরু আমাকে সঙ্গোপনে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে বলেছিলেন, মাতা কুন্তীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় সন্তান ছিলেন কর্ণ।

এফা ব্রাউনের ঐ একই ট্র্যাজেডি। সর্বজনসমক্ষে তিনিও গাইতে পারেন না—"বঁধু তুহাঁরি গরবে গরবিনী হম, রূপসী তুহাঁরি রূপে।"

অভিমানিনী পাঠিকা, তুমি হয়তো শুধোবে, এ-হেন ভণ্ডামীর অপমানজনক পরিস্থিতি এফা মেনে নিলেন কেন? এর উত্তরে আমার নিজের কোনো মন্তব্য না দিয়ে শুধু নিবেদন :

"চন্দ্রাবলী কুঞ্জে গিয়ে
সারা নিশি কাটাইয়ে
প্রভাতে এসেছ, শ্যাম,
দিতে মনোবেদনা।"

[কত না অশ্রুজল—রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড]

টুনি মেম

বেশি দিনের কথা নয়, হালের। পড়িমড়ি হয়ে শেয়ালদার আসাম লিঙ্কে উঠেছি। বোলপুরে নাববো। কামরা ফাঁকা। এককোণে গলকম্বল মান-মুনিয়া দাড়িওলা একটি সুদর্শন ভদ্রলোক মাত্র। তিনি আমার দিকে আড়নয়নে তাকান, আম্মো।

একসঙ্গেই একে অন্যকে চিনতে পারলুম।

আমি বললুম, 'খান না রে?'

সে হাঁকল, 'মিতু না রে?'

যুগপৎ উল্লম্ফন, ঘন ঘন আলিঙ্গন। পাঠশালে পাশাপাশি বসতুম। তারপর এই তিরিশটি বছর পরে দেখা। প্রথম উচ্ছ্বাস সমাপ্ত হলে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুই এ রকম বদ্‌খদ দাড়ি-দাড়া রেখেছিস কেন?'

খানটা ঐ পাঠশালার যুগেও ছিল হাড়ে টক শয়তান। প্রশ্ন শুধোলে ইহুদিদের মত পাল্টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, উত্তরটা এড়িয়ে যায়। শুধোলে, 'দাড়া কারে কয়?'

'হাঁড়ি বড় সাইজের হলে হাঁড়া হয়, গাড়ি গাড়া। দাড়ি হিন্দী উর্দুতে স্ত্রীলিঙ্গ!—কিন্তু দাড়া পুংলিঙ্গ। তোরটা দাড়ি নয়, দাড়া।'

অবশ্য অস্বীকার করিনে, তাকে দেখাচ্ছিল গত শতাব্দীর ফরাসী খানদানীদের মত। খানের রং প্যাটপেটে ফর্সা। গায়ে প্রচুর পাঁঠার রক্ত। শুধালুম, 'তা তোর পাকিস্তান ছেড়ে এই না-পাক দেশে এসেছিস কি করতে?'

'আজমীরের খাজা মুঈন-উদ্‌-দীন চিশতীর কাছে মানত করেছিলুম, বাবার আশীর্বাদে আল্লা যদি আমাকে এস্‌ পি-তে প্রোমোশন করেন তবে বাবার দরগা দর্শনে যাব, ভালো-মন্দ যা আছে তাই দিয়ে শীর্ণি চড়াবো। সেই সেরে ফিরছি। এই নে প্রসাদী-গোলাপের পাপড়ি।'

আমি মাথায় ছুঁয়ে বললুম, 'ও! তুই বুঝি পুলিশে ঢুকেছিলি?'

বললে, 'হ্যাঁ, সাব-ইন্‌স্‌পেকটার হয়ে।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'বলিস কি রে? আর এরই মধ্যে এস্‌ পি!'

প্রসাদীর পাপড়ি মাথায় ঠেকিয়ে বললে, 'খাজা মুঈন-উদ্‌-দীন চিশতীর দোওয়া আর হিন্দুদের কৃপায়!'

'হিন্দুদের কৃপায়!'

'হ্যাঁ ভাই, তেনাদেরই কেরপায়। তেনারা যদি পুব বাঙলার পুলিশের ডাঙর ডাঙর নোকরি ছেড়ে ঝেঁটিয়ে পশ্চিম বাঙলা আর আসামে না চলে যেতেন তা হলে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় প্রোমোশন পেতুম কি করে? তারা থাকলে হয়তো অবিচার করে আমাকে দু'একটা না-হক প্রোমোশন দিত, কিন্তু একদম দিনকে রাত, রাতকে দিন তো করা যায় না। আর তুই তো বিশ্বাস করবি নে—তুই চিরকালই সন্দেহপিচাশ, যে কটি হিন্দু রয়ে গেল তারা গণ্ডায় গণ্ডায় না হোক জোড়ায় জোড়ায় প্রোমোশন পেয়েছে। জানিস, মণ্ডল সিভিল সার্জন হয়েছে?'

আমি ভিরমি যাই আর কি। গাড়ল ফোড়াটি পর্যন্ত কাটতে জানতো না।

খান বললে, 'সব তো শুনলি। তোর বইও আমি দু'চারখানা পড়েছি। আচ্ছা বল তো, এসব বানিয়ে বানিয়ে লিখিস, না কিছু কিছু দেখা-শোনার জিনিস, অভিজ্ঞতার বস্তু?'

'কিছুটা বানিয়ে, কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে।'

'তাজ্জব! আমি তো ভাই বিস্তর খুন-খারাপী দেখলুম। এক-একটা এমন যে, আস্ত একখানা উপন্যাস হয়। কিন্তু তারই রিপোর্ট লিখতে গেলে আমার তালুর জল আর নিবের কালি শুকিয়ে যায়। কি করে যে তুই লিখিস।'

আমি বললুম, 'আমাকেও যদি সুদ্ধমাত্র ফ্যাক্টের ভিতর নিজেকে সীমাবদ্ধ করে লিখতে হত তাহলে আমার রিপোর্টটা হত তোর চেয়েও ওঁচা। কল্পনা এসে উৎপাত করতো। তা সে কথা যাক্ গে। আমার দিনকাল বড্ডই খারাপ যাচ্ছে—প্লটের অপর্যাপ্ত অনটন। সম্পাদক মিঞা আবার গল্পই চান, 'ইলসট্রেট' করবেন। বল না একটা।'

দাড়ির ভিতর দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে বললে, 'কোন্‌টা বলি, কেসগুলো তো মাথার ভিতর আব-জাব করছে। আচ্ছা দাঁড়া, ভেবে নি।'

এমন সময় সিগনেল অভাবে ট্রেন খামোকা মাঝপথে দাঁড়ালো। খান বাইরের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এরা কি জাত রে?'

তাকিয়ে দেখি, মিশকালো সাঁওতাল মেয়ে—তার উপর মেখেছে প্রচুর তেল। শাড়ির উপর বেঁধেছে গামছা, উত্তমাঙ্গে চোলিফোলি কিছু নেই, নিটোল দেহ, সুডোল ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষেরটা বোঝা গেল পরিষ্কার, কারণ হাত দুটি যতদূর সম্ভব উঁচু করে পলাশ ফুল পাড়বার চেষ্টা করছিল খোঁপায় গুঁজবে বলে। হলদে পলাশ। এ অঞ্চলে লালের তুলনায় ঢের কম। কি জানি, মেয়েটা হয়তো ভেবেছে, লাল কালোর চাইতে হলদে কালোর কনট্রাস্টে খোলতাই বেশি।

বললুম, 'সাঁওতাল। হ্যাঁ, আমাদের দেশে অতদূর ওরা পৌঁছয়নি। কিংবা হয়তো ছিল এককালে। কাল যে-রকম হিন্দু পুব বাঙলা ছেড়ে চলে এল, এরা হয়তো পরশু।'

খান দেখি, আমার কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না। আপন মনে কি যেন ভাবছে। ওস্তাদ গাওয়াইয়া যে রকম গান শুরু করার পূর্বে হঠাৎ কেমন যেন আনমনা হয়ে যান। তখন বিরক্ত করতে নেই।

গাড়ি ছাড়লো। একটু কাছে এসে বললে, 'ঐ কালো মেয়ে আরেকটি মেয়ের কথা আমার স্মরণে এনে দিল। তার রঙ ছিল এর চেয়েও কালো। কিন্তু সে কী কালো! সব রঙের অভাবে নাকি কালো হয়! হ্যাঁ তাই; কোন রঙই সাহস করে তার শরীর চড়াও করতে পারেনি। আমি তাকে দেখেছিলুম তার শারীরিক মানসিক চরম দুরবস্থায়। তবু চোখ ফেরাতে পারিনি। হিন্দুরা কেন যে "কালী" "কালী" করে তখন বুঝতে পেরেছিলুম।'

গাড়ি বর্ধমানে এসে থামলো। বর্ধমানে আমি গত সাত বছর ধরে অর্ডার দিয়ে কখনও কেলনারের কাছ থেকে চা-আণ্ডা পাইনি। কাজেই ফর সেফটিস সেক প্রথমেই ভাঁড়ের চা কিনে রাখলুম। বিস্তর ছুটোছুটি করে কিছু-কিঞ্চিতের যোগাড় হল। স্থির করলুম, বোলপুরে খানকে একটা পুরো পাক্কা খানা তুলে দেব। সেখানকার গোসাঁই আমাকে নেক-নজরে দেখে।

গাড়ি ছাড়তে খান বললে, 'আমি তখন আক্রুগড়ে এস্ আই—আমরা বাঙলায় লিখি এছাই। রোজ থানায় বসে ভাবি, ইয়া আল্লা, চাকরির এ দুস্তর দরিয়া পেরিয়ে কবে গিয়ে এমন মোকামে পৌঁছব যেখানে হরহামেশা পয়সাটা আধলাটার হিসেব না করতে হয়। ঘুষ খেতে তখনও শিখিনি—'

আমি শুধালুম 'এখন শিখেছিস? তা—'

বললে, 'হ্যাঁ', তবে সে অন্য ধরনের। পরে তোকে বুঝিয়ে বলবো।

আক্রুগড় বড় মনোরম জায়গা। অনেকটা শিলঙের মত উঁচু-নিচুতে ভর্তি, টিলাটালার টক্কর। কোন্ এক সায়েব নাকি মালয় না কোথা থেকে কৃষ্ণচূড়া এনে এখানে পুঁতে দেয়। এখন শহরটা আগাপাস্তলা তাই দিয়ে ভর্তি। শহরটা এমনিতেই সবুজ; তার উপর এল গোলমোরের কালো সবুজ আর তার মাঝখানে ফুটে ওঠে বাড়িগুলোর পোড়া লালের টাইলের ছাদ।

চতুর্দিকে অজস্র চা-বাগান আর তেলের খনি। সায়েব-সুবো, বেহারী মারওয়াড়িতে শহরটা গিসগিস করছে। আর খাস আসামীদের তো কথাই নেই—তারা বড় নম্র, বড় সরল। আক্রুগড়ের বটতলাতে চার আনা দিয়ে মিথ্যে সাক্ষী পাওয়া যেত না। আমাদের দেশে আকছারই যা যায়। এখন কি অবস্থা তা অবশ্য জানি নে।

বড়কর্তা বলেছিলেন, কিছু একটা জবরদস্ত নূতন না করতে পারলে কুইক প্রোমোশন হয় না। জবরদস্ত নূতন করবোটাই বা কি? এখানে খুনখারাবী হয় অত্যল্প। উঠোনই নেই তো আমি নাচি কি করে?

তাই থানায় বসে বসে পুরনো দিনের খাতাপত্র দেখি, ফাইল পড়ি। সেইটেই একদিন লেগে গেল কাজে। পরে বলছি।

আমার চেনা এক রাজমিস্ত্রী আমায় রাস্তায় দাঁড় করিয়ে একদিন বললে, মোল্লাবাজারের পিছনে উঁচু টিলার উপর যে খালি বাঙলো আছে তার বাবুর্চিখানার ভিত মেরামত করতে গিয়ে সে একটা লাশ আবিষ্কার করেছে—ঠিক লাশ নয়, কঙ্কালই বলা যেতে পারে—পচা ছেঁড়া কম্বল জড়ানো।

রক্তের সন্ধান পেয়ে বললুম, "তুমি ওখানে যাও। হঠাৎ যেন আবিষ্কার করেছ এই ভাব করে আমাকে খবর পাঠাও।'

তা না হলে পরে প্রমাণ করতে হবে, ওটা সত্যই সেখানে ছিল, বাইরের থেকে এনে কেউ চাপায়নি।

জিনিসটা যে খারাবী, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বাবুর্চিখানার নিচে কম্বলে জড়ানো পোঁতা কঙ্কাল! এখানে কস্মিনকালেও কোনও গোরস্তান ছিল না—টিলার ঢালুর দিকে কতটুকু জায়গা যে ওখানে মানুষ গোরস্তান বানাতে যাবে! তাহলে এটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপার। শুধু খারাবী নয়, খুন-খারাবী।'

আমি বললুম, 'সাক্ষাৎ শার্লক হোম্‌স!'

শুধোলে, 'সে আবার কে?'

আমি প্রথমটায় হকচকিয়ে পরে সামলে নিয়ে বললুম, 'তুমি এগোও, আমি আর রসভঙ্গ করবো না।'

বললে, 'প্রথম রক্তের সন্ধান পেয়ে আমি যেন হন্যে হয়ে উঠলুম। সমস্ত রাত ঘুম হল না। মাথার ভিতর ঘুরছে, কতরকম নরহত্যার ছবি, যেন স্বয়ং পাঁচকড়ি দে সেগুলো এঁকে যাচ্ছেন, আর দীনেন্দ্রকুমার রায় আপন হাতে রঙ গুলে দিচ্ছেন। বেবাক লালে লাল।'

আমি বললুম, 'রসভঙ্গ করতে হল। অপরাধ নিসনি। হোম্‌স হল বিলিতী অরিন্দম।'

খান বললে, 'তাই বল। কিন্তু তুই ভাবিস নে, তোকে একটা রগরগে খুনের কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি মাত্র। এতে আছে বড় দুঃখের কথা। বড় বিষাদ বেদনা। স্বর্গ আমি দেখিনি, কিন্তু স্বর্গচ্যুত হতভাগ্য একজনকে আমি দেখেছি। সে দৃশ্য আর কারও দেখবার দরকার নেই।'

'কি বলছিলুম? হ্যাঁ, ভোর হতে-না-হতেই আমি থানায় এসে উপস্থিত। কিন্তু মূর্খের মত আমি রাজমিস্ত্রীকে বলে রাখিনি, সে কখন আসবে। সে যদি এসে ফিরে যায়; কিংবা কেসটা হাতছাড়া হয়ে যায়।

আজ হাসি পায়। রাতদুপুরে এখন যদি জমাদার এসে খবর দেয়, পদ্মার চরে ডাকাতিতে পাঁচটা চরুয়া আর তিনটে ডাকাত মারা গিয়েছে, আমি তা হলে পাশবালিশ জাবড়ে ধরে বলি, "যা-যা, দিক্ করিসনি!"

রাজমিস্ত্রী হেলেদুলে বেলা প্রায় বারোটায় এলেন—আমাকে আষ্ট ঘণ্টা দক্ষানোর পর।

যেন সদ্য এইমাত্র ফার্স্ট ইনফর্মেশন পেয়েছি, এরকমধারা মুখের ভাব করে দুটি "কষ্টকম্বল" সঙ্গে নিয়ে অকুস্থলের দিকে রওনা দিলুম। গিয়ে দেখি অত্যন্ত কুস্থান, অর্থাৎ অকুস্থানই বটে।'

আমি বললুম, 'ঐ মলো! অকুস্থান হয়েছে আরবী "ওয়াকেয়া", অর্থাৎ "ঘটনা" আর "স্থান" নিয়ে।'

খান বললে, 'থাক্ থাক্, আর বিদ্যে ফলাতে হবে না। অকুস্থলের হালটা ভালো করে শোন।

তিন বছর ধরে বাঙলোটায় বসতি ছিল না বলে বাবুর্চিখানার দোরজানালা চুরি গিয়েছে, ঘরটা পড়ো-পড়ো। কে এক নূতন সায়েব আসবে বলে ওটার ভিত মেরামত করতে গিয়ে বেরিয়েছে একটা কঙ্কাল, পচা কম্বলে জড়ানো। মাথার চুল ছাড়া আর সব পচে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে। আমি নয়া শিকারীর মত সন্তর্পণে এগোলুম বলে খুলির ভিতর মাটির মধ্যে পেয়ে গেলুম একটা বুলেট—তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখি, খুলির পিছনের দিকে একটা ঐ সাইজের গর্ত।

আক্রগড়ে গণ্ডায় গণ্ডায় স্পেশ্যালিস্ট নেই যে, আমায় তদ্দণ্ডেই বাতলে দেবে ব্যাপারটা কি, অন্তত এই যে কঙ্কাল, এর লাশটা কবে মাটিতে পোঁতা হয়েছিল। শহরের অ্যাসিস্টেন্ট সার্জন আমাদেরই জেলার ধীরেন সেন। তাঁকে ধরে এনে শুধালুম। বললেন, অন্তত তিন বছর। বিচক্ষণ লোক। রায়টা দিলেন কঙ্কাল উপেক্ষা করে, কম্বলটা উত্তমরূপে পরখ করে।

তা হলে প্রশ্ন, তিন বছর পূর্বে ঐ বাঙলোয় থাকতো কে—যার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল?

খবর পাওয়া গেল, আইরিশম্যান পেট্রিক ও'হারা সায়েব। সে এখন কোথায়? জেলে? কেন? সে-কথা জেনে কি পুলি-পিঠের নেজ গজাবে?

আমার মন খনে এদিকে ধায়, খনে ওদিকে ধায়। বন্ধ ঘরে আগুন লাগলে মানুষ যেমন মতিচ্ছন্ন হয়ে খনে এ-দরজায়, খনে ও-দরজায় ধাক্কা দেয়—কোনও একটাও ভালো করে একাগ্রমনে খোলবার চেষ্টা করে না—আমার হল তাই। কোনও একটা ক্লু পাঁচ মিনিটের তরেও ঠিকমত ফলো আপ করতে পারি নে।

এখন জ্ঞানগম্যি হয়েছে ঢের। এখন বুদ্ধি হয়েছে বলে বুঝেছি যে, এসব রহস্য সমাধান বুদ্ধির কর্ম নয়। রুটিনের ঘানিতে সব-কিছু ফেলে দিতে হয়। তেল বেরিয়ে আসবেই আসবে, সমস্যা সমাধান হবেই হবে।

যে-কাজ আজ পাঁচ মিনিটে করতে পারি, তখন লেগেছিল এক হপ্তা। ততদিনে প্রশ্নগুলো মোটামুটি সামনে খাড়া করে নিয়েছি :

(১) লোকটা কে?

(২) এটা খুন তো?

(৩) কে খুন করলে?

(৪) কার বন্দুকের গুলি?

কঙ্কাল থেকে মানুষ সনাক্ত অসম্ভব না হলেও বড়ই কঠিন। তন্ন তন্ন করেও আঙটি-টাঙটি, বাঁধানো দাঁত, ডেন্টিস্টের কোনও প্রকারের কেরদানি কিছুই পাওয়া গেল না। ব্লাঙ্কো!

আমি তো এ-শহরে এসেছি মাত্র কয়েক মাস হল, কিন্তু পুরনো বাসিন্দাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু জানে, কিন্তু অহমিয়ারা সরল হলেও এ-তত্ত্বটি বিলক্ষণ জানে যে, পুলিশের ঝামেলাতে খোদার খামোখা জড়িয়ে পড়তে নেই। ব্লাঙ্কো!

'ইতিমধ্যে রিপোর্ট পৌঁছল, খুলির ভিতর যে বুলেট পাওয়া গিয়েছিল, সেই বুলেটই খুলির ফুটোটার জন্য দায়ী।'

আমি বাঁকা হাসি হেসে বললুম, 'মারাত্মক আবিষ্কার। এ তো কানাও বলতে পারে। আর ঐ দেখ, তোর কৃষ্ণসুন্দরী আর একপাল সাঁওতালী। ওদের বসতির দিকে এগোচ্ছি এখন।'

গাড়ি তখন খানা জংশনে 'লুপ' লাইনে ঢুকবে বলে ধীরে ধীরে চলছিল।

খান অনেকক্ষণ ধরে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'নাঃ, টুনি মেমের পায়ের নখের কণাও এরা হতে পারে না।'

আমার অভিমান হল। সাঁওতালী আমাদের প্রতিবেশী মেয়ে।

লক্ষ্য না করেই খান বললে, 'বুলেটে যে খুলি ফুটো করেছে, সে তো তুই বুঝিস, আমিও বুঝি, কিন্তু আদালত কি বুঝবে? তারা প্রমাণ চায়। হুঁঃ, আদালত তো আদালত! অডিটের বেলা জানে না কি হয়? পেনশন্ নেবার জন্য তুমি সার্টিফিকেট দাখিল করলে যে, তুমি এপ্রিল মাসে জীবিত আছ। অডিট শুধালে, "কিন্তু মার্চ মাসের সার্টিফিকেট কই? আপনি যে মার্চ মাসে জীবিত ছিলেন, তার প্রমাণ কি? না হলে যে মার্চ মাসের পেনশন্‌টা পাবেন না।"

আমি বললুম, 'সেটা কিন্তু ঠিক। দিল্লীর যাদুঘরে কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বিদেশী ভিজিটরকে ছোট্ট একটি শিশুর খুলি দেখিয়ে বললেন, "ইটি শঙ্করাচার্যের খুলি।" ভিজিটর অবাক হয়ে শুধালে, "তাঁর খুলি এত ছোট ছিল?" মন্ত্রী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "এটা তাঁর শিশুবয়সের খুলি।" দুটো কিংবা ছটা খুলি যখন হতে পারে, তখন দুটো কিংবা ছটা জীবন হবে না কেন? তা হলে একটা মার্চ মাসে গ্যাপ পড়াটাই বা বিচিত্র কি? ওসব কথা থাক্, তারপর কি হল বল।'

'তখন অনুসন্ধান করতে লাগলুম খুনটা হয়েছে ও'হারা সায়েব এই বাঙলোয় থাকাকালীন, না তার পরে কেউ খুন করে লোকটাকে নির্জন পোড়ো বাড়িতে পুঁতে গেছে?

ও'হারা জেলে। দীর্ঘ মেয়াদে।

থানার পুরনো ফাইল কাগজপত্র ঘেঁটে যা আবিষ্কার করলুম, সেও বিচিত্র। সায়েব ছটা ইংরেজ পরিবারকে চকোলেটের ভিতর বিষ ঠেসে তাই খাইয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। প্রমাণের অভাব হয়নি। আক্রুগড় থেকে প্রায় ষাট মাইল দূরের এক ছোট্ট ডাকঘর থেকে ও'হারা পাঠিয়েছিল ছটি *রেজেস্ট্রি পার্শেল ছজন ইংরেজের নামে—পোস্ট মাস্টার সেই মর্মে সাক্ষী দিয়েছিল।*

এদের দুজন থাকতো আব্রুগড়ে, বাকিরা কাছে-পিঠের চ-বাগানে। একই সঙ্গে একই জিনিস খেয়ে সবাই মর-মর হয়েছিল বলে সিভিল সার্জন বুদ্ধি করে সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলে যে চকোলেটের মধ্যে গড়বড় সড়বড় আছে। তাই তারা সে-যাত্রা রক্ষা পায়। কেউ মরেনি।

কিন্তু ছটা কেন, 'একটা পরিবার—একটা পরিবারই বা কেন—একজন লোককে খুন করার চেষ্টা করলেও দীর্ঘ মেয়াদের জন্য শ্রীঘর! ও'হারা আলিপুরে।'

ইতিমধ্যে বীরভূমের খোয়াইডাঙা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। খান বললে, 'এদের সঙ্গে আমাদের সবুজ সিলেটের কোনও মিল নেই বটে কিন্তু তবু এর রুক্ষ শুষ্ক একটা কঠোর সৌন্দর্য আছে।' তারপর মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলুম। মনে পড়েছে। হঠাৎ আমার মাথায় এক নূতন বুদ্ধির উদয় হল। ও'হারা যখন আইরিশম্যান তখন তার বন্দুক থাকাটা অসম্ভব নয়। খবর নিয়ে জানতে পারলুম, ছিল। আমি জানতুম কারও দীর্ঘ মেয়াদের জেল হলে তার বন্দুক সরকারী তোষাখানায় জমা দেওয়া হয়। সেটা সেখানে পাওয়া গেল। বিশেষজ্ঞরা বললেন, খুলির মাথায় যে বুলেট পাওয়া গেল, সেটা নিঃসন্দেহে ঐ বন্দুক থেকে ছোঁড়া হয়েছে।

যাক। এতক্ষণে এক কদম এগোলুম কিন্তু সব চেয়ে বড় প্রশ্ন যে লোকটা খুন হয়েছে সে কে?

কলকাতায় যখন কলেজে পড়তুম তখন আমাদের হস্টেলে রামানন্দ চাটুজ্যে একবার জর্নালিজম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে আসেন। মেলা কথা কওয়ার পর তিনি শেষ করেন এই বলে যে, যে-কোনও জ্ঞান, যে-কোনও খবর, তার মূল্য যত সামান্যই হোক না কেন, কোনও না কোনও দিন জর্নালিজমের কাজে সেটা লেগে যেতে পারে।

পুলিশের কাজেও দেখলুম তাই। সেই যে আমি অবসর সময়ে থানায় বসে বসে পুরনো ফাইলের কাসুন্দি ঘাঁটতুম তাই লেগে গেল কাজে।

থানায় থানায় একখানা খাতাতে লেখা থাকে কে কবে নিরুদ্দেশ হল—অবশ্য যদি আত্মীয়স্বজন খবর দেয়। বিরাট দেশ ভারতবর্ষ—কত লোক কত রকমে 'কপ্পুর' হয়ে যায়, কে বা রাখে তার খবর। তবু মনে পড়ল তিন বছর আগে এক বিহারী মজুর নিখোঁজ হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, কঙ্কালটা জড়ানো ছিল একটা চেক্ কম্বলে, এ ডিজাইনটা বিহারীদের ভিতর খুবই পপুলার।

যে পাড়াতে সে থাকতো সেখানে জোর অনুসন্ধান চালালুম। অবশ্য ছদ্মবেশে। চায়ের দোকানে আশকথা পাশকথা কওয়ার পর একে ওকে তাকে শুধোই, সেই বিহারী রামভজনের কি হল?

যা খবর পাওয়া গেল সেটা আমাকে আরও কয়েক কদম এগিয়ে দিলে। তার নির্যাস—

"রামভজনের বউ টুনি মেম—"

আমি আশ্চর্য হয়ে বাধা দিয়ে বললুম, 'বিহারী মজুরের বউ মেম হয় কি করে?'

খান বললে, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। টুনি ও'হারা সায়েবের বাঙলোয় কাজ করতো। পরে সায়েবের রক্ষিতা হয়ে যায়। তাই বিহারীরা তার নাম দেয় "টুনি মেম"।

রামভজন নাকি একদিন তার দেশের ভাই-বেরাদরকে বলে, সে দেশে চলে যাচ্ছে; যা জমিয়েছে তাই দিয়ে খেত-খামার করবে। হয়তো তারও বাড়া আরেকটা কারণ ছিল। সামনাসামনি না হোক আড়ালে-আবডালে অনেকেই টুনি মেমকে নিয়ে মস্করা-ফিস্কিরি করতো। অতি অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে, রামভজনকে বাদ দিয়ে নয়।

এবং শেষ খবর, টুনি মেম আর তার স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার সময় নাকি ওদের দুজনকে ও'হারার বাঙলোর গেটের সামনে দেখা যায়।'

আমি শুধালুম 'তারপর?' কৌতূহল তখন আমার মাথায় রীতিমত চাড়া দিয়ে উঠেছে।

আমাকে হতাশ করে খান বললে, 'ব্লাঙ্কো। মাস তিনেক পর যখন রামভজনের পরিচিত নূতন মজুররা আব্রুগড়ে এল—ওরা কিস্তিতে কিস্তিতে আসছে যাচ্ছে হামেশাই—তখন তারা বললে, রামভজন আদপেই দেশে পৌঁছয়নি। আব্রুগড়ের কেউ বললে, টুনি মেমের বেহায়াপনায় তিতিবিরক্ত হয়ে সন্ন্যাস নিয়েছে, কেউ বললে, দার্জিলিং না কোথায় যেন চা-বাগানে কাজ নিয়েছে।'

'আর টুনি মেম?'

'সে তখন ও'হারার রক্ষিতা। কিন্তু 'রক্ষিতা' বললে হয়তো ও'হারা ও টুনি মেম দুইজনারই প্রতি অবিচার করা হয়। ও'হারা টুনি মেমকে রেখেছিল রানীর সম্মান দিয়ে আর টুনি মেম ও'হারাকে ভালোবেসেছিল লায়লী যে-রকম মজনুনকে ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু এ-সব আমি পরে জানতে পেরেছিলুম।

আমি তখন মনে মনে সমস্ত ব্যাপারটার একটা আবছা আবছা ছবি এঁকে ফেলেছি।

টুনি মেম স্বামীকে স্টেশনে নিয়ে যাবার পথে ও'হারার বাঙলোয় নিয়ে যায়। শীতকাল ছিল বলে রামভজন তার সেই চেক কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর যে-কোনও কারণেই হোক ও'হারা তাকে গুলি করে মেরে বাবুর্চিখানার ভিতের ভিতর পুঁতে ফেলে। যে-লোক ছ'টা পরিবারের খুনের চেষ্টা করতে পারে তার পক্ষে এটা ধুলো খেলা।

চায়ের দোকানে তদন্ত শেষ হলে পর একদিন থানা থেকে সরকারীরূপে চায়ের দোকানে যে সবচেয়ে বেশি ওকিবহাল ছিল তাকে ডেকে পাঠালুম। সে বললে কসম খেয়ে, কোন কিছু তার পক্ষে বলা অসম্ভব তবে রামভজনের ঐ রকম একখানা চেক কম্বল ছিল।

তাহলে মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই, ও'হারা যদি রামভজনকে খুন করে থাকে তবে তার একমাত্র সাক্ষী টুনি মেম।

টুনি মেম কোথায়?

খবর পেলুম ও'হারার জেল হওয়ার পর টুনি মেম বড় দুরবস্থায় পড়ে। শেষটায় কোন পথ না পেয়ে ও'হারা সাহেবের বাবুর্চির সঙ্গে উধাও হয়ে যায়।

এইবার সত্যি আমার সামনে যেন পাথরের পাঁচিল খাড়া হল। বহু অনুসন্ধান করেও কিছুমাত্র হদিস পেলুম না, খানসামা আর টুনি মেম গেল কোথায়?

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, সাহেবদের এই যে বাবুর্চি ক্লাসের লোক, এরা বাঙালী হিন্দু-মুসলমানদের বাড়িতে চাকরি পায় না। পুডিং-পাডিং রোস্টোমোস্টো দুনিয়ার যত সব অখাদ্য এরা রাঁধে, শুয়ার গোরুর ঘ্যাঁট এরা যেসব বানায় সেগুলো দূর থেকে দেখেই শেষ বিচারের দিন স্মরণ করিয়ে দেয়—খায় কোন্ বঙ্গ-সন্তানের সাধ্যি! অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, ও'হারার বাবুর্চি নিশ্চয়ই অন্য কোন সায়েবের চাকরি নিয়েছে।

তোকে পূর্বেই বলেছি, আব্রুগড়ের চতুর্দিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চা-বাগান আব-জাব করছে। আমি প্রতি উইক-এন্ডে আজ এটা কাল সেটার তদন্ত করতে লাগলুম। পরনে খানসামা বাবুর্চির পোশাক। সবাইকে শুধোই, বাবুর্চির চাকরি কোথাও খালি আছে

কিনা। আরও শুধাই, আমার এক ভাই নাম ভাঁড়িয়ে এক কুলি রমণীর সঙ্গে বসবাস করছে—আসল কারণ অবশ্য আমি ও'হারার খানসামাটার নাম আবিষ্কার করতে সক্ষম হইনি—আমাদের মা তার জন্য বড্ড কান্নাকাটি করছে—তার খবর কেউ জানে কি না?

বাগানের পর বাগান ব্লাঙ্কো ড্র করেই যাচ্ছি আর আমার রোখও সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যাচ্ছে।

শেষটায় আল্লার কুদরৎ, পয়গম্বরের মেহেরবানী, আর মুর্শিদের 'দোয়ার' তেরস্পর্শ ঘটে গেল।

এক চা-বাগিচার কম্পাউন্ডার শুধু যে খবরটা দিলে তাই নয়, বাঁকা হাসি হেসে বললে, "ও টুনি মেম! দেখে এসো গে তোমার বউদি কী সুখেই না আছেন।"

আমি মেলা তর্কাতর্কি না করে ধাওয়া করলুম ম্যানেজার সায়েবের বাঙলোর দিকে। সেখানে গিয়ে শুনি, বাবুর্চি পরশু দিন থেকে উধাও, তার 'বউ' কুলি লাইনের একটা কুঁড়েঘরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

সে এক অবর্ণনীয় দৃশ্য।

পড়ি পড়ি এই পড়ি, ত্রিভঙ্গ মুরারী-গোছ অতিশয় জরাজীর্ণ একখানা ছন বাঁশের তৈরি কুঁড়েঘর। ঝাঁপের তৈরি দরজাখানা পাশের মাটিতে পচছে।

ভিতরের দৃশ্য আরও মারাত্মক। স্যাঁতসেঁতে নয়, রীতিমত ভেজা মাটির ভিত। হেথায় গর্ত, হোথায় গর্ত। আল্লার মালুম গর্তে সাপ না ইঁদুর আছে। এক কোণে একটা ভাঙা উনুন। কবে যে তাতে শেষ রান্না হয়েছিল ছাই দেখে অনুমান করতে পারলুম না। তারই পাশে একটা সানকি গড়াগড়ি দিচ্ছে। দু'একটা ভাত শুকিয়ে কাঠ হয়ে তলানিতে গড়াচ্ছে। তারই পাশে মলমূত্র। নোংরা দুর্গন্ধে ঘরটা ম-ম করছে।

দেয়ালে হেলান দিয়ে একটি হাড্ডিসার বছর তিনেকের ছেলে চোখ বন্ধ করে ধুঁকছে। ছেলেটিকে কিন্তু তবুও যে কী অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছিল সেটা আমার চোখ এড়ায়নি। কেউ না বললেও আমি চট্ করে বলে দিতে পারতুম ইটি ও'হারার সন্তান। শুনেছি স্বর্গের দেবশিশুরা অমর, কিন্তু এই মরলোকে এসে যদি তাঁদের কাউকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত তবে বোধ হয় তার চেহারা এরকমই দেখাতো।

আমি যে গলা খাঁকরি দিয়ে ঘরে ঢুকলুম সে একেবারের তরে চোখও খুলল না। সে শক্তিটুকুও তার গেছে।'

অল্পক্ষণের জন্য নীরব থেকে খান বললে, 'বহু বৎসর পুলিশে কাজ করে করে আমি এখন সঙ্গ-দিল—পাষাণহৃদয়। তখন সবে পুলিশে ঢুকেছি—আমি ওদিক থেকে চোখ ফেরালুম।

সে আরও নিদারুণ দৃশ্য। একটা বছর দেড়েকের বাচ্চা তার মায়ের সায়া ধরে টানাটানি করছে। তারও সর্বাঙ্গে অনাহারের কঠিন ছাপ। ভালো করে কাঁদতে পর্যন্ত পারছে না। আর সে কী বীভৎস গোঙরানো—থেকে থেকে হঠাৎ অনাহারের দুর্বলতা যেন তার গলা চেপে ধরে আর কক্ করে গোঙরানো বন্ধ হয়ে যায়। তখনকার নীরবতা আরও বীভৎস।

চ্যাটাইয়ের উপরে শুয়ে টুনি মেম। পরনে মাত্র একটি সায়া—শতচ্ছিন্ন, বুক ঢেকে একখানা গামছা—জরাজীর্ণ। হাত দুখানা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে—কি জানি জীবন-মরণ-অনশন কিসের চিন্তা করছে।

স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আসন্ন-প্রসবা।

ক্ষণতরে পুলিশের কর্তব্য ভুলে গিয়ে আমার ভিতরকার মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছিল। আমি সবলে তার কণ্ঠরোধ করে পুলিশের কর্তব্যে মন দিলুম। অর্থাৎ এ-রমণী যেন টের না পায় আমি পুলিশ। ও'হারার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ যোগাড় করতে এসেছি।

তাই খানসামার ভাইয়ের পার্ট প্লে করে চিৎকার চেঁচামেচি আরম্ভ করলুম, "কোথায় গেল লক্ষ্মীছাড়াটা আপন বউকে ফেলে'?"

খান আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'জানিস মিতু, এত দুঃখের ভিতরেও মেয়েটি আমার দিকে একবার তাকিয়েছিল। কারণটা বুঝতে পেরেছিস? জানিস তো, আমরা সিলেটীরা যদি কুলি-রমণী গ্রহণ করি তবে সে হয় রক্ষিতা, কিংবা লোকে বলে খানকি-নটীর বেলেল্লাপনা, কুলি রমণীকে স্ত্রীর সম্মান সেও দেয় না, আর পাঁচজনের তো কথাই নেই। তাই এত দুঃখের ভিতরও বিবাহিত স্ত্রীর সম্মান পেয়ে তার চোখেমুখে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠেছিল।

আমি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছি, "কোথায় গেলেন আমার পরাণের ভাই? আচ্ছা আমার খবর নিস নে, নিসনি, কিন্তু হতভাগার মা যে কেঁদে কেঁদে দেশটা ভাসিয়ে দিলে তার পর্যন্ত তোয়াক্কা করলে না! এদিকে আবার বউ-বাচ্চা পোষবার ভয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে!"

আমার চেঁচামেচি শুনে কুঁড়েঘরের সামনে একপাল কুলি মেয়েমদ্দ জমায়েত হয়ে গিয়েছে। আমি দোরে দাঁড়িয়ে বললুম, "তোমাদের মধ্যে কেউ রাজি আছ, এদের জন্যে রান্নাবান্না করে দিতে, ঘর সাফসুতরো করতে, আর বেচারি বউটার সেবা-টেবা করতে? এখ্খুনি তাকে পাঁচ টাকা দিচ্ছি। মাসের শেষে ফের পুরো মাইনে পাবে। আর এই আরও দু'টাকা হাঁড়িকুড়ি চালডালের জন্য।"

সবাই চেঁচিয়ে বললে, "মুন্নি, মুন্নি!"

মুন্নি এগিয়ে এল। পুরনো ময়লা ছেঁড়া শাড়ি পরা। পরে জানতে পারলুম, এই গরিব বিধবা একমাত্র মুন্নিই যতখানি পারে টুনি মেমেদের দেখভাল্ করেছে। সেও নিঃসম্বল, কী-ই বা করতে পেরেছে! কিন্তু জানিস মিতু, দুর্দিনে দুটি দরদের কথাই বলে কটা লোক!

আর জানিস্, সেই মুন্নি আমাকে মৃদুকণ্ঠে কি বললে? বললে, "আমাকে মাইনে দিতে হবে না সাহেব। ওদের জন্যে যা রান্না করবো তার থেকে দু'মুঠো আমাকে খেতে দিলেই হবে।"

এর পরও যে খুদাতালায় বিশ্বাস করে না তাকে চড় মারতে ইচ্ছে করে।

মুন্নিকে বললুম, "এই নাও আট আনা। তাড়াতাড়ি গিয়ে মুড়ি-মুড়কি যা পাও নিয়ে এসো।"

চায়ের কথা বললুম না। ঐ একটিমাত্র জিনিস চা-বাগানে ফ্রি। বিস্তর কুলি বিন্ দুধ-চিনি সুদ্ধমাত্র চায়ের লিকার খেয়ে ক্ষিদে মারে।

পাঁচজন সাধারণ মানুষের স্বভাব, কেউ বিপদে পড়লে এগিয়ে এসে সাহায্য না করার, কিন্তু তখন যদি এরই একজন বুকে হিম্মৎ বেঁধে সাহায্য করতে আরম্ভ করে তখন অনেকেই তার পিছনে এসে দাঁড়ায়।

একজন ইতিমধ্যে বসবার জন্য আমাকে একটা মোড়া এনে দিয়েছে। আমি বললুম, "আমি একটা চারপাই কিনতে চাই। বেচবে?"

চারপাই বলতে-না-বলতে এসে গেল। ভিজে ভিত থেকে উদ্ধার পেয়েও কিন্তু টুনি মেমের মুখের ভাব বদলালো না।

তোকে বলেছি—হার্ড-বয়েল্‌ড পুলিশম্যান আমি তখনও হইনি, এমন কি অতিশয় সফ্‌ট-বয়েল্‌ডও না, তাই এই পুলিশের ভণ্ডামি করতে আমার বাধো-বাধো—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'এইবারে তুই আরম্ভ করলি সত্যি সত্যি মিথ্যে ভণ্ডামি। ভুলে গেছিস নাকি, ইস্কুলে আসবার সময় কাঁধে করে মা-হারা একটা কাঠবেড়ালিকে সঙ্গে নিয়ে আসতিস? মাস্টারমশাই সেটার জন্য চোটপাট করাতে "গফ্‌ট" ইস্কুল ছেড়ে নবাবী তালাবের ওপরে "রাজার ইস্কুলে" ট্রেনসফার নিলি?'

খান যেন আদৌ শুনতে পায়নি। বললে, "আসন্নপ্রসবা রমণী পুরুষের চিত্তহারিণী হয় না। কিন্তু তোকে কি বলবো, মিতু, ওরকম সুন্দরী মেয়ে আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

অনাদর, অবহেলা এবং সর্বোপরি অনাহার তাকে ম্লান করে দিয়েছে সত্য কিন্তু খাঁটি সোনার উপরকার ময়লা কতক্ষণ থাকবে! একে দু-দিন খেতে দিলে দুটি মিষ্টি কথা বললে এ তো চোখের সামনে কদম গাছের মত বেড়ে উঠবে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ফুল ফোটাবে। এই তো এখ্‌খুনি যখন মুড়ি এল আর ছেলেটি এই প্রথমবার প্রসন্ন নয়নে তার দিকে তাকালো, তখন তার মায়ের সৌন্দর্য যেন সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে উঠলো।

গয়ার কালো পাথরে কোঁদা মূর্তিটি যেন টুনি মেম। হিন্দুদের যে সুন্দর সুন্দর কালো পাথরের মূর্তি আছে সেগুলো সুন্দর আমি জানি, কিন্তু কালো বলে আমার মন কখনও সাড়া দেয়নি। টুনি মেমকে দেখে বুঝলুম, মরা কালো পাথর জ্যান্ত টুনির রঙের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে কী মারই না খেয়েছে!

আমি তো তেমন ফর্সা নই, আমি মজেছিলুম টুনির রঙ দেখে। আর ও'হারা তো আইরিশম্যান। সে যে পাগল হবে তাতে আর আশ্চর্য কি! গৌরী শ্রীরাধা কেন কৃষ্ণ-লীন হয়েছিলেন টুনি মেমকে দেখে বুঝতে পারলুম। তা সে যাক গে, তোকে আর কি বোঝাব। দেখাবার হলে দেখাতাম। ঐ একটি মেয়ে এ-রঙ নিয়ে জন্মেছিল। তার আগেও না, পরেও না।

ইতিমধ্যে মুন্নি খিচুড়ি চড়িয়েছে। ঘরটা পরিষ্কার করা হয়েছে। একটা টেমি টিম টিম করে জ্বলছে। আমি কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নিলুম।

বাগানের ছোটবাবু মুসলমান। তাকে সার্টিফিকেট দেখাবার ছল করে আমার পুলিশের পরিচয় দিলুম। খাওয়া-দাওয়া করলুম কিন্তু তাঁর বাবুর্চির সঙ্গে, পাছে কোনও সন্দেহের উদ্রেক হয়।

রাত ন'টার সময় টুনি মেমের ঘরে ফিরে দেখি মুন্নি তাকে আরও চারটি খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। আমাকে বললে, "ক'দিন ধরে কিছুই জোটেনি, সায়েব; আজ হঠাৎ খাবেই বা কী করে! তবু বলছি, পেটের বাচ্চার জন্য দুটি খেতে।"

টুনির পরনে শাড়ি। সেদিকে তাকাতে মুন্নি বললে, "আট আনা পয়সা দিয়ে মুদির দোকান থেকে ছাড়িয়ে এনেছি।"

আমি বললুম, "খুব ভালো করেছ।"

মুন্নি আপন কাঁথাখানা নিয়ে এসেছে। সেটা চেটাইয়ের উপর পেতে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে শুয়ে পড়ল।

আমি মোড়াটা চারপাইয়ের পাশে এনে বসলুম। টুনি সেই আগের মত শুয়ে আছে। হাত দু'খানা বুকের উপর।

আমি উঠি উঠি করছি এমন সময় টুনি চোখ বন্ধ রেখেই কোনও প্রকারের ভূমিকা না নিয়ে বললে, "আপনি সব কিছু জানতে চান—না?"

আমি হকচকিয়ে উঠলুম। কিন্তু তার পরের কথাতেই আশ্বস্ত হলুম। বললে, "কি করে এ অবস্থায় পৌঁছলুম!"

খান বললে, উত্তেজনা ঔৎসুক্যে আমি তখন অর্ধমৃত। "না, না, না, তোমার এখন শরীর দুর্বল, তুমি—" ঐ ধরনের কিছু একটা বলা-না-বলার মত কি যেন একটা অর্ধপ্রকাশ করেছিলুম।

টুনি বললে, "আমি আপনাদের ভাষায় কুলি। আপনারা মানুষ বলেই গণ্য করেন না, অথচ জানেন, আমি একদিন রাজরানীর সম্মান পেয়েছিলুম।"

খান বললে, 'বিশ্বাস করবি নে, মিতু, ঠিক এইরকম ধরনের মার্জিত ভাষায় কথা বলেছিল। আমি তো অবাক!'

আমি বললুম, 'আম্মো।'

খান বললে, 'সেটা পরে পরিষ্কার হল। তোকে সব বলছি, টুনি মেম যা বলেছিল।

বললে, "অনেক অপমান নির্যাতন সয়েছি। হেন অপমান নেই যা আমায় সইতে হয়নি—মুখ বুজে। নূতন অপমান আর কি হতে পারে? তাই মনে হচ্ছে আমার যাবার সময় বুঝি ঘনিয়ে এল।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। মুন্নির নাক অল্প অল্প ডাকছে। টেমিটা বাতাসে এদিক-ওদিক নাচছে।

টুনি বললে, "ও'হারা সায়েবের বোন এসেছিল বিলেত থেকে এ-দেশের হাতি গণ্ডার দেখবে বলে। তারই আয়া হয়ে আমি ওবাড়িতে ঢুকি। মেম চলে যাওয়ার পরও তিনি আমায় ছাড়লেন না।

"আপনি মুরুব্বী, আপনাকে সব কথা বলতে আমার বাধছে। তবু যে বলছি, তার কারণ আপনি এসেছেন আমার ত্রাণ-কর্তা, আমার বন্ধুরূপে। আপনাকে না বলবো তো বলবো কাকে? আর এ যে আমার বুকের উপর বোঝা হয়ে চেপে বসে আছে। এ-বোঝা না নামিয়ে তো আমার নিষ্কৃতি নেই। আপনি শুনুন।

"আমাদের প্রণয় হয়েছিল। আমি স্বীকার করছি, স্বামী বর্তমান থাকতে পরপুরুষের দিকে তাকানোই পাপ, প্রণয় সে তো মহাপাপ। তার জন্য যে সাজা পরমাত্মা আমায় দেবেন তার জন্য আমি তৈরি।

"কিন্তু ভাবো দিকিন ভাই সায়েব, আমি কুলি-কামিন্। আমি কালো, কিন্তু প্রতিবেশিনীরা বলতো, আমার সর্বাঙ্গ নাকি চুম্বক, পুরুষকে টানে। টানতো নিশ্চয়ই—বিশেষ করে ছোঁড়ারা যখন হ্যাংলার মত আমার দিকে তাকাতো তখনই সেটা বুঝতে পারতুম। কিন্তু ওরা কি চায়, সেটা আমি আরও ভালো করেই বুঝতে পারতুম। আমাকে রক্ষিতা করে রাখবার সাহসও এদের ছিল না। যাক, এসব কথা আর খুলে বলার প্রয়োজন নেই।

"তখন যদি কেউ আমাকে রানীর সম্মান দেয় তখন সে প্রলোভন জয় করা কি সহজ পরীক্ষা? সায়েব আমাকে প্রথম দিন থেকেই ইংরেজী পড়াতে শুরু করলে, বললে, 'তোমাকে আমি আমার মনের মত করে গড়ে তুলবো।' ভালোবাসলে মানুষ কি না করতে পারে। কিংবা হয়তো পূর্বজন্মে আমি কোন পাঠশালা-মক্তবের আঙ্গিনা ঝাঁট দিয়ে সেবা করেছিলুম বলে এ জন্মে তারই পুণ্যের ফলে আমার লেখা-পড়া যে গতিতে এগিয়ে চললো সেটা দেখে স্বয়ং সায়েবই অবাক।"

এতক্ষণ পরে টুনি মেম আমার চোখের দিকে তাকালো। বোধ হয় দেখে নিল এসব সূক্ষ্ম জিনিস বোঝবার স্পর্শকাতরতা আমার কতখানি আছে? আফ্‌টার অল্‌, সে তো আমাকে জানে খানসামার ভাই খানসামা হিসেবে!

আমার চোখে কি দেখল কে জানে। আজও আমার কাছে রহস্য।

কিন্তু বলে যেতে লাগলো ঠিক সেই ভাবেই।

বললে, "বিদ্যাবুদ্ধি কতখানি হয়েছিল বলতে পারি নে, কিন্তু একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। আমরা, কুলি-মজুররা যে ভালোবাসি, একে অন্যের প্রতি আমাদের যে টান হয়, সেটাকে আমি নিন্দা করছি নে, কিন্তু সায়েবের পাশে বসে প্রেমের ভালো ভালো গান আর কবিতা পড়ে পড়ে আমি এক নূতন ভাবে তাকে ভালোবাসতে লাগলুম, আর সে যে আমাকে কত দিক দিয়ে কতখানি ভালোবাসে সেটাও দিনের পর দিন আমার কাছে পরিষ্কার হতে লাগলো।"

টুনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাকে থামাই। কিন্তু সে তখন আপনমনে যেন কথা বলছে। আবার কখনও বা সংবিতে ফিরে চোখ দুটি মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে লক্ষ্য করে আপন কথা বলে যায়।

"সায়েবের মত এরকম মানুষ আমি আর দেখিনি। সামান্য কয়েক ঘণ্টা দিনে কাজ করতো চা-গাছের সার নিয়ে, আর তার জন্য পেত কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। আর খরচ করতো বেহুঁশের মত। আমি কিছু বললে হেসে উত্তর দিত, যত খুশি যে যখন কামাতে পারে তখন যত খুশি খরচ করবে না কেন?

এই তো আমার স্বামীকে দশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল—"

খান বললে, 'আমি তখন উত্তেজনার চরমে। এইবারে জানতে পারবো, সেই টাকা নিয়ে টুনি মেমের স্বামী দেশে ফিরে গিয়ে খেতখামারের প্ল্যান করছিল কি না? সে টাকা পেয়েছিল কি? না ও'হারা ডবল ক্রসিং করছিল। রামভজন গুলি খেল কি করে, কেন, কার হাতে? কিন্তু হঠাৎ কেন জানি নে, টুনি মেম কথার মোড় ফিরিয়ে নিল। আমি শুধু লক্ষ্য করলুম, টুনির মুখ কেমন যেন ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল। পাছে সে সন্দেহ করে বসে, আমি কি মতলব নিয়ে এসেছি, তাই আমিও ঐ ব্যাপারটার উপর চাপ দিলুম না। মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এতখানি যখন বলেছে, পরে মোকা পেলে বাকিটুকু পাম্প করে নেব।

কারণ স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, টুনি মেম তো সাধারণ কুলি-কামিন্‌ নয়ই, সে অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে এবং সব চেয়ে বড় কথা, সে ভীষণ শক্ত মেয়ে। খুদাদাদ্‌ (বিধিদত্ত) চরিত্রবল তার নিশ্চয়ই ছিল, তার উপর এত বেশি তুফান-ঝড় এত বেশি বিচিত্র ভাগ্যবিপর্যয়ের ভিতর দিয়ে মার খেয়ে খেয়ে আজ এই স্যাঁতসেঁতে কুঁড়েঘরে এসে পৌঁছেছে যে এখন সে নির্ভয়—তার আর যাবে কি, তার আর হারাবার মত কি আছে যে সে তারই ভয়ে আপন গোপন কথা ফাঁস করবে? সে যদি নিজের থেকে কিছু না বলে তবে আমার চতুর্দশ পুরুষের সাধ্য নেই যে আঁকশি দিয়ে তার পেটের কথা বার করি। এই এক ফোঁটা দুব্‌লা পাতলা মেয়ে, পুলিশের এক ফুঁয়ে সে কহাঁ কহাঁ মুল্লুকে উড়ে যাবে, কিন্তু আমি এ-তত্ত্বটাও জানি যে সে ভাঙবে না, তার দার্ঢ্য অবিশ্বাস্য।

টুনি মেম বললে, "কিন্তু সায়েব ছিল পাগল। আমি ভেবে-চিন্তেই বলছি, সায়েব ছিল পাগল। দুটো জিনিসে যে তার পাগলামি কত বিকট রূপ ধারণ করতে পারতো সে যারা দেখেছে তারাই বলতে পারবে।"

তারই স্মরণে টুনি মেম যেন আঁতকে উঠলো। বললো, "বেশ ভালমানুষের মতো দিব্যি দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, আমাকে আদর-সোহাগ করার অন্ত নেই, সারা সকালটা হয়তো কাটলো ক্যাটালগ দেখে বিলেত থেকে আমার জন্য কি সব আনাবে বলে, তারপর হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেল একটানা মদ খাওয়া। চললো দিনের পর দিন। কাজকর্ম তো বন্ধ বটেই, নাওয়াখাওয়ারও খোঁজ নেই। একটুখানি সুব্যবস্থায় পেয়ে যদি বললুম, 'দুটি মুখে দাও', তবে সে কাতর স্বরে হয় বলতো, 'নেশা কেটে যাবে', নয় বলতো, 'মুখ দিয়ে কিছুই নামবে না।' ঘুম আর মদ, মদ আর ঘুম। আমার জাতভাইরা এদেশে এসে মদ খেতে শেখে। তাদের কেউ কেউ খায়ও প্রচুর। ও জিনিস আমার সম্পূর্ণ অজানা নয়, কিন্তু এরকম বেহদ মদ কাউকে আমি খেতে দেখিনি, শুনিনি। সে তখন মানুষ নয়, পশুও নয়, যেন কিছুই নয়।

"আমি তার পা জড়িয়ে ধরে বলেছি কতবার—তুমি যদি ঐ মদটা না খেতে তবে আমি নির্ভয়ে বলতে পারতুম, আমার মত সুখী পৃথিবীতে কেউ নেই। সুস্থ অবস্থায় থাকলেও সেও আমার পা জড়িয়ে ধরে প্রতিজ্ঞা করতো, আর কখনও খাবে না। কী লজ্জা! যাকে আমি মাথার মণি করে রেখেছি, সে দেবে হাত আমার পায়ে! অবশ্য এ কথাও ঠিক, আস্তে আস্তে তার এই মদের বান কমতির দিকে চললো। আমার আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু আমার কপালে এত সুখ সইবে কেন?"

খান দম নিয়ে বলল, 'দেখ মিতু, এরপর বহুকাল চা অঞ্চলে কাজ করার ফলে বিস্তর সায়েবকে প্রচুর কালো মেয়ে নিতে দেখেছি, এবং ছেড়ে যেতেও দেখেছি, কাচ্চা-বাচ্চা থাকলে তাদের মিশনারির কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা আমাকেও মাঝে মাঝে করতে হয়েছে,—এসব ওদের ডালভাত। কিন্তু টুনি মেম স্বতন্ত্র।'

আমি বললুম, 'সে আর তোকে বলতে হবে না। তার পর কি হল, তাই বল। বোলপুর আর বেশি দূর নয়।'

খান বললে, 'টুনির কাহিনীও শেষ হতে চললো। শোন্। টুনি বললে, "আমার দ্বিতীয় দুঃখ ছিল, সায়েবের অসম্ভব রাগ। ঐ মদেরই মত। বেশ দিন কাটছে, হাসিখুশির মানুষ সায়েব। হঠাৎ কোনও আরদালি বা বেয়ারা একটা কিছু বললে, আর সায়েব রেগে পাগলের মত বন্দুক হাতে নিয়ে তাকে করলে তাড়া। আমি কতবার যে ছুটে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে ধরে তাকে ঠেকিয়েছি তার হিসেব নেই। তবু বুঝতুম, যদি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় এ-রকম ধারা করতো। তা নয়। সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থায়। আমার নিজের কোনও ভয় ছিল না, কারণ আমার উপর সে একবার মাত্র রেগে গিয়ে পরে এমনই লজ্জা পেয়েছিল যে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না যে সে আমার উপর রাগবে না। কিন্তু চাকরবাকরকে নিয়ে হত মুশকিল। আমার স্বামীকে—"

খান থামলো। আমি তেড়ে বললুম, 'ঐ রাগের মাথায় খুন করেছিল নাকি?'

খান বললে, 'ভাই, এবারেও আমাকে প্রলোভন সম্বরণ করতে হল। ঠিক যখন আমার মনে হল, এবারে টুনি আসল কথায় আসবে ঠিক তখন সে আবার তার কথার মোড় ঘোরাল। আমি নাচার। আবার মনকে সান্ত্বনা দিলুম, এই নিয়ে দু'বার হল; তিনবারের বার নিশ্চয়ই বলবে। কিন্তু টুনি পাড়লো অন্য কথা। বললে, "ঐ রাগই আমার সর্বনাশ করলো।" তারপর আমাকে শুধালে আমি এদেশে অনেকদিন ধরে আছি কি না? আমি বললুম, না, ভাইয়ের সন্ধানে হালে এসেছি। তখন টুনি বললে, "তাহলে জানতে, যা সবাই জানে। ঐ নিয়ে মোকদ্দমা হয়েছিল।

"সায়েব ক্লাবে বড় একটা যেত না। একদিন ফিরে এল চিৎকার করতে করতে বদ্ধ মাতালের মত, অথচ মদ খায়নি। পাগলের মত শুধু চেঁচাচ্ছে, 'আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমাকে অপমান, এত বড় সাহস! আমি দেখাচ্ছি, আমি কি করতে পারি। আমি কাউকে ছাড়বো না। আমি দেখাচ্ছি আমি কি করতে পারি।' আমি চেষ্টা করেছিলুম সায়েবকে ঠাণ্ডা করতে কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারলুম না। টাকা নিয়ে মোটরে করে ফের বেরিয়ে গেল।

"ত্রিসংসারে আমার কেউ নেই। তাই নিয়ে আমি কখনও দুঃখ করিনি। আমার সায়েবকে পেয়েই আমি খুশি ছিলুম, আমি সুখী ছিলুম, কিন্তু রাত যখন ঘনিয়ে এল আর সায়েব ফিরল না তখন যে আমি কি করি, কার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলুম না। এর পূর্বে সায়েব আমাকে কখনও একা ফেলে যায়নি। একা থাকতে আমার ভয় করে না। কিন্তু সে রাত্রে কেমন যেন এক অজানা ভয় এসে আমাকে অসাড় করে দিল। সে রাত্রিটা আমার কি করে কেটেছিল আজ আর বলতে পারবো না।

"পরদিন সায়েব সন্ধ্যের দিকে ফিরে এল। আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলুম বাথরুমের দিকে। সে কিন্তু আমাকে দু-হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে বসালো উঁচু একটা চেয়ারের উপর। নিচে আমার পায়ের কাছে ছোট্ট একটি মোড়ার উপর বসে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে আমার দিকে। সায়েব এ ভাবে প্রায়ই আমাকে বসাতো, আর একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার বড় লজ্জা করতো। আমি কে, আমি কি?

"ভাই সায়েব, তুমি কিছু মনে করো না, আমাকে সব কথা বলতে দাও।

"ঠিক তার চারদিন পর পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল।

কুকুর-বেড়ালকেও মানুষ এরকম লাথি মেরে বাড়ি থেকে খেদায় না। আমি সায়েবের রক্ষিতা, আমার তো কোনও হক নেই। পুলিশ বাড়ি তালাবন্ধ করে সিল-মোহর মেরে চলে গেল। আমি এক বস্ত্রে বাঙলোর বারান্দা থেকে বাগানের বকুলতলায় এসে বসে রইলুম। সেখানে সায়েব আমার জন্য একটা সিমেন্টের বেদী বানিয়েছিল।

"যে চাকর নফর সেদিন সকালবেলা পর্যন্ত আমার পা চেটেছে, তারাই এখন আমাকে লাথিঝাঁটা মারলো। চাকরি গেছে যাক কিন্তু ঐ 'কুলি মেম'টাকে যতখানি পারি অত্যাচার-অপমান করে তার দাদ তুলে নিয়ে যাই।'

"আমি একটি কথাও বলিনি।

"মোকদ্দমাতে সব কথা বেরুল। সবাই জানে। সেই যেদিন সায়েব ক্লাবে গিয়েছিল সেদিন ক্লাবের কয়েকজন মুরুব্বী তাকে নাকি আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, অনেক চা-বাগিচার ইংরেজ ছোকরা দিশী মেয়ে রাখে কিন্তু আমার সায়েব আমাকে নিয়ে খোলাখুলি যে মাতামাতি করছে সেটা ইংরেজ সমাজের পক্ষে বড়ই কেলেঙ্কারির ব্যাপার।'

"আমি জানতুম, আমার সায়েব এ-সব চা-বাগিচার সায়েবদের ঘেন্না করতো। কতবার তাকে বলতে শুনেছি যে-সব নেটিভদের উপর সায়েবরা ডাণ্ডা মেরে বেড়ায়, তারা শিক্ষাদীক্ষার কোনও সুযোগই পায়নি, তাই তারা আজ মজুর, আর ঐ সায়েবরা আপন দেশে সব সুযোগ পেয়েও নিতান্ত অপদার্থ হতভাগা বলে কিছুই করে উঠতে পারেনি। আপন দেশে মজুরের কাজ করতে হলে যেটুকু ধাতুর প্রয়োজন সেটুকু এসব লক্ষ্মীছাড়াদের নেই বলে তারা এদেশে এসে নেটিভদের উপর দাবড়ে বেড়ায়।'

"তোমাকে বলেছি, ভাইয়া, আমার সায়েব অপমানিত বোধ করে রেগে একেবারে পাগলের মত হয়ে যেত। সে নাকি তখন যে কটা সায়েবকে হাতের কাছে পেয়েছে তাদের গালে ঠাস ঠাস করে চড় কষিয়েছে আর চিৎকার করে একই কথা বার বার বলেছে, 'আমি তোমাদের মত ভণ্ড ছোটলোক নই! আমি যাকে নিয়েছি তাকে আমি আমার স্ত্রীর সম্মান দিয়েই রেখেছি।' এখানে বলে রাখি, ভাই সায়েব, এরা সবাই জানতো কথাটা সত্যি। আব্রুগড়ের পাদ্রী সায়েব আমাদের বিয়ের মন্ত্র পড়তে নারাজ জেনে সায়েব ঠিক করেছিল, কলকাতায় আমাদের বিয়ে হবে।"

খান অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললে, 'তিনবারের বারও ঘোড়া জল খেল না। কারণ আমি তখন থাকতে না পেরে টুনিকে শুধালুম, তার স্বামী সম্বন্ধে যখন কোনও খবর নেই তখন তাদের বিয়ে হত কি করে? অবশ্য আমি ভাবখানা করেছিলুম যেটা ওটা অমনি একটা কথার কথা, যেন নিছক একাডেমিক প্রশ্ন। আজও বুঝতে পারিনি টুনি মেম আমাকে সন্দেহ করেছিল কিনা। টুনি শুধু বললে, সায়েব নাকি তাকে বলেছিল, সে কলকাতার উকিলদের কাছ থেকে তাদের সম্মতি আনিয়েছে, তবে সেটা নাকি খুব পরিষ্কার নয়। চুলোয় যাক্ গে সে-সব কথা, আমার ইচ্ছে শুধু জানবার তার স্বামীর নিখোঁজ হওয়া সম্বন্ধে সে কি জানে কিন্তু সেই যে ও'হারার বদমেজাজীর কথা বলার সময় সে তার স্বামীর কথার আভাস দিয়েছিল, এবারে সেটুকুও না।'

আমি বললুম, 'ঐ কথাটুকু আমিও তো জানতে চাই।'

খান বললে, 'টুনি জল খেয়ে নিয়ে খেই তুলে বললে, "সায়েবকে ক্লাববাড়ি থেকে জোর করে বের করে দেওয়া হয়। সেদিন বাড়ি ফিরে সায়েব আমাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিল—সে তো বলেছি—তারপর মোকদ্দমায় বেরুল, সায়েব পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরের একটা ছোট্ট পোস্টআপিসে গিয়ে যে ছ'জন সায়েব তার গায়ে হাত তুলেছিল তাদের নামে ছ'প্যাকেট বিষ-মাখানো চকলেট বিজ্ঞাপন হিসাবে পাঠায়। আচ্ছা, বল তো ভাইয়া, আমি যে বলেছিলুম সায়েবের মাথায় ছিট ছিল সেটা কি ভুল বলেছি? এটা কি ধরা পড়তো না? পাঁচটা পরিবারের লোক যদি একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়ে আর—সায়েবলোগের ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গে সিভিল সার্জনকে ডাকা হয় তবে কি মূল ধরা পড়বে না? পার্সেলের উপর যে পোস্ট অফিস থেকে সেগুলি এসেছিল তার খেই ধরে পুলিশ দু'দিনের ভিতর ধরে ফেলল যে সে-ই পার্সেলগুলো পাঠিয়েছিল। পোস্টমাস্টার আদালতে তাকে সনাক্ত করলে।"

খান মন্তব্য করে বললে, 'টুনি মেমের নরম আর শক্ত দুটো দিকই দেখতে পেলুম তার পরের কথাতে। বললে, "মানুষ মারা পাপ, আর ভাবো দিকিনি ঐ সব পরিবারের ছোট্ট ছোট্ট কাচ্চাবাচ্চাগুলো। আবার পাঠিয়েছিল একটা ছোট ডাকঘর থেকে। ধরা পড়তে কতক্ষণ। কিন্তু একথাও তোমাকে বলছি, ভাইয়া, আমি ঘুণাক্ষরেও সায়েবের এই দুর্বুদ্ধির কথা অনুমান করতে পারলে তার সামনে গলায় দড়ি দিতুম।

"আদালতে সায়েব একটি কথাও বলেনি।'

"শুধু শহরময় ছড়িয়ে পড়লো, সায়েব নাকি হাজতে যাবার সময় তার উকিলকে বলেছিল, সে তার 'স্ত্রী'র ন্যায্য সম্মান রাখবার চেষ্টা করেছে মাত্র। একথা শুনে শহরের লোক কি বলেছিল জানিনে, কিন্তু ঐ আমি আমার শেষ সম্মান পেলুম।'

"সেই সম্মানের উঁচু আসন থেকে আরম্ভ হল আমার পতন।'

"আমি তখন যাই কোথায়? দেশের দশের চোখে আমি সায়েবের রক্ষিতা। রক্ষিতাকে রক্ষা করনেওলা যখন আর কেউ নেই তখন সে যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নয়, মরার জায়গা একটা আছে। বেশ্যাপাড়া। কিংবা মরতে পারি ফাঁস দিয়ে। কিন্তু—"

টুনি মেম খানিকক্ষণ চুপ করে বললে, "কিন্তু তখন সায়েবের বাচ্চা আমার পেটে। তার প্রাণ নিই কি করে"?'

খান বললে, 'এর পর টুনি মেম কি করে ধাপের পর ধাপ নামতে নামতে সেই জাহান্নমের রদ্দি কুঁড়েঘরে এসে পৌঁছল তার বর্ণনা দেয়নি। তুই সেটা যে রকম খুশি কল্পনা করে নিতে পারিস।'

আমি বললুম, 'আমি স্যাডিস্ট নই। আমি বীভৎস রসে আনন্দ পাই নে। তারপর কি হল তুই বলে যা।'

খান বললে, 'টুনি সে রাত্রে আর কিছু বলেনি। তার ক্লান্তি দেখে আমিও আর খোঁচাখুঁচি করিনি।

ওদিকে আমার বসের সঙ্গে কথা ছিল, টুনিকে আবিষ্কার করতে পারলে যেন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানাই। অতি অনিচ্ছায় পরের দিন তাঁকে কোড টেলিগ্রাম করে জানালুম। গেলুম স্টেশনে তাঁকে রিসিভ করতে।

সন্ধ্যাবেলা তিনি নামলেন পুলিশের য়ুনিফর্ম পরে। আমি অবাক হয়ে বললুম, "স্যার করেছেন কি? টুনি বড় শক্ত মেয়ে। পুলিশকে সে একটি কথাও বলবে না। এমন কি আপনি চাকর নফরের বেশ পরলেও ধরে ফেলতে পারে।"

খেলুম উৎকট ধমক। বললেন, "রেখে দাও ওসব জ্যাঠামো। এই ঘোষালবান্দা ঘড়েল ঘড়েল খুনীদের পেটের নাড়ির 'কিরমি' বের করেছে একশ' সাতান্ন বার, আর আজ তুমি এলে শোনাতে, কি করে এক ফোঁটা ছুঁড়ির ঠোঁটের কথা বের করতে হয়। চল, তোমাকে হাতেকলমে দেখিয়ে দিচ্ছি।" আমি তাঁকে বহুৎ বোঝাবার চেষ্টা করলুম। খেলুম গণ্ডা তিনেক ধাঁতানি। কী-ই বা করি আমি? তিনি দুঁদে অফিসার। পাঠান আসামীকে তিনি খুন কবুল করাতে পরেছেন বলে তাঁর খুশ-নাম ছিল—পাঠানকে "বেইমান" বলে অপমান করলে সে রেগেমেগে সব-কিছু ফাঁস করে দেয়, এই অজানিত প্যাঁচটি ও জানতেন বলে আমি চুপ করে গেলুম।

গট্ গট্ করে মিলিটারি বুটে পাড়া সচকিত করে তিনি ঢুকলেন টুনি মেমের কুঁড়েঘরে। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর, মশাই, আরম্ভ হল দুঁদে পুলিশের যত রকম কায়দা-কেতা ফন্দিফিকির সন্ধি-সড়ুক তার নির্মম প্রয়োগ। দুনিয়ার ভয়-প্রলোভন, মৃদু ইঙ্গিত, কটু সম্ভাষণ সব-কুচ্ চালালেন ঘড়েল পুলিশ-কর্তা।

কিন্তু সেই যে পুলিশ দেখে টুনি মেম মুখ বন্ধ করেছিল সে মুখ আর সে খুললে না। ঝাড়া ছ'টি ঘণ্টা পুলিশ সায়েব তাঁর চেষ্টা দিয়ে ঘেমে নেয়ে বেরুলেন সেই কুঁড়েঘর থেকে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে। টুনি মেম একটা হ্যাঁ-না পর্যন্ত বলেনি।

আমার লজ্জাটুকু পর্যন্ত পুলিশকর্তা রাখলেন না। আমি তাঁকে অনুরোধ করেছিলুম তিনি যেন প্রকাশ না করেন যে আমার কাছ থেকে সব কিছু জানতে পেরে তিনি তার সন্ধান পেয়েছেন। আমি যে খানসামার ভাই সেই খানসামার ভাই-ই থেকে যাই। কিন্তু টুনি মেমের নীরবতার পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে পুলিশকর্তা ঘায়েল হয়ে গিয়ে সেকথাটাও প্রকাশ করে দিলেন। এমন কি তিনি আমাকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। যেতে হল—বস্ যে।

টুনি একবার আমার দিকে এক লহমার তরে তাকিয়েছিল।

কি বলবো, মিতুয়া, সে দৃষ্টিতে ঘৃণা তাচ্ছিল্য কি ছিল, কিছুই বলতে পারবো না। শুধু মনে হয়েছিল রহস্যময় সে দৃষ্টি।'

খান বললে, 'তার পরদিন প্রসবের সময় টুনি মেম এই দুঃখের সংসার ত্যাগ করলো।'

এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি?'

'হুঁ।'

আমি শুধালুম, 'তাহলে ঐ যে লোকটা খুন হয়েছিল তার কোন হিল্যে হল না?'

খান অনেকক্ষণ কোন উত্তরই দিলে না। শেষটায় বললে, 'সে যাক্ গে। এর পরও আমি বহু রহস্যের সমাধান করতে পরিনি—সে নিয়ে আমার শোক নেই। আমি শুধু এখনও টুনি মেমের শেষ চাউনির কথা ভাবি। সে চাউনিতে কি ছিল?

দুর্দশার চরমে বাচ্চা দুটো যখন ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে তখন আমি এসে তাদের চোখের জল মুছে দিলুম, টুনি তখন নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তাকে তার সর্ব দেহমন নিয়ে ধন্যবান জানিয়েছিল-—তিনি যে তার ডুবুডুবু ভাঙা নৌকোখানিকে পারে এনে ভিড়ালেন। আমাকে সে দেখেছিল তাঁরই দূতরূপে, তাঁরই ফিরিশতারূপে। তারপর হঠাৎ দেখে, আমি দেবদূত নই, আমি শয়তান। তার দুর্দিনে যেসব চাকর-বাকর তাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছিল আমি তাদের চেয়েও অধম। আমার মতলব ছিল তার বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে-দাইয়ে তাকে খুশী করে, তার জীবনের চরমধন তার "স্বামীকে" ঝোলাবার জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা।'

এর পর আর কোনও কথা হয়নি। গাড়ি বোলপুরে এসে থামল।

চেল্লাচেল্লিতে ম্যানেজার গোসাঁই স্বয়ং এসে খানকে ডবল খানা দিলে। গাড়ি যখন চলতে আরম্ভ করেছে তখন আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল টুনি মেমের বাচ্চা দুটোর কথা। চেঁচিয়ে খানকে শুধালাম, 'ওদের কি হল?' খান শুনতে পেল না। হাসিমুখে শুধু হাত নাড়লে।

[রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড]

বিদেশে

পিট্ বললে, 'একটি প্রেমের গল্প বলুন।'

আমি বললুম, 'ভারতবর্ষে সত্যকার প্রেমের গল্প আছে একটি, যার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের গল্প পাল্লা দিতে পারে না। সে কাহিনীতে মাটির মানুষ তার আপন বিরহবেদনার বর্ণনা শুনতে পায়, আবার ভগবদ প্রেমের জন্য ব্যাকুল জনও সেই কাহিনীতে আপন আকুলি-বিকুলির নিবিড়তম বর্ণনাও শুনতে পায়। কিন্তু রাধামাধবের সে কাহিনী বলবার মত ভাষা আমার নেই।'

ট্রুডে বললে, 'আমি একখানি ছবি দেখেছি, তাতে রাধা কৃষ্ণের গায়ে পিচকারি দিয়ে লাল রং মারছেন। চমৎকার ছবি!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমি পিট্‌কে বললুম, 'তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি আপনার প্রেমের কাহিনী বলুন না?'

পিট্ তো বেশ খানিকটা ঠা ঠা করে হাসল—দু পাত্রের পর মানুষ অল্পেতেই হাসে কাঁদে—তারপর বললে, 'হ্যারগট্ হ্যারগট্ (রামচন্দর!), এ যুগে কি আর সে রকম প্রেম কারও জীবনে আসে যা নিয়ে রসিয়ে গল্প জমানো যায়?'

ট্রুডে বললে, 'বলেই ফেল না ছাই তোমার সাদা-মাটা গল্পটা।'

গ্রেটে দেখি চুপ করে আছে।

পিট্ বললে, 'আমার প্রেমে-পড়ার কাহিনীতে মাত্র সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সেইটুকুই বুঝিয়ে বলি।

'আমি তখন সবে কলেজে ঢুকেছি। ফার্স্ট পিরিয়েডে ক্লাস থাকত না বলে আমি বাড়ি থেকে বেরতুম ন'টার সময়। একদিন ন'টার কয়েক মিনিট পরে কলেজের কাছেই একটি মেয়ে আমার পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল কলেজেরই ছাত্রী কিন্তু আসল কথা সেইটে নয়—আসল কথা হচ্ছে ওরকম সুন্দরী আমি আর কখনো দেখি নি।

'আমার বুকের রক্ত দুম্ করে জমে গেল; আমার হার্টটা যেন লাফ দিয়ে গলার কাছে পৌঁছে গেল। আমি অনেকক্ষণ সেই রাস্তার উপর ঠায় দাঁড়িয়ে রইলুম। সেদিন আর ক্লাস করা হল না; কলেজের বাগানে বসে বসে সমস্ত সকালটা কাটল।

'পরদিন ঠিক ঐ সময়ই মেয়েটি আমাকে রাস্তায় ক্রস্ করল। এবারে দুজনাতে চোখাচোখি হল—এক ঝলকের তরে। তারই ফলে আমাকে রাস্তার পাশের রেলিঙ ধরে সে নজরের ধাক্কা সামলাতে হল।

'তারপর রোজই ঐ সময় রাস্তায় দেখা হয়, এক লহমার চোখাচোখি হয়। বুঝলুম মেয়েটির সেকেন্ড পিরিয়েড ফ্রী তাই বোধ হয় বাড়ি কিংবা অন্য কোথাও যায়।

'আগেই বলেছি, মেয়েটি অপূর্ব সুন্দরী। রোজ সকালে নটার পর তার সেই এক ঝলকের তরে আমার দিকে তাকিয়ে দেখা যেন আমার গলায় এক পাত্র সোনালি মদ ঢেলে দিত আর বাদবাকি দিন আমার কাছে আসমানজমীন গোলাপী রঙে রাঙা বলে মনে হত।

'করে করে তিন মাস কাটল।'

পিট্ মদের গেলাসে মুখ ঠেকাতে আমি শুধালুম, 'পরিচয় করবার সুযোগ হল না, তিন মাসের ভিতর? কলেজ ডান্‌সে, কলেজ রেস্তোরাঁ—কোথাও?'

পিট্ বলল, 'ভয়, ভয়, ভয়। আমার মনে হত এরকম সুন্দরী কখনোই, কোন অবস্থাতেই আমার মত সাদা-মাটাকে ভালোবাসবে না, বাসতে পারে না, অসম্ভব, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব। বিশ্বাস করবেন না, পাছে আলাপচারি হয়ে যায় আর সে আমায় অবহেলা করে সেই ভয়ে কোনো নাচের মজলিসে দেখা হলে আমি তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বশ্বাসে সে স্থল পরিত্যাগ করতুম। তার চেয়ে পরিচয় না হওয়াটাই ঢের ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'টেগোরেরও গান আছে—

'সেই ভালো সেই ভালো আমারে না হয় না জানো
দূরে গিয়ে নয় দুঃখ দেবে কাছে কেন লাজে লাজানো?'

পিট্ বলল, 'আশ্চর্য, টেগোর তো অতি সুপুরুষ ছিলেন, তিনি এরকম মর্মান্তিক অনুভূতিটা পেলেন কোথায়?'

আমি শুধালুম, 'কিন্তু মেয়েটিও তো আপনার দিকে তাকাত!'

'ঠিক বলেছেন, কিন্তু আমার মনে হত মেয়েটি শুধু দেখতে চায়, এই বেশরম বাঁদরটা কত দিন ধরে এ তামাশা চালায়।'

আমি শুধালুম, 'তারপর?'

'তিন মাস হয়ে গিয়েছে। আমি প্রেমের পাখায় ভর করে চন্দ্রসূর্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রেমের এ পাখা দানা-পানি অর্থাৎ প্রতিদানের তোয়াক্কা করে না বলে এর কখনো ক্লান্তি হয় না; এ প্রেম আমার মনের বাগানে ফোটা জুঁই,—কারও অবহেলা-অনাদরের খরতাপে এ ফুল কখনো শুকোবে না।

'কলেজের বাগানে বসে একদিন চোখ বন্ধ করে আমি আমার প্রিয়াকে দেখছি, এমন সময় কাঁধে হাত পড়ল। চোখ মেলে দেখি আমার গ্রামের একটি পরিচিত ছেলে আর তার পাশে দাঁড়িয়ে আমার স্বপ্নের ফুল। পালাবার পথ ছিল না, পরিচয় হয়ে গেল।'

'তারপর?'

'আমার একদম মনে নেই। যেটুকু মনে আছে বলছি। হঠাৎ দেখি ছেলেটি উধাও, আর আমার স্বপ্ন তখনো মূর্তি ধরে পাশে বসে আছে। কিন্তু আসল কথায় ফিরে যাই। সেই যে ভয়ের কথা বলেছিলুম। প্রথম আলাপেই আমি যে তার সঙ্গে পরিচয় করতে ডরাই সে কথা কি জানি কি করে বেরিয়ে গেল। মেয়েটি অবাক হয়ে শুধাল, "কিসের ভয়?" আমি বললুম, "আপনি বড় বেশি সুন্দর।" তখন যা শুনলুম সে আমি তখনো বিশ্বাস করি নি এখনো করি নে—তার বিশ্বাস, আমি একটা আস্ত অ্যাডনিস্ এবং তাই আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে সে ভয় পেয়েছিল। শুনুন কথা!'

আমি বললুম, 'আপনারা দুজনাই দেখতে চমৎকার কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আলস কথা আছে এক ফার্সী প্রবাদে, "লায়লীরা বায়দ্ ব্ চশ্‌মে মজনুন দীদ!" লায়লীকে দেখতে হয় মজনুর চোখ দিয়ে।'

জাহাজ পাড়ে এসে ভিড়ল। সবাই নেমে পড়লুম। আবার দেখা হবে, বলে পিট্, গ্রেটে, ট্রুডে বিদায় নিল।

আপন মনে বাড়ির দিকে চলতে চলতে একটা কথা ভাবতে লাগলুম; এই যে ইয়োরোপীয়রা প্রাণ খুলে ফুর্তি করে, হৈ-হল্লা করে, আমরা এ-রকম ধারা আপন দেশে করতে পারি নে কেন? সায়েবসুবোদের লেখাতে পড়েছি, আমরা নাকি বড্ড সিরিয়স,

সংসারকে আমরা নাকি মায়াময় অনিত্য ঠাউরে নিয়ে মুখ গুমসো করে বসে আছি, ফুর্তি-ফার্তি করার দিকে আমাদের আদপেই মন নেই।

'জাতক' তো খ্রীস্টের বহু পূর্বে লেখা। তাতে যে হরেক রকম পালা পরবের বর্ণনা পাই তার থেকে তো মনে হয় না, আমরা সে যুগে বড্ড রাশভারী মেজাজ নিয়ে আত্মচিন্তা আর তত্ত্বালাপে দিন কাটাতুম। স্পষ্ট মনে পড়ছে কোন এক পরবের দিনে এক নাগর তার প্রিয়ার মনস্তুষ্টির জন্য রাজবাগানে ফুল চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে শূলের উপর প্রাণ দেয়। মরার সময় সে আক্ষেপ করেছিল, 'প্রিয়া, আমি যে মরছি তাতে আমার কোনো ক্ষোভ নেই, কিন্তু তুমি যে পরবের দিনে ফুল পরে যেতে পারলে না সে দুঃখ আমার মরার সময়ও রইল।'

। পঞ্চতন্ত্র প্রথম খণ্ড—রচনাবলী প্রথম খণ্ড।

মজলিশি

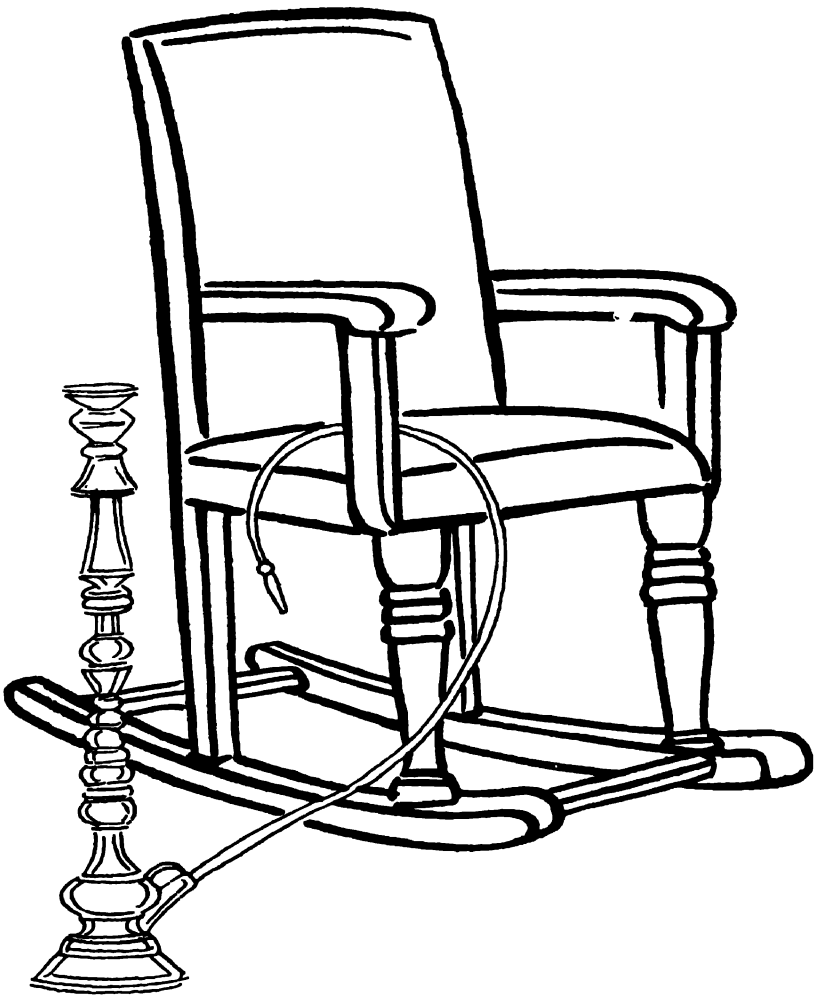

যখন তখন লোকে বলে, 'গল্প বলো।'

এই বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে। তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, 'ঘর লেপ্যা মুছ্যা, আতুড় ঘর বানাইয়া, মা ষষ্ঠীর গেছে বাচ্যা চাইলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না। নয় মাস দশ দিন সময় লাগে।' অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে।

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

এক ভালো কথক রাব্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুৎ) অনেকখানি হাঁটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে। চাষা-বৌ জানতো, রাব্বী গল্প করতে ভারি ওস্তাদ। পাদ্য অর্ঘ্য না দিয়েই আরম্ভ করেছে, 'গল্প বলুন, গল্প বলুন।' ইতিমধ্যে চাষা ভিন গাঁয়ের মেলা থেকে ফিরেছে একটা ছাগী কিনে। চাষা-বৌ সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো! এক ফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বৌ বেজার মুখে স্বামীকে শুধালো, 'এ কি ছাগী আনলে গো?' বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, 'ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে। দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে।' রাব্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। দানা-পানি না পেলে আমিই বা গল্প বলি কি করে?'

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুছিয়ে নিতে পারেন নি—ইহুদি পারে।

এ গল্পটা মনে রাখবেন। কাজে লাগবে। অন্তত চা-টা পাঁপড়ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইক্‌ল্ চালাতে আরম্ভ করে দেবেন। সে আবার কি? এসোসিয়েশন অফ আইডিয়াজ, অর্থাৎ এক চিন্তার খেই ধরে অন্য চিন্তা, সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, এই রকম করে করে মোকামে পৌঁছে যাবেন। এখনো বুঝতে পারলেন না? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই।

সেই যে বাঁদর ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমনি পেটুক—যা-কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পৌঁছে যাবেই যাবে মিষ্টি-সন্দেশে। তাকে একং দশং শিখতে দেওয়া হয়েছে। বলছে,

'একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—'

(মন্তব্য : 'লক্ষ' না বলে, বলে ফেলেছে 'লক্ষ্মী' এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে; তার পর বলছে,)

'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—'

(মন্তব্য : 'কার্তিক' মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে চলে গেল অগ্রহায়ণ পৌষে)

'অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাগ ছেলে-পিলে—'

(মন্তব্য : 'মাঘ'কে আমরা 'মাগ'ই উচ্চারণ করে থাকি। তার থেকে 'ছেলে-পিলে')

'পিলে, জ্বর, শর্দী, কাশী—'

(মন্তব্য : তার থেকে যাবতীয় তীর্থ!—)

'কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া, পুরী—'

'পুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, বোঁদে, খাজা, লেডিকিনি—'

ব্যাস! পুরী তো খাদ্য এবং ভালো খাদ্য। অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদবাকি উত্তম উত্তম আহারাদি! পৌঁছে গেল মোকামে!

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায়। ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদির কঞ্জুসী, স্কটম্যানের কঞ্জুসী তাবৎ কঞ্জুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয়। এটা হল কঞ্জুসীর সাইক্ল—অর্থাৎ দুনিয়ার যত রকম হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্লে ঢুকে যাবে। ঠিক সেই রকম আরও গণ্ডায় গণ্ডায় সাইক্ল আছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, স্ত্রীকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্ল এ দেশে গোপালভাঁড় সাইক্লই বলা হয়। অর্থাৎ চালাকির যে কোনো গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না। ইংরেজীতে এটাকে 'ব্ল্যাঙ্কেট' 'অমনিবাস' গল্পগুষ্টিও বলা চলে।

গোপালের অপজিট নাম্বার অর্থাৎ তাঁরই মত চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই আছে। প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কঙ্কে পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেলশাফ্‌ট্‌ফেইব নয় (সমাজে অচল)। সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে তাঁর গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশি, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন দুনিয়ার সর্বত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁর জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন্ ববে, পশ্চিম ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধ করি শ্রীযুক্ত সীতা শাস্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এ'র গল্প আছে), এবং সুইটজারল্যান্ডে পল্‌ডি।

পল্‌ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছর ধরে একখানা সুইস্ পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্‌ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই! কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি :—

বন্ধু : জানো পল্‌ডি, অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ ওটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্‌ডি : তার আগে মানুষ বাঁচতো কি করে?

কিংবা

পল্‌ডি : (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্‌ল্ দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌খানে?

টুরিস্ট : হাসপাতালে।

পল্‌ডি : সর্বনাশ! কি হয়েছিল আপনার?

কিংবা

বাড়িউলী : সে কি মিঃ পল্‌ডি? দশ টাকার মনিঅর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বক্‌শিশ!

পল্‌ডি : হেঁ, হেঁ, ঐ তো বোঝো না আর কিপ্টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে!

কিংবা

পল্‌ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শুধোচ্ছেন : ঘোড়াগুলো এরকম পাগল-পারা ছুটছে কেন?

বন্ধু : কি আশ্চর্য, পল্‌ডি, তাও জানো না! যেটা ফার্স্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে।

পল্‌ডি : তা হলে অন্যগুলো ছুটছে কেন?

এর থেকে আপনি রেসের গল্পের মাধ্যমে কুট্টি সাইক্লে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুট্টি রেসে গিয়ে বেট্ করেছে এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার এক বন্ধু—আরেক কুট্টি—ঠাট্টা করে বললে, 'কি ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য 'গোরা'—আমি বোঝার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া! আইলো সক্কলের পিছনে?'

কুট্টি দমবার পাত্র নয়। বললে, 'কন্ কি কত্তা! দ্যাখলেন না, যেন বাঘের বাচ্চা—বেবাকগুলিরে খ্যাদাইয়া লইয়া গেল!'

কুট্টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুব-পশ্চিম উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই একদা সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের খানদানী গাড়োয়ানগোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালরি। রিক্‌শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহুদেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মত witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক্-চতুর) নাগরিক আমি হিন্নী-দিন্নী কলোন-বুলোন কোথাও দেখি নি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিম বাঙলার 'সংস্করণ'টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বুড়ি দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে গিয়ে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে!' এর রাশান সংস্করণটি আরও একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে এক বুড়ি তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া। দোকানীকে অনুযোগ করাতে সে বললে, 'এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে?' এর ইংরিজী 'সংস্করণে' আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই—মোজার একটি টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার)। দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ারকেস্ আশা করেছিলেন।'

এবারে সর্বশেষ শুনুন কুট্টি সংস্করণ। সে একখানা ঝুরঝুরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিশের এসাইকে। বর্ষাকালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে—জল জল সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিশের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপ্পনী কাটতে পারছে না যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে, 'ভাড়া তো দ্যান্ কুল্লে পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না তো কি শরবৎ পড়বে?'

কুট্টি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরিতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। আমি জানি এদের উইট্ এদের রিপার্টি লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পুব বাঙলার কোনো দরদীজন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হবেন।

* * *

পাঠক ভাববেন না, আমি মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। আদপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইক্‌ল্

ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টরিজ বোঝাবার জন্য যে সব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা পাকা সব কিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কি, আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মাফিক জুতসই করে যদি তাগ-মাফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত হরণ করতে সমর্থ হবে পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমক্কা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট, গল্প লেখার আর্টেরই মত বিধিদত্ত প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য, সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্ষিতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে-জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ তিনি বৈঠক-মজলিশে ছিলেন রাশভারী প্রকৃতির। গল্প-বলার সময় কেউ কেউ অভিনয়ও যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কি ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধান বাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি, সেটি ভুলবেন না। বেমক্কা যখন তখন অনুরোধ করেছেন, কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন, রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, 'জানেন, মাস কয়েক পূর্বে ১১০ ডিগ্রির গরমে যখন ঘণ্টাতিনেক আইঢাই করার পর সবে চোখে অল্প একটু তন্দ্রা লেগে আসছে, এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাফ পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্রলোক। কড়া-রোদ্দুর রাস্তার ধুলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? 'আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে এখনও ঘণ্টাদুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করতে এলুম।' আমি অবধূতকে শুধোলুম, 'আপনি কি করলেন?' অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। আমি বেশি ঘ্যাঁটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়াঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনী ফেরার। এখনো ব্যাপারটার হিল্যে হয় নি।

ভালো করে গল্প বলতে হলে আরও মেলা জিনিস শিখতে হয়। এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারি নে। প্লট ভুলে যাই, কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কি দিয়ে শেষ করবো তার খেই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিল খিল করে হাসতে আরম্ভ করি, 'ঐযা, কি বলছিলুম' প্রতি দু' সেকেন্ড অন্তর অন্তর আসে, ইতিমধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই, শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়াপরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি মজলিশে ইতিপূর্বে, আমারই মুখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া ভাবে অন্তত পঞ্চাশ-বার শুনে, জোড়া-তাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছে। তদুপরি আমার জিভে ক্রনিক বাত, আমি তোৎলা এবং সামনের দুপাটিতে আটটি দাঁত নেই।

তাহলে শুধোবেন তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল করা স্টুডেন্ট ভালো প্রাইভেট ট্যুটর হয়। আমি গল্প বলার আর্টটা শেখার বিস্তর কস্ত করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর ট্যুটরি লাইনে আমিই সম্রাট।

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সব চেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায় (ওয়ার্ল্ড স্টরিটেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যান্ডারিন সদস্য যে গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সব চেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর সদস্য লুসাবুবু। ওদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এঁরা জানেন। কি হবে, চীনার কাঁচা ভাষায় পাকা দাড়িওয়ালা ঐ গল্প তিনশ তেষট্টি বারের মত শুনে। অতএব এঁরা একজোটে বসে পৃথিবীর সব কটি সুন্দর সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুট্টির সেই পানি পড়ার বদলে শরবৎ পড়ার গল্পটার নম্বর ১৯৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলার পরিস্থিতিটা কিরূপ।

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরু গুরু কর্মভার সমাধান করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্চুনা'ও বলতে পারেন, একদম দা'ঠাকুরের পাইস হোটেল মেলের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ির এক পয়সার তেলে মরা মাছি, কিংবা 'পানি না পড়ে শরবৎ পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন নম্বর '১৯৮'।

সঙ্গে সঙ্গেই হো হো অট্টহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাত হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে? শুনলে? কি রকম একখানা খাসগল্প ছাড়লে!' আরেকজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছে—তাকে মাসাজ করতে শুরু করেছেন আরেক সদস্য।

* * *

অতএব নিবেদন, এ সব গল্প শিখে আর লাভ কি? এদেশেও কালে বিশ্ব-গল্পকথক সম্প্রদায়ের ব্রাঞ্চ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছু বলার পূর্বেই কেউ না কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম। ৯৮ নম্বর বলতে না বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে কারও মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায়?

হ্যাঁ, অবশ্য যতদিন না ব্রাঞ্চ-আপিস কায়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটাফুটা গল্প দিয়ে ত্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুমশাই যে রকম বলতেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমন্তন্ন বাড়িতে চপ কাটলেট না আসা পর্যন্ত লুচি দিয়ে ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

[ভবঘুরে ও অন্যান্য—রচনাবলী সপ্তম খণ্ড]

হাসির অ-আ, ক-খ

হাসির অ-আ, ক-খ।

হাসির 'চুটকিলা' (উইট্, হিউমার এনেকডোট) নিয়ে যে-সব সঙ্কলন বেরোয়, সেগুলো বেশিরভাগ আপনার আমার মত সাধারণ জনই করে থাকে। অবশ্য এদের নির্মাতারা, অর্থাৎ যারা সব উইট্ বা রসিকতা প্রথম পাঁচজনকে হাসিয়ে কিংবা একজনকে চটিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে নির্মাণ করেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ওয়াইল্ডের মত বিখ্যাত সাহিত্যিক, কিংবা হুইল্লারের মত চিত্রকর নন। আবার এ কথাও অতি সত্য যে, বেশিরভাগ চুটকিলাই অতি সাধারণ জনই করে থাকে—সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, এমন কি সমাজেও তাঁরা বিখ্যাত নন। পাড়ার চায়ের দোকানে যে-লোক রসিয়ে গল্প বলে, কারও কথার উত্তরে হাসির জবাব দিয়ে আর পাঁচজনকে হাসিয়ে মারে, সে-লোকটি দোকানের বাইরে হয়তো কোনও কিছুতেই সার্থক হয়নি—হয়তো বা পাড়ার মুরুব্বী তাকে 'বিশ্ব-বকাটে' পদবী দিয়ে বসে আছেন, কারণ চায়ের দোকান থেকে ছেলের মারফত থু গৃহিণী তার কয়েকটি রসিকতা তাঁর কানে এসে পৌঁছেছে, এবং হয়তো বা তাঁরই মত দু-একটি মুরুব্বীকে নিয়েই।

অথচ পৃথিবীর অধিকাংশ চুটকিলা নির্মাণ করেছে এরাই। লোকমুখে ঘুরে ফিরে এ-দেশ ও-দেশ হয়ে হয়ে বিশ্বময় এরা ছড়িয়ে পড়ে। বরঞ্চ ওরই মত যে লোকসঙ্গীত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, তাদেরও নির্মাতার সন্ধান কোনও কোনও স্থলে পাওয়া যায়, কিন্তু এদের বৃহৎ অংশের মূল অনুসন্ধান কেউ করে না, করে কোনও লাভও নেই।

লোকসঙ্গীত, রূপকথার মত এই সব হাসির চুটকিলার সৃষ্টিকর্তা প্রধানত জনগণ। অবশ্য গুণী, জ্ঞানী, রসিক সাহিত্যিকরাও এতে আপন আপন মৃদুহাস্য, অট্টাহাস্য, বিদ্রূপব্যঙ্গ মিশিয়ে দিয়েছেন।

তা ছাড়া এমন সব ঘটনাও ঘটে, যা দেখে বা শুনে মনে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। যারা ঘটনাটা দেখলো বা শুনলো, তাদের কারও একজনের সামান্যতম রসবোধ থাকলে এবং সে ঘটনাটি 'ব্রডকাস্ট' করলেই হল। যেমন আইনস্টাইনের গৃহিণী ছিলেন অতিশয় সরলা নারী।[১] কী-এক পরব উপলক্ষে, স্বামী অসুস্থ বলে, তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে একা গেছেন আমেরিকার বিশাল এক ল্যাবরেটরিতে। সেখানে দৈত্য-দানবের মত ভীষণদর্শন বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি। বিমূঢ়ের মত এটা-সেটা দেখতে দেখতে একজন কর্তাব্যক্তিকে তিনি শুধোলেন, 'এগুলো—এগুলো দিয়ে কি হয়?' কর্তাব্যক্তি বিগলিত হয়ে সুমধুর মৃদুহাস্য হেসে মুরুব্বীর সুরে বললেন, 'কেন ম্যাডাম, এই সব যন্ত্রপাতি দিয়েই তো আপনার স্বনামধন্য স্বামীর থিয়োরি সব সপ্রমাণ করা হয়।' ম্যাডাম তো 'দশ হাত বরফপানিমে'। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'কিন্তু—কিন্তু আমার স্বামী তো এসব টোকেন পুরনো খামের উল্টো দিকে।'

এ গল্প বানানোর ভিতর কারও কোনও কেরদানি নেই।

এই রকম দুনিয়ার যত রকমের হাস্যরসের উপাদান থাকতে পারে, তারই একটি

১ এঁর সরল হৃদয় সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও আমাদের ছেলেবেলায় কিছু কিছু শুনিয়েছেন। বারান্তরে সে-কথা হবে।

সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন জর্মনির এক উত্তম সাহিত্যিক। পূর্বেই বলেছি, সাধারণত এরকম সঙ্কলন করে থাকেন আপনার আমার মত সাধারণ জন, তাই সঙ্কলনগুলো অসাধারণ হয় না। এটা অবশ্য একটা paradox. পূর্বে যখন বলেছি, পৃথিবীর বেশির ভাগ চুটকিলাই নির্মাণ করে সাধারণ জন, তখন তার সঙ্কলন করবে সাধারণ জন—এ তো বাঙলা কথা। কিন্তু এইখানেই প্যারাডক্স্। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে।' এক ইরানী কবিও বলেছেন, 'যে-শুক্তি মুক্তার জন্ম দিয়েছে আপন প্রাণরস দিয়ে, সে-শুক্তিকে তো মুক্তার মূল্য বিচারের সময় ডাকা হয় না—ডাকা হয় জহুরীকে।' কিংবা বলতে পারি, নেপোলিয়নের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনী যে তাঁর জননীই লিখবেন, এমন কোনও কথা নয়।

বর্তমান পুস্তকের নাম, আ বে ৎসে ডেস লাখেনসা',—হাসির অ-আ, ক-খ (এক্স ওয়াই জেড—যদি কখনও বেরোয়, তবে 'দেশে'র পাঠককে জানাব।) লেখকের নাম জিগিসমুন্ট ফন্ রাডেকি। ল্যাট্ভিয়ার রাজধানী রিগা শহরে এঁর জন্ম ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে। পড়াশুনা করেন সেন্ট পিটার্সবুর্গে, পরে এঞ্জিনীয়ারিং পাস করে জর্মনিতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়টা কাটান তুর্কিস্থানে এঞ্জিনীয়ার রূপেই। সাহিত্য-রস কিন্তু বরাবর ছিল। ওদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিনে আসার পর তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে অভিনেতা চিত্রকর এবং সাহিত্যিকরূপে। উত্তম ইংরেজী জানেন। জি. কে. চেস্টারটনের ইনি পরম ভক্ত এবং হিলের বেলকের উৎকৃষ্ট জর্মন অনুবাদ তিনি করেছেন—যদিও জর্মনিতে অনুবাদকরূপে তাঁর সর্বোত্তম খ্যাতি রুশ ঔপন্যাসিক গগলের বই জর্মনে তর্জমা করার ফলে।

এঁর জীবনীকার বলেন, রাডেকির বীণায় প্রচুর কোমল এবং অতিকোমল। তার প্রতিটি ধ্বনিতে তত্ত্ব-দার্শনিকের ক্ষীণ মধুর স্মিতহাস্য।

জর্মন, ফরাসী, রুশ, ইংরিজী তথা ইয়োরোপীয় ক্লাসিক্স্ নখাগ্রদর্পণে এবং বহু দেশ ভ্রমণ করেছেন বলে বহু বৎসর ধরে সঞ্চিত এঁর সঙ্কলন হাসির 'অ-আ, ক-খ' সত্যিই যেন হাস্যরসের কনসার্ট। ব্যালাকণ্ডাল থেকে আরম্ভ করে ডুগডুগি পিয়ানো কোনও যন্ত্রই বাদ যায়নি।

পাঠক হয়তো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। ভাবখানা, দু'একটা গল্পই শোনাও না। তার থেকেই তো এঁর পরিচয় পাওয়া যাবে। সেখানেই তো মুশকিল। আমার বিশ্বাস গোটা সঙ্কলনটি আপনি যদি পড়েন, তবে আপনি খুশী হবেন, যে-কোনও লোক খুশী হবে। কিন্তু আমি যেগুলো বাছাই করে দেব, সেগুলো আপনার পছন্দ না-ও হতে পারে। আপনার সঙ্কলন আমার পছন্দ না-ও হতে পারে। সঙ্কলনের সঙ্কলন বিপদসঙ্কুল। তবু চেষ্টা দিতে ক্ষতি নেই এবং গুণীরা যখন 'অরুন্ধতী ন্যায়ের' অর্থাৎ 'চেনা জিনিস থেকে অচেনা জিনিসে' যাবে বলে উপদেশ দিয়েছেন তখন আপনার আমার পরিচিত শার্লক হোমস্ দিয়েই বিসমিল্লা করি :

মরুভূমিতে শার্লক হোমস্ (অবশ্য আমার জানামতে হোমস্ কখনও কোনও মরুভূমিতে যাননি—বর্তমান লেখক)। ১৯১৭ সালের হেমন্তকাল। কয়েক মাস ধরে এক ইংরেজ রেজিমেন্ট প্যালেস্টাইনের দুরন্ত গরমে মরুভূমিতে থানা গেড়েছে। মদ্যাদি তো প্রায় নেই-ই, জলও কম, আর খাবার দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেই এক কর্নড বীফ! শেষটায় এমন হল যে, শব্দটা শুনলেই জোয়ানদের বমি আসে।

এলেন এক সন্ধ্যায় এক নূতন অফিসার। রান্নাঘরে ঢুকে তদারক তদন্ত করছেন, যাকে বলে ইন্সপেকশন—শুঁকলেন, চাখলেন এবং সর্বশেষে অতিশয় বিজ্ঞের মত অভিমত প্রকাশ করে বললেন, 'হুম...আজ ডিনারে তা হলে কর্নড্ বীফ!'

জোয়ানদের সবাই চুপ—কেউ একটি রা-ও কাড়লে না। ছুঁচ পড়লেও শোনা যায়। শেষটায় এক কোণ থেকে কোন্ এক কক্‌নির ব্যঙ্গের গলা শোনা গেল, 'আ-মরি! ওয়াটসন!'

একটু সূক্ষ্ম রসিকতা। এ যেন 'এ কথা বলার জন্যে তো ভূতের দরকার হয় না হুজুর।' আস্ত না হলেও ওয়াটসন যে একটি হাফ-গবেট ছিলেন, সেটা হোমস্‌পিয়াসীদের জানা। এটি প্রধানত তাঁদের জন্যই। আসছে বারে নিবেদন করব হরেকরকম্বা। পূর্বোক্ত আইনস্টাইন-গৃহিণীর গল্পটি রাডেকির সঙ্কলন থেকেই নেওয়া।

[টুনি মেম—রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড]

রসিকতা

হাসতে হয়, না হেসে উপায় নেই। এমন কি যারা 'হাতুড়ি আর কাস্তে'র নিচে বসে আছে, তারাও হাসে। তবে প্রাণখুলে নয়, কিংবা 'পাবে' বসে বেপরোয়া গাল-গল্প গুল-গ্যাস ছাড়বার মাঝে মাঝে নয়। সন্তর্পণে টাপে-টোপে। এই কিছুদিন পূর্বেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে একটি রসের গল্প মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে এই হেথা বাঙলা দেশে পৌঁছেছে—অবশ্য একে বাঁচিয়ে, ওকে এড়িয়ে।

এক কম্যুনিস্ট আরেক কম্যুনিস্টকে সোল্লাসে খবর দিলে, 'জানিস ভাই, "প্রাভদা" কাগজ সব চেয়ে সেরা পলিটিকাল রসিকতার জন্য একটা প্রাইজ দেবে কাগজে ঘোষণা করেছে।'

দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট : (অধিকতর সোল্লাসে) 'পয়লা প্রাইজ কত কমরেড?'

প্রথম কম্যুনিস্ট : 'কুড়ি বচ্ছর সাইবেরিয়া নির্বাসন।'

'নির্বাসন' না 'উইন্টার স্পোর্টস্ অ্যান্ড হলিডে' আমার সঠিক মনে নেই। তবে নিখরচায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর থেকে অবশ্য পাঠক মনে করতে পারেন, রুশ-চীনে বুঝি মানুষ মুখ বন্ধ করে আছে। যেমন হিটলার আমলে জর্মনিতে একটি রসিকতা বেশ প্রসার লাভ করেছিল। এক জর্মন আরেক জর্মনকে শুধোলে, 'তুই নাকি ভাই, ডেন্‌টিস্‌ট্রি পড়া ছেড়ে দিয়েছিস? কেন?'

'কি আর হবে? দাঁতের চিকিৎসা করবো কি করে? কেউ যে মুখ খুলতে আদৌ রাজি হয় না।'

তা নয়। লোকে মুখ খোলে। কারণ যে কর্তাব্যক্তিরা রুশ-চীনের ফুটন্ত জলের কাৎলির উপরে বসে আছেন তাঁরাও জানেন, মাঝে মাঝে ঢাকনাটা একটু ফাঁক না করে দিলে তাঁদেরও উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তবে এঁরা মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছেন, কোন্ ধরনের রসিকতা একটুখানি বরদাস্ত করে নিতে হয়, আর কোন্ ধরনের রসিকতা 'হারাম' বিধান দিয়ে সাইবেরিয়া ব্যবস্থা করতে হয়—চীন দেশে, শুনেছি, নেফা অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, গুলি খেয়ে মরবে, নয় শীতে জমে গিয়ে।

সবচেয়ে বরদাস্ত করা হয়, বাসস্থানের অভাব, আহারাদির অনটন, বাধ্য হয়ে অর্ধদিগম্বর বেশ ধারণ সম্বন্ধে। কারণ চোখের সামনে এগুলো এমনই জাজ্বল্যমান, সবাই কিছুটা মনের ভার নামাক—একটা নূতন অক্টোবর রেভলুশন অদ্যকার কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নাও হতে পারে। এবং বাসস্থান-আহারাদির অনটন সম্বন্ধে পোলান্ড-রুমানিয়ার কাষ্ঠ-রসিকেরা বলে, 'সোশালিস্ট রাজ্যের বর্তমান ক্ষণস্থায়ী অভাব-অনটন ভবিষ্যতেব চিরস্থায়ী অভাব-অনটনের পথে পথে বিজয়স্তম্ভ।'

ভবিষ্যতে কি রকম হবে তাই নিয়ে বলা হয়, আরও তিনটি ফাইভ ইয়ার প্ল্যান চিন্ময় থেকে মৃন্ময় রূপ ধারণ করার পর এমনই সুদিন আসবে যে, সক্কলের আপন আপন সলুন মোটরগাড়ি, এমন কি আপন আপন হেলিকপ্টার থাকবে। সেই সময় মস্কোর উপরে শূন্যমার্গে আপন হেলিকপ্টারে দুই কমরেডের দেখা। একজন আরেকজনকে শুধালে, 'কোথায় চললি কমরেড?'

'তুই যদি আমার পিছু না নিস তবে বলছি। অতি গোপনীয় সূত্রে খবর পেয়েছি, কৃষ্ণসাগরের পারে ওডেসার রেশন শপে আড়াই আউন্স মাখন পাওয়া যেতে পারে। সেখানে যাচ্ছি।'

এ তো হল ভবিষ্যতের কথা। আর বর্তমান দিনে?

হঠাৎ বাড়ি ফিরে কমরেড দেখেন তাঁর স্ত্রী উপপতির সাথে রসকেলিতে মত্ত। হুঙ্কার দিয়ে স্বামী বললে, 'এই বুঝি প্রেম করার সময়। ওদিকে যে রেশন শপে এক ঘণ্টা ধরে নেবু বিক্রি হচ্ছে।'

সত্যই তো। প্রেম তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, কিন্তু নেবু কিছু আর নিত্যি-নিত্যি মেলে না।

এই মর্মে আরেকটি চুটকিলা আছে।

গৃহবণ্টন বিভাগের কর্তা বললেন, 'কি বললেন কমরেড, আপনার স্ত্রীর ফ্ল্যাটখানা পছন্দ হচ্ছে না? তা আর এমন কি? আমার উপদেশ নিন। স্ত্রী বদন করুন। ঢের কম হাঙ্গামায় পাবেন। ফ্ল্যাট পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা!'

কিংবা বাড়ি বাবদে—

ক্লাস টিচার শুধোলেন, 'লেলিনের যে ছবিখানা দিলুম সেটি কোথায় টাঙিয়েছো?'

'আজ্ঞে কোথাও না।'

'কেন?'

'আজ্ঞে চার দেয়াল ঘেঁষে চারটি পরিবার বাস করে। আমরা থাকি মধ্যিখানে। আমাদের তো দেয়াল নেই।'

কিংবা ধরুন—এটা নাকি চীন দেশের—মন্ত্রী মশায় বেতারে বক্তৃতা দিচ্ছেন, '১৯৬০-এ আমরা আগের চেয়ে ১১০ গুণ বিজলি বাড়াতে পেরেছি। ১৯৬১-তে ৬০ গুণ। এ বছরে দু'শ গুণ—দাঁড়ান, কি হল? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে, কমরেড স্টুডিয়ো অ্যাসিস্টান্ট, একটি মোমবাতি নিয়ে আসো দিকিনি।'

তবে কোনও কোনও বাবদে বর্তমানে যে অবস্থা অনেকখানি ভালো সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ গল্পটাও হলদে, না লাল জানি নে। এক কমরেড রিপোর্ট লিখছেন, 'পূর্বের চেয়ে এখন অবস্থা অনেক ভালো। আগে গৃহিণী যখন জামা-কাপড় কাচতেন, আমাকে তখন সাহায্য করতে হত। এখন সে দুর্দিন গেছে। এখন স্ত্রী বলেন, তোমার পাতলুন আর শর্টটা দাও তো। আর তুমি বিছানায় গিয়ে চাদর ঢাকা দাও।'

[এই স্ত্রীকে সাহায্য করার ব্যাপার নিয়ে মার্কিন মুল্লুকে অন্য পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। গত যুদ্ধে বহু মার্কিন কাপড় কাচা, বাসন মাজা, রান্না করা, আরও পাঁচটা কাজ শিখে এসে বাড়িতে যখন দেখে স্ত্রী আনাড়ির মত কাজ করছে তখন তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে বাতলে দেয় কিভাবে কর্মগুলো সুষ্ঠুরূপে করতে হয়। ফলে বউরা তাদের খাটিয়ে মারতে শুরু করে। সেটা পরের পুরুষেও সংক্রামিত হয়। হালে যখন মার্কিন দেশে প্রস্তাব পাড়া হয়, ওভার প্রোডাকশন হচ্ছে বলে সক্কলকে হপ্তায় দু'দিন করে ছুটি দেওয়া হবে, তখন বিস্তর মার্কিন তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছে, 'বউরা খাটিয়ে মারবে। তার চেয়ে আপিসের কলম পেষা ঢের ভালো।' এরা বলে, নিগ্রো-দাসত্ব উঠে যাওয়ার পর এটা নাকি এক নূতন ধবল-দাসত্ব।]

কম্যুনিস্ট দেশে নাকি রাজনৈতিক কারণের গ্রেফতারি হয় অতি ভোরবেলা—এদেশে যে রকম ১৯৪৭-এর আগে হত, আর হিটলারী জর্মনিতে তো নিজে দেখেছি। এ ব্যাপার নিয়ে নাকি ঠাট্টা-মস্করা খুব বেশি বরদাস্ত করা হয় না।

ভোর পাঁচটার সময় বাড়িওলা ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে ঘণ্টা বাজিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলছে, 'কমরেড, অযথা ভয় পাবেন না। আমি শুধু বলতে এসেছি, বাড়িতে আগুন লেগেছে মাত্র।' কিংবা,

'কি বললে? ইভান ইভানোভিচ মারা গিয়েছে? কই, আমি তো তার গ্রেফতার হওয়ার খবরটা পর্যন্ত পাইনি।' কিংবা খবরের কাগজে শোকসংবাদ কলমে পিতামাতা প্রকাশ করলেন, 'আমাদের স্বর্গস্থ সৃষ্টিকর্তা তাঁর অসীম করুণায় আমাদের কন্যাকে কল্যাণতর লোকে নিয়ে গিয়েছেন।' আপন সোশালিস্ট দেশকে অপমান করার জন্য দুজনাই পরের দিন গ্রেফতার হন।

সবচেয়ে বিপজ্জনক হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক রসিকতাই সবচেয়ে বেশি আদর পায়। পূর্বেই প্রাভদা প্রসঙ্গে তার একটি নিবেদন করেছি। এগুলো সচরাচর তৈরি হয় কতকগুলো বিশেষ বিষয়বস্তু নিয়ে; পার্টির দুর্নীতি, বড়কর্তাদের বিলাসব্যসন (হালে চীনও খ্রুশ্চফকে গালাগালি দিয়েছে এই বলে যে, তাঁর দুখানা আপন মোটরগাড়ি আছে), ধর্মবিশ্বাসে অসহিষ্ণুতা, স্বাধীনচিন্তার নিপীড়ন, চাষাদের বেগার খাটানো, উপরাষ্ট্রধর্ষণ ইত্যাদি। যারা কম্যুনিজমে বিশ্বাস করে না কিংবা কম্যুনিস্টদের কার্যকলাপে দুর্নীতি সহ্য করতে পারে না, তাদের আত্মাভিমান রক্ষা করার একমাত্র উপায় ব্যঙ্গবিদ্রূপের শরণ নেওয়া।

এক কয়েদী আরেক কয়েদীকে, 'তোর কি মাথা খারাপ? আদালতে কেন স্বীকার করলি, কালোবাজারে চিনি কিনেছিস?'

দ্বিতীয় কয়েদী, 'কি করি বল। সরকার পক্ষের উকিলই যে আমাকে চিনি বেচেছিল।' কিংবা শিক্ষামন্ত্রীকে 'পাগল' বলার অপরাধে একজনের কুড়ি বছরের জেল হয়। পাঁচ বছর হয় সরকারী কর্মচারীকে অপমান করার জন্য, বাকি পনেরো বছর রাষ্ট্রের গোপন খবর প্রকাশ করে দেবার জন্য। কিংবা,

রুশ কর্মী কথায় কথায় বললে, 'আমি সব চেয়ে ভালোবাসি কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বারদের জন্যে কাজ করতে।' সরকারী কর্মচারী প্রশংসা করে বললেন, 'বড় আনন্দের কথা। তা আপনি কি কাজ করেন?' 'আজ্ঞে, আমি গোর খুঁড়ি।'

কিংবা,

চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে প্রাপ্ত :—

খবরের কাগজের হকাররা রাস্তায় চেঁচাচ্ছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে, রুশেরা চাঁদে পৌঁছে গেছে।' রাস্তায় একাধিক উল্লসিত কণ্ঠস্বর, 'সবাই? সবাই?'

কিংবা,

ট্রামগাড়ির কন্ডাক্টর : 'এগিয়ে চলুন, মশাইরা, এগিয়ে চলুন।'

'আমরা ''মশাইর'' নই, আমরা কমরেড।'

'মস্করা ছাড়ুন। কমরেডরা ট্রামগাড়ি চড়েন না, তাঁরা চড়েন আপন আপন মোটরগাড়ি।'

কিন্তু পূর্বেই বলেছি, এসব রসিকতা করতে হয় টাপেটোপে নিতান্ত আপনজনের মাঝখানে। নইলে :—

তিন বৃদ্ধ পার্কের বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে। তার মধ্যে দুজন ওয়াক্ থুঃ ওয়াক্ থুঃ বলে থুথু ফেলছে। তৃতীয়জন বললে, 'দয়া করে কোনও প্রকারের রাজনৈতিক আলোচনা আরম্ভ করবেন না। নইলে আমাকে গোয়েন্দা বিভাগে খবর দিতে হবে।'

ইংরিজীতে বলে, 'নীরবতা হিরণ্ময়।'

ইহুদিরা আসলে প্রাচ্যদেশীয় বলে বহু শত বৎসর ইয়োরোপে থাকার পরও তাদের রসিকতায় বিদ্রূপ ও তিক্ততা থাকে অনেক বেশি। ওদিকে হিটলার যে রকম একদা ইহুদিকের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিলেন, তার দশ ভাগের এক ভাগ না হলেও কম্যুনিস্ট দেশে ইহুদি নির্যাতন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে—অনেক দিন। ইহুদিরাও বাধ্য হয়ে বাইরের দিক দিয়ে যত দূর সম্ভব গা বাঁচিয়ে চলে ও 'অন্তরে অন্তরে অন্তরীণ' হয়ে থাকে।

'চতুর পোলিশ ইহুদি মূর্খ পোলিশ ইহুদির সঙ্গে কিভাবে আলাপ করে?'

'নিউ ইয়র্ক থেকে, টেলিফোনযোগে।' কিংবা,

সরকারী কর্মচারী ইহুদিকে বললেন, 'কমরেড লেভি, আপনি ফর্মে লিখেছেন, আপনার কোনও আত্মীয় বিদেশে বসবাস করে না। ওদিকে আমরা খবর পেয়েছি, আপনার আপন ভাই ইসরায়েলে বাস করে।'

'তা তো করেই। সে আছে আপন দেশে, আমিই তো আছি বিদেশে।'

সবচেয়ে কম শুনতে পাওয়া যায় 'বড় পাণ্ডাদের' নিয়ে রসিকতা। তার কারণ উৎপীড়িত জনেরাও অতি অল্প দিনের অভিজ্ঞতায়ও বুঝে যায়, যাকে নিয়ে রসিকতা করা হয়, গৌণভাবে তারই বিজ্ঞাপন করা হয় মাত্র। এ কথাটা উভয় পক্ষই বিলক্ষণ জানে বলে হিটলারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ গ্যোরিঙ তাঁর সম্বন্ধে বাজারে রসিকতা চালু হওয়া মাত্রই সেটি সংগ্রহ করে রাখতেন এবং এ ধরনের রসিকতা নিজেই যে শুধু বলে বেড়াতেন তাই নয়, অন্য সকলকেও নয়া নয়া রসিকতা বানাবার জন্য টুইয়ে দিতে কসুর করতেন না।

রুশ দেশও ব্যত্যয় নয়। তাই খ্রুশ্চফ্ ইত্যাদিকে নিয়ে রসিকতার বাড়া-বাড়ি নেই তবু দু-একটি যা শুনতে পাওয়া যায় সেগুলো উপাদেয়। তারই একটি দিয়ে শেষ করি।

শীর্ষ সম্মেলন শেষ করে নিকিতা খ্রুশ্চফ্ ও পুলিশকর্তা (আসলে গোয়েন্দা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ) সাঘারফ্ একসঙ্গে উড়োজাহাজে করে দেশে ফিরছেন। সাখারফ্ বললেন, 'কেনেডির অলঙ্কারগুলো লক্ষ্য করেছিলি? একদম সাচ্চা।'

নিকিতা বললেন, "না কই, দে তো।[১]

এই তো সেদিন একটা রসিকতা পড়ছিলুম।

পূর্ব জর্মনির এক কুকুর পশ্চিম জর্মনির মামাতো ভাইয়ের বাড়িতে কয়েকটা দিন কাটাতে এসেছে। অতিথিবৎসল দাদা শুধোলে, 'তোকে কি খেতে দেবো বল দিকিনি, ভাইয়া! গুটিকয়েক সরেস, তাজা খাজা হাড্ডি চিবুবি?'

পূর্ব জর্মনির কুকুর বললে, 'না, থ্যাঙ্কু! আমাদের ওদিকে মেলাই খাবার রয়েছে! তোদের চেয়ে অনেক ভালো!'

দাদা শুধোলে, 'তবে, তবে কিছু একটা চাটবি? জল? শরবৎ? দুধ? মদ?'

'না, ওসবে আমার দরকার নেই। বাড়িতে ঢের রয়েছে।'

'তাহলে চল্, আমার ঘরে একটু জিরিয়ে নে।'

'কিচ্ছু দরকার নেই। আমার দিব্য সুন্দর ঘর রয়েছে বাড়িতে।'

বড়দা তখন চটে গিয়েছে। হুঙ্কার ছেড়ে বললে, 'তবে এখানে মরতে এসেছিস কেন? তোর যখন সবই রয়েছে?'

'ও দাদা! এখানে যে প্রাণভরে ঘেউ ঘেউ করা যায়। আমি ঘেউ ঘেউ করব।'

* * *

ঐ হল লৌহ-যবনিকার ওপারের দেশের আইন। সেখানে আপন আপত্তি-অজুহাত চেঁচিয়ে জানানো বারণ। সেখানে আইনকানুন সর্বনেশে। আমরা এদিকে যত খুশি ঘেউ ঘেউ করতে পারি—কিন্তু হাসতে যেন না ভুলি।

[টুনি মেম—রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড]

১ 'ভেন্টভখের' (ৎসুরিষ) ১৮৫২ সংখ্যার সাহায্যে লেখা।

কুট্টি

পুব-বাঙলার বিস্তর নরনারী চিরকালই কলকাতায় ছিলেন; কিন্তু এবারে কলকাতায় এসে দেখি তাঁদের সংখ্যা একলপতে শুয়া গাছের ডগায় উঠে গেছে। কিছুদিন পূর্বেও পুব-বাঙলার উপভাষা শুধু দক্ষিণ কলকাতাতেই শোনা যেত, এখন দেখি তামাম কলকাতাময় বাঙাল ভাষার (আমি কোনো কটু অর্থে শব্দটি ব্যবহার করছি নে—শব্দটি সংক্ষিপ্ত এবং মধুর) ছয়লাপ।

বাঙাল ভাষা মিষ্ট এবং তার এমন সব গুণ আছে যার পুরো ফায়দা এখানে কোনো লেখক ওঠাননি। পুব-বাঙলার লেখকেরা ভাবেন 'করে' শব্দ 'কইরা' এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গিতে বা 'ইডিয়ামে'—অবশ্য সেগুলো ভেবে-চিন্তে ব্যবহার করতে হয়, যাতে করে সে ইডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পুব বাঙলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারে। যেমন মনে করুন, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে যদি গরীব মার খায় তবে সিলেট অঞ্চলে বলে, 'হাতীর লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেনে? অর্থাৎ 'হাতীর সঙ্গে পাতি খেলতে গিয়েছিলেন কেন?' কিন্তু পাতি খেলা যে polo খেলা সেকথা বাঙলা দেশের কম লোকই জানেন; (চলন্তিকা এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে শব্দটি নেই) কাজেই এ ইডিয়ম ব্যবহার করলে রস ওতরাবে না। আবার—

দুষ্টু লোকের মিষ্ট কথা
দিঘল ঘোমটা নারী
পানার তলার শীতল জল
তিন-ই মন্দকারী।

'কামুফ্লাজ' বোঝবার উত্তম ইডিয়ম। পুব, পশ্চিম কোনো বাঙলার লোকের বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না।

ইডিয়ম, প্রবাদ, নিজস্ব শব্দ ছাড়া বাঙাল সভ্যতায় আরেকটি মহদ্‌গুণ আছে এবং এ গুণটি ঢাকা শহরের 'কুট্টি' সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ—যদিও তার রস তাবৎ পুব-বাঙলা এবং পশ্চিম বাঙলারও কেউ কেউ চেখেছেন। কুট্টির রসপটুতা বা wit সম্পূর্ণ শহুরে বা 'নাগরিক'—এস্থলে আমি নাগরিক শব্দটি প্রাচীন সংস্কৃত অর্থে ব্যবহার করলুম অর্থাৎ চটুল, শৌখিন, হয়ত বা কিঞ্চিৎ ডেকাডেন্ট।

কলকাতা, লখ্‌নউ, দিল্লী, আগ্রা বহু শহরে আমি বহু বৎসর কাটিয়েছি এবং স্বীকার করি লখ্‌নউ, দিল্লীতে (ভারত বিভাগের পূর্বে) গাড়োয়ান সম্প্রদায় বেশ সুরসিক কিন্তু এদের সবাইকে হার মানতে হয় ঢাকার কুট্টির কাছে। তার উইট, তার রিপার্টি (মুখে মুখে উত্তর দিয়ে বিপক্ষকে বাক্‌শূন্য করা, ফার্সী এবং উর্দুতে যাকে বলে 'হাজির জবাব' এমনই তীক্ষ্ণ এবং ক্ষুরস্য ধারার ন্যায় নির্মম যে আমার সলা যদি নেন তবে বলবো, কুট্টির সঙ্গে ফস্ করে মস্করা না করতে যাওয়াই বিবেচকের কর্ম। খুলে কই।

প্রথম তাহলে একটি সর্বজনপরিচিত রসিকতা দিয়েই আরম্ভ করি। শাস্ত্রও বলেন, অরুন্ধতী-ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়, অর্থাৎ পাঠকের চেনা জিনিস থেকে ধীরে ধীরে অচেনা জিনিসে গেলেই পাঠক অনায়াসে নূতন বস্তুটি চিনতে পারে—ইংরেজীতে এই পন্থাকেই 'ফ্রম স্কুল রুম টু দি ওয়ার্লড ওয়াইড' বলে।

আমি কুট্টি ভাষা বুঝি কিন্তু বলতে পারি নে। তাই পশ্চিম বাঙলার ভাষাতেই নিবেদন করি।

যাত্রী : রমনা যেতে কত নেবে?

কুট্টি গাড়োয়ান : এমনিতে দেড় টাকা; কিন্তু কর্তার জন্য এক টাকাতেই হবে।

যাত্রী : বলো কি হে? ছ আনায় হবে না?

গাড়োয়ান : আস্তে কন কর্তা, ঘোড়ায় শুনলে হাসবে।

এর যুৎসই উত্তর আমি এখনো খুঁজে পাইনি।

মোটেই ভাববেন না যে এ জাতীয় রসিকতা মান্ধাতার আমলে একসঙ্গে নির্মিত হয়েছিল এবং আজও কুট্টিরা সেগুলো ভাঙিয়ে খাচ্ছে।

'ঘোড়ার হাসি'র মত কতকগুলো গল্প অবশ্য কালাতীত, অজরামর। কিন্তু কুট্টিরা হামেশাই চেষ্টা করে নূতন নূতন পরিবেশে নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করার।

প্রথম যখন ঢাকাতে ঘোড়দৌড় চালু হল তখন একটি কুট্টি গিয়ে যে ঘোড়াটাকে ব্যাক করল সেটা এল সর্বশেষে। বাবু বললেন, 'এ কি ঘোড়াকে ব্যাক করলে হে? সক্কলের শেষে এল?'

কুট্টি হেসে বললে, 'কন কি কর্তা, দেখলেন না, ঘোড়া তো নয়, বাঘের বাচ্চা; বেবাকগুলোকে খেদিয়ে নিয়ে গেল।'

আমি যদি নীতি-কবি ঈসপ কিংবা সাদী হতুম, তবে নিশ্চয়ই এর থেকে 'মরাল' ড্র করে বলতুম, একেই বলে 'রিয়েল, হেলথি অপটিমিজ্‌ম্‌'।

কিংবা আরেকটি গল্প নিন, এটা একেবারে নিতান্ত এ যুগের।

পাকিস্তান হওয়ার পর বিদেশীয়দের পাল্লায় পড়ে ঢাকার লোকও মর্নিং সুট, ডিনার জ্যাকেট পরতে শিখেছেন। হাঙ্গামা বাঁচাবার জন্য এক ভদ্রলোক গেছেন একটি কালো লঙ কোট বা প্রিন্স কোট বানাতে। ভদ্রলোকের রঙ মিশ্‌ কালো, তদুপরি তিনি হাড়কিপ্‌টে। কালো বনাত দেখলেন, সার্জ দেখলেন, আশপাশ দেখলেন, কোনো কাপড়ই তার পছন্দ হয় না। যে-কুট্টি কোচম্যান সঙ্গে ছিল সে শেষটায় বিরক্ত হয়ে ভদ্রলোককে সদুপদেশ দিল, 'কর্তা, আপনি কালো কোটের জন্য খামকা পয়সা খরচ করতে যাবেন কেন? খোলা গায়ে বুকের ওপর ছ'টা বোতাম লাগিয়ে নিন। খাসা প্রিন্সকোট হয়ে যাবে।'

তিন বৎসর পূর্বেও কলকাতায় মেলা অনুসন্ধান না করে বাখরখানী (বাকিরখানী) রুটি পাওয়া যেত না; আজ এই আমির আলী এভিন্যুতেই অন্তত আধা ডজন দোকানের সাইন বোর্ডে 'বাখরখানী' লেখা রয়েছে। তাই বিবেচনা করি, কুট্টির সব গল্পই ক্রমে ক্রমে বাখরখানীর মতই পশ্চিম বাঙলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং তার নূতনত্বে মুগ্ধ হয়ে কোনো কৃতী লেখক সেগুলোকে আপন লেখাতে মিলিয়ে নিয়ে সাহিত্যের পর্যায়ে তুলে দেবেন— পরশুরাম যেরকম পশ্চিম বাঙলার নানা হালকা রসিকতা ব্যবহার করে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, হুতোম একদা কলকাতার নিতান্ত কক্‌নিকে সাহিত্যের সিংহাসনে বসাতে সমর্থ হয়েছিলেন।

এটা হল জমার দিকে কিন্তু খরচের দিকে একটা বড় লোকসান আমার কাছে ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে আসছে, নিবেদন করি।

ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকেরই স্বভাব অপরিচিত, অর্ধপরিচিত কিংবা বিদেশীর সামনে এমন ভাষা ব্যবহার না করা, যে ভাষা অন্যপক্ষ বা বিদেশী অনায়াসে বুঝতে না পারে।

তাই খাস কলকাতার শিক্ষিত লোক পুব-বাঙালীর সঙ্গে কথা বলবার সময় খাস কলকাত্তাই শব্দ, মোটামুটি ভাবে যেগুলোকে ঘরোয়া অথবা 'স্ল্যাঙ' বলা যেতে পারে, ব্যবহার করেন না। তাই এন্তার, ইলাহি, বেলেল্লা-বেহেড, দোগেড়ের চ্যাং এসব শব্দ এবং বাক্য কলকাতার ভদ্রলোক পুব-বাঙালীর সামনে সচরাচর ব্যবহার করেন না। অবশ্য বক্তা যদি সুরসিক হন এবং আসরে মাত্র একটি কিংবা দুটি ভিন্ন প্রদেশের লোক থাকেন তবে তিনি অনেক সময় আপন অজানাতেই অনেক ঝাঁঝ-ওলা ঘরোয়া শব্দ ব্যবহার করে ফেলেন।

ত্রিশ বৎসর পূর্বে শ্যামবাজারের ভদ্র আড্ডাতে পুব-বাঙালীর সংখ্যা থাকতো অতিশয় নগণ্য। তাই শ্যামবাজারী গল্প ছোটালে এমন সব ঘরোয়া শব্দ, বাক্য, প্রবাদ ব্যবহার করতেন এবং নয়া নয়া বাক্যভঙ্গি বানাতেন যে রসিকজন মাত্র বাহবা শাবাশ না বলে থাকতে পারত না।

আজ পুব-বাঙলার বহু লোক কলকাতায় আসর সরগরম করে বসেছেন বলে খাঁটি কলকাত্তাই আপন ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন হয়ে গিয়েছেন এবং ঘরোয়া শব্দবিন্যাস ব্যবহার ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো এরা বাড়িতে এসব শব্দ এখনো ব্যবহার করেন; কিন্তু আড্ডা তো বাড়ির লোকের সঙ্গে জমজমাট হয় না—আড্ডা জমে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে এবং সেই আড্ডাতে পুব-বাঙলার সদস্য সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে বলে খাস কলকাত্তাই আপন ঘরোয়া শব্দগুলি ব্যবহার না করে করে ক্রমেই এগুলো ভুলে যাচ্ছেন। কোথায় না এসব শব্দ আস্তে আস্তে ভদ্রভাষায় স্থান পেয়ে শেষটায় অভিধানে উঠবে, উল্টে এগুলো কলকাতা থেকে অন্তর্ধান হয়ে যাবে।

আরেক শ্রেণীর খানদানী কলকাত্তাই চমৎকার বাঙলা বলতেন। এঁরা ছেলেবেলায় সায়েবী ইস্কুলে পড়েছিলেন বলে বাঙলা জানতেন অত্যন্ত কম এবং বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ ছিল ভাশুর-ভাদ্রবধূর। তাই এঁরা বলতেন ঠাকুরমা দিদিমার কাছে শেখা বাঙলা এবং সে বাঙলা যে কত মধুর এবং ঝলমলে ছিল তা শুধু তাঁরাই বলতে পারবেন যাঁরা সে বাঙলা শুনেছেন। ক্রীক রোর মন্মথ দত্ত ছিলেন সোনার বেনে, আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু, কলকাতার অতি খানদানী ঘরে জন্ম। মন্মথদা যে বাঙলা বলতেন তার ওপর বাঙলা সাহিত্যের বা পুব-বাঙলার কথ্য ভাষার কোন ছাপ কখনো পড়েনি। তিনি যখনই কথা বলতে আরম্ভ করতেন আমি মুগ্ধ হয়ে শুনতাম আর মন্মথদা উৎসাহ পেয়ে রেকাবের পর রেকাব চড়ে চড়ে একদম আসমানে উঠে যেতেন। কেউ অন্যমনস্ক হলে বলতেন, 'ও পরাণ, ঘুমুলে?' মন্মথদার কাছ থেকে এ অধম এন্তার বাঙলা শব্দ শিখেছে।

আরেকজনকে অনেক বাঙালী চেনেন। এঁর নাম গাঙ্গুলী মশাই—ইনি ছিলেন শান্তিনিকেতন অতিথিশালার ম্যানেজার। ইনি পিরিলি ঘরের ছেলে এবং গল্প বলার অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা এঁর ছিল। বহু-ভাষাবিদ পণ্ডিত হরিনাথ দে, সুসাহিত্যিক সুরেশ সমাজপতি ছিলেন এঁর বাল্যবন্ধু এবং শুনেছি এঁরা এঁর গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতেন।

কলের একদিক দিয়ে গরু ঢোকানো হচ্ছে, অন্যদিক দিয়ে জলতরঙ্গের মতো ঢেউয়ে ঢেউয়ে মিলিটারি বুট বেরিয়ে আসছে, টারালাপ টারালাপ করে, গাঙ্গুলী মশাই আর অন্যান্য ক্যাডেটরা বসে আছেন পা লম্বা করে, আর জুতোগুলো ফটাফট ফটাফট করে ফিট হয়ে যাচ্ছে—এ গল্প শুনে শান্তিনিকেতনের কোন্ ছেলে হেসে কুটিকুটি হয়নি?

হায়, এ শ্রেণীর লোক এখন আর দেখতে পাই নে। তবু এখনো আমার শেষ ভরসা শ্যামবাজারের ওপর।

শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়ের উপাদেয় 'স্মৃতিমন্থন' আমার স্মৃতির ভিজে গামছাটি নিংড়ে বেশ কয়েক ফোঁটা চোখের জল বের করলো।

আমিও এ বাবদে একদা একটি প্রবন্ধ লিখি। আশ্চর্য! ছাপাও হয়েছিল। এবং চাটগাঁয়ে প্রকাশিত একটি মাসিকে সেটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। আবার কোনো পুস্তকে সেটি স্থান পেয়েছে কিনা, মনে পড়ছে না।

আমার মনে হয়, কুট্টি সম্প্রদায় (ঢাকার গাড়োয়ান শ্রেণী) একদা মোগল সৈন্যবাহিনীর ঘোড়-সওয়ার সেপাই ছিল। যার ফলে তারা 'কুঠি' বাড়ির ব্যারাকে থাকতো। এবং তাই পরে এদের নাম কুট্টি হয়। পরবর্তীকালে ইংরেজবাহিনীতে এদের স্থান হয়নি বলে কিংবা মোগলের নেমকহারামী করতে চায়নি বলে এরা ঘোড়ার গাড়ি চালাতে শুরু করে। কারণ ঘোড়া তাদের নিজেরই ছিল, এবং ঘোড়ার খবরদারী করতে তারা জানতো। বরোদা রাজ্যেও আমি শুনতে পাই, সেখানকার কোচম্যানরাও নাকি পূর্বে মারাঠা সৈন্যবাহিনীতে ক্যাভালরির সঙ্গে কাজ করতো। ঢাকার কুট্টিরা এককালে উর্দু বলতো, পরে ঢাকা শহরের চলতি বাঙলার সঙ্গে মিশে 'কুট্টি ভাষা'র সৃষ্টি হয়। তাই তারা এখনো 'লেকিন, মগর' এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকে। তবে পুব-বাঙলার মৌলবী সায়েবরাও 'লেকিন, মগর' ছাড়া আরও বহু বহু আরবী ফার্সী শব্দ 'বাঙাল' কথা বলার সময় ব্যবহার করে থাকেন—ঐ অঞ্চলে হিন্দু পণ্ডিতরাও যে রকম গলায় ঘা হলে বলেন, 'কণ্ঠদেশে ক্ষত অইছে'। তাই শুনে মেডিকেল কলেজের গোরা ডাক্তার নাকি বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'চীন দেশ হ্যায়, জাপান ভী দেশ হ্যায়, ফির কণ্ঠদেশ কোন্ দেশ হ্যায়?'

বছর পঞ্চাশেক পূর্বে ঢাকার এই 'কুট্টি' ভাষা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বেরোয়। তাতে ঐ আমলের কুট্টি ভাষার উদাহরণ স্বরূপ বলা হয়।

'করিম বক্‌স্‌কা মা নে আর রহিম বক্‌স্‌কা জরুনে এয়সা লাগিস্, লাগিস্তা কে এ ভি উস্‌কা বালমে ধরি টানিস্তা, উ ভী ইস্‌কা বাল্‌মে ধরি টানিস্তা।'

অর্থাৎ 'করিম বখ্‌শের মা আর রহিম বখ্‌শের স্ত্রীতে এমন লাগাই লাগলো (কোঁদল) যে এ ওর চুল ধরে টানে, ও এর চুল ধরে টানে।'

(কুট্টি ভাষার উদ্ধৃতিতে কোন ভুল থাকলে যেন কুট্টিভাষাভাষী আমার উপর বিরক্ত না হন—কারণ কুট্টি গাড়োয়ান ছাড়া অন্য অনেক লোক এ-ভাষা বলে থাকেন এবং বাঙলা সাহিত্যের চর্চাতে আনন্দ পান। পূর্বে এঁরা সকলেই উর্দু সাহিত্যপ্রেমিক ছিলেন। শুনতে পাই এঁদের কেউ কেউ নাকি ভাষা আন্দোলনে বাঙলা ভাষার পক্ষ নেন।)

* * *

'হাওয়া গাড়ি চইলা গেল গো
(আমার) বন্ধু আইল না।'

গানটি পুব-বাঙলায় রূপকার্থেও নেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ যে হাসন রাজার—

মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমীন
কানেতে করিল পয়দা মুসলমানী দীন (ধর্ম)॥
নাকে পয়দা করিয়াছে খুশবয় বদ্‌বয় (সুগন্ধ, দুর্গন্ধ)
আমা হইতে সব উৎপত্তি হাসন রাজায় কয়॥

এ ছত্রগুলি ব্যবহার করেন, সেই হাসন রাজারই একটি গান আছে, 'হাওয়ার গাড়ি ধু ধা করে চলেছে (নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের হাওয়ায় যে গাড়ি চলে অর্থাৎ শরীর) তার ভিতর সায়েব সোয়ারি (পরমাত্মা, আল্লা) বসে আছেন। হাসন রাজা (অর্থাৎ ব্যষ্টি পুরুষ) সেই সায়েবকে সেলাম করতে (মর্মে মর্মে তাকে ভক্তিভরে অনুভব করাতে) তিনি হাসনকে আদর করে পাশে বসালেন।'

পুরো গানটি আমার স্মরণে নেই; তবে শেষের দু'ছত্রে আছে—

'হাসন রাজা, নাচতে আছে, 'আল্লা আল্লা' ধরি।
পবনের গাড়ি চলতে আছে ধু ধু ধা ধা করি'॥

এখানে পবনের গাড়ি, হাওয়া গাড়ি, শ্রদ্ধেয় বসু মহাশয়েরও হাওয়া গাড়ি মোটামুটি একই। তাই অর্থ দাঁড়ায়, 'পবনের গাড়ি, অর্থাৎ 'আমার প্রাণবায়ু' চলে গেল, তবু আমার বন্ধু এল না। বলা বাহুল্য পুব-বাঙলার ভাটিয়ালী গীত রচয়িতা এবং পশ্চিম বাঙলার বাউল উভয়ই কিছুদিন আগে পর্যন্তও অত্যন্ত সজীব, প্রাণবন্ত স্রষ্টা ছিলেন বলে নূতন নূতন জিনিস আমদানি হলেও তাকে সিম্‌বল্‌, রূপক রূপে এলেগরি করে মরমিয়া (মিস্টিক) গান রচনা করতেন। যেমন রেলগাড়ির ঘণ্টা বেজেছে, (আসন্ন মৃত্যুর ধ্বনি বেজেছে), আমি যাত্রী ঘুমে অচৈতন্য (তমোগুণে আচ্ছন্ন) ইত্যাদি। বিজলি বাতি নিয়ে একটি গান আমার আবছা আবছা মনে পড়ছে। হাওয়া গাড়ি প্রবর্তিত হলে এ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ঐ 'মোতীফ' নিয়ে একাধিক গীত রচিত হয়।

* * *

প্রধানত রিকশার চাপে কুট্টি গাড়োয়ান সম্প্রদায় ঢাকার রাস্তা থেকে প্রায় অন্তর্ধান করেছে। কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত এরা নূতন নূতন অবস্থায় নূতন নূতন রসিকতা তৈরি করে গিয়েছে—অনেকেরই ভুল বিশ্বাস, এদের রসিকতার একটি প্রাচীন ভাণ্ডার ছিল এবং তারা শুধু সেগুলো ভাঙিয়েই খায়, আমি যে শেষ রসিকতাটি শুনেছি, সেটি ১৯৪৭-৪৮ সালে নির্মিত।

আমি ১৯৪৮ সালে ঢাকার এক আত্মীয়কে শুধোই, 'মুসলিম লীগ কী রকম রাজত্ব চালাচ্ছেন?'

তিনি বললেন, 'সে সম্বন্ধে একটি কুট্টি রসিকতা বাজারে চালু হয়েছে। অত্যন্ত ক্যারাক্‌টিরিসটিক্‌—অর্থাৎ লীগের ক্যারাক্‌টার প্রকাশ করে। যদিও গল্পটি একটু 'রিস্‌কে'—অর্থাৎ গলা খাঁকরি দিয়ে বলতে হয়।'

মুসলিম লীগ শাসনভার হাতে নিয়ে এক কুট্টি গাড়োয়ানকে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিলেন, সে যেন তার জাতভাইদের মধ্যে তাঁদের জন্য প্রচারকার্য বা প্রোপাগান্ডা করে। সে তাদের ডেকে বক্তৃতা আরম্ভ করলে, 'ভাই সকল, শোনো (আমি এস্থলে কুট্টি ভাষার পরিবর্তে 'সাধুই' ব্যবহার করছি—লেখক)। আমাদের রাষ্ট্র আমাদের মায়ের মত। মাকে যদি খাওয়াও পরাও তবে মায়ের দুধ তুমি-ই পাবে। খাজনটা ট্যাক্সোটা ঠিকমত দাও; মায়ের দুধ তুমিই পাবে। তখন এক ব্যাক্‌বেঞ্চার (হেক্‌লার) বলে উঠলো, 'কইছো ঠিকই, লেকিন বাবা হালারা যে খাইয়া ফুরাইয়া দিল।' অর্থাৎ মিনিস্টার, পলিটিশিয়ানের দলই সব লুটে নিচ্ছে।...মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ কারও প্রতিই আমাদের কোনো বৈরী ভাব নেই, তবে মনে হয়, গল্পটি বহু দেশ প্রদেশের শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে খাটে।

এই কুট্টি গাড়োয়ানদের সম্বন্ধে শেষ একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি।

পার্টিশনের পূর্বে ও পরে, কি হিন্দু কি মুসলমান সর্ব পিতামাতা নির্ভয়ে তাঁদের কন্যাদের কুট্টির গাড়িতে তুলে দিতেন। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক এরা ঠিক সময়ে মেয়েদের ফের ইস্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতো। হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগে গেলেও এবং শুনেছি, কোনো কোনো স্থানে দাঙ্গার ফলে বাপ-মা উধাও জানতে পেরে ভালো জায়গায় তাদের পৌঁছে দিয়েছে। কুট্টিরা এ জিম্মাদারিতে কখনো গাফিলি করেছে বলে শোনা যায়নি। এরা সত্যই শিভাল্‌রাস।

আর ঐ শিভাল্‌রাস কথাটা এসেছে ফরাসী 'শেভালিয়ের' থেকে। 'শেভাল' মানে ঘোড়া।

শেভালিয়ের অর্থাৎ ঘোড়সওয়ার। একদা খানদানী ফরাসীদের ছেলেরা এই ক্যাভালরি বা অশ্ববাহিনীর সদস্য ছিল। তাই বলছিলুম, কুট্টিরা আসলে মোগল বাহিনীর ঘোড়সওয়ার ছিল।

[বড়বাবু—রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড]

পল্‌ডি

আমাদের দেশে কালিদাস সম্বন্ধে যে-সব গল্প চলতি আছে, তার অনেকগুলোই তাঁর প্রথম যৌবনের হাবামি নিয়ে। উত্তর ভারতেও নিরেট হাবামির গল্প বানানো হলে সেগুলো সাধারণত শেখ চিল্লির ঘাড়ে চাপানো হয়। (এর উলটো দিকও আছে—চালাকির গল্প বলতে হলে আমরা সেটা গোপালভাঁড়ের কাঁধে চাপাই) এই করে করে কোনও কোনও দেশে অজ মূর্খামি অথবা ফন্দিবাজির গল্পগুলো কোনও এক বিশেষ কল্পনামূলক বা সত্যিকার চরিত্রের চতুর্দিকে জড়ো হয়।

জর্মনীতে নিরেট হাবামির গল্পগুলো জমেছে পল্‌ডি নামক মহাখানদানী, পয়সাওয়ালা এক হস্তীমূর্খের চতুর্দিকে। পল্‌ডির সবিশেষ পরিচয় দেবার দরকার নেই। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে লোকটি অষ্টপ্রহর ফিট-ফট্টিনাইন, দুনিয়ার তাবৎ লোকের সঙ্গে তার দহরম-মহরম এবং তার ব্রেন-বক্সে কিছু আছে কি-না সে সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অচেতন। গুণের মধ্যে দেখা যায়, পল্‌ডি অত্যন্ত সহৃদয় এবং খাঁটি খানদানী মনিষ্যির মত পাঁচজনকে আপ্যায়িত করবার জন্য তার চেষ্টা-ত্রুটির অন্ত নেই।

পল্‌ডির বাকি পরিচয় পাঠক নিচের লেখাগুলো থেকে পাবেন।

"সে কি পল্‌ডি, আমাকে এখনও চিনতে পারছিস নে? স্কুলে তোরই পাশে এক বেঞ্চিতে বসতুম যে!"

"মাফ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। স্কুলে আমার পাশে ও রকম লম্বা দাড়িওয়ালা কেউ বসত না।"

*

"সে কি পল্‌ডি, আপনি দাঁড়কাক পুষেছেন কেন?"

"সত্যি বলব? আমি হাতেনাতে দেখতে চাই, এই যে লোকে বলে দাঁড়কাক তিনশ' বছর বাঁচে কথাটা সত্যি কিনা।"

*

"হাঁ হাঁ, ঠিক বুঝেছি কাপ্তেন সায়েব। আপনার কম্পাস সব সময় উত্তর দিক দেখিয়ে দেয়। কিন্তু মনে করুন আপনি যদি আর কোনও দিকে যেতে চান, তাহলে কি করেন?"

*

অধ্যাপক—"এখন আপনাদের যে তারাগুলো দেখাব তাদের আলো পৃথিবীতে আসতে পাঁচ ঘণ্টা লাগে।"

পল্‌ডি (নেপথ্যে)—"আমি অতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না। আমরা আটটার সময় খানা খাই।"

*

"আমার রিটর্ন টিকিট চাই।"

"কোথাকার?"

"কি মুশকিল! এখানে ফেরবার।"

*

"এই যে পল্‌ডি, সুখবর শুনুন, আজ সকালে আমি ঠাকুরমা হলুম।"

"কি যে বলেন! আর এরই মধ্যে দিব্যি চলাফেরা করতে আরম্ভ করেছেন!"

*

পল্‌ডি—"ঐ যে দুর্গ দেখতে পাচ্ছেন, ঐখানে আমার জন্ম হয়। আপনি কোথায় জন্মেছিলেন?"

টুরিস্ট—"হাসপাতালে।"

পল্‌ডি—"কী ভয়ানক! কেন, আপনার কি হয়েছিল?

[অপ্রকাশিত রচনা—রচনাবলী একাদশ খণ্ড]

কাইরো

কাইরো যাওয়ার জন্য আলাদা করে কাঠখড় পোড়াবার প্রয়োজন হয় না। ইয়োরোপ যাবার সময় জাহাজ সুয়েজ বন্দরে থামে। সেখানে নেবে সোজা কাইরো চলে যাবেন। এদিকে আপনার জাহাজ অতি ধীরে মন্থরে সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে পোর্ট সইদের দিকে রওয়ানা হবে। খালের দুদিকে বালুর পাড় যাতে ভেঙে গিয়ে খালটাকে বন্ধ না করে দেয়, তার জন্য কড়া আইন, জাহাজ যেন গরুর গাড়ির গতিতে এগোয়। কাজেই জাহাজ সইদ বন্দর পৌঁছতে না পৌঁছতে আপনি কাইরোতে টুঁ মেরে ট্রেনে করে, সেই সইদ বন্দরেই পৌঁছে যাবেন। সেই জাহাজেই চেপে, সেই কেবিনেই শুয়ে ইয়োরোপ চলে যাবেন—ফালতো কোনো খরচা লাগবে না।

অবশ্য তাতে করে কাইরোর মত শহরের কিছুই দেখা হয় না—আর কাইরোতে দেখবার মত জিনিস আছে বিস্তর। পিরামিড দেখা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, এইটুকু বা সান্ত্বনা। জাহাজের অনেকেই আপনাকে বললেন, ঘণ্টা দশেকের জন্য কাইরোতে ওরকমধারা টুঁ মেরে বিশেষ কোন লভ্য নেই। আমারও সেই মত; কিন্তু তবু যে যেতে বলছি তার কারণ যদি আপনার পছন্দ হয়ে যায়, তবে হয়ত বিলেত থেকে ফেরার মুখে ফের কাইরোতে নেবে দু'চার সপ্তাহ কাটিয়ে আসতে পারেন। ইয়োরোপে তো দেখবেন কুল্লে এক ইয়োরোপীয় সভ্যতা (ফরাসী, জর্মন, ইংরেজ যত তফাৎই থাক না কেন, তবু তো তারা আপোসে একটা সভ্যতাই গড়ে তুলেছে), আর দেখেছেন ভারতীয় সভ্যতা—তার উপর যদি আরেক তৃতীয় সভ্যতার সঙ্গে মোকাবেলা হয়ে যায়, তবে তাতে নিশ্চয়ই বিস্তর লভ্য।

আমার লেগেছিল কাইরো দেখতে পাক্কা একটি বচ্ছর! অতদিন আপনি থাকবেন না সে আমি জানি। আপনার অতটা সময় লাগবে না—সে কথাও জানি। কারণ আমি কাটিয়েছিলুম প্রথম ছ'টি মাস শুধু আড্ডা মেরে মেরে—বাড়ির ছাতের উপর থেকে পিরামিড স্পষ্ট দেখা যায়, ট্রামে করে হুশ করে সেখানে যেতে কোনোই বাধা নেই, পূর্ণিমায় আবার ইস্পিশল সার্ভিস, তৎসত্ত্বেও ছ'টি মাস কেটে গেল এ-কাফে ও-কাফে করে করে, পিরামিড দেখার ফুরসত আর হয়ে ওঠে না। বন্ধুরা কেউ জিজ্ঞেস করলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলতুম, 'সবই ললাটঙ্ক লিখন। কলকাতায় দশ বছর কাটিয়ে 'গঙ্গাস্তান'' যখন হয়ে উঠেনি, তখন বাবা-পিরামিড দর্শন কি আমার কপালে আছে?' (আসল কারণটা চুপে চুপে বলি;—এক গাদা পাথর দেখায় যে কি তত্ত্ব তা আমি পিরামিড দেখার আগে এবং পরে কোনো অবস্থাতেই ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারি নি)।

সে কথা থাক; সভ্যতা, পিরামিড এ-সব জিনিস নিয়ে অন্য জায়গায় পাণ্ডিত্য ফলাব, 'বসুমতী'র পাঠকরা এতদিনে আমাকে বিলক্ষণ চিনে গিয়েছেন, আমার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শুনলে ঠা-ঠা করে হেসে উঠবেন। তাই সেই আড্ডাতেই ফিরে যাই।

আমি ভালোবাসি হেদো, হাতিবাগান, শ্যামবাজার। ও-সব জায়গায় তাজমহল নেই, পিরামিড নেই। তাতে আমার বিন্দুমাত্র খেদও নেই। আমি ভালোবাসি আমার পাড়ার চায়ের দোকানটি। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা হাজিরা দিই, পাড়ার পটলা, হাবুল আসে, সবাই মিলে বিড়ি ফুঁকে গুষ্ঠীসুখ অনুভব করি আর উজির-নাজির মারি। আমার যা কিছু জ্ঞান-গম্মি তা ঐ আড্ডারই ঝড়তি-পড়তি মাল কুড়িয়ে নিয়ে।

তাই যখন কপালের গর্দিশে কাইরোতে বাসা বাঁধতে হল, তখন আড্ডাভাবে তিনদিনেই আমার নাভিশ্বাস উপস্থিত হল। ছন্নের মত শহরময় ঘুরে বেড়াই আর পটলা-

হাবলুর বসন্ত রেস্টুরেন্টের জন্য সাহারার উষ্ণ নিশ্বাসের সঙ্গে আপন দীর্ঘ নিশ্বাস মেশাই। এমন সময় সদ্‌গুরুর কৃপায় একটা জিনিস লক্ষ্য করলুম—পাড়ার কফিখানাতে রোজই দেখতে পাই গোটা পাঁচেক লোক বসন্ত রেস্টুরেন্টরই মত চেঁচামেচি কাজিয়া-ঝগড়া করে আর এন্তার কফি খায়, বিস্তর সিগারেট পোড়ায়।

দিন তিনেক জিনিসটা লক্ষ্য করলুম, কখনো কফিখানায় বসে, কখনো ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। নূতন শহরের সব কিছুই গোড়ার দিকে সুর-রিয়ালিস্টিক ছবির মতো এলোপাতাড়ি ধরনের মনে হয়? অর্থ খাড়া হতে হতে কয়েকদিন কেটে যায়। যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম তখন আমেজ করলুম, আমাদের বসন্ত রেস্টুরেন্টের আড্ডা যখন গুরুচণ্ডাল সক্কলের জন্যই অবারিতদ্বার, তখন এরাই বা আমাকে ব্রাত্য করে রাখবে কেন? হিম্মৎ করে তাদের টেবিলের পাশে গিয়ে বসলুম আর করুণ নয়নে তাদের দিকে মাঝে মাঝে তাকালুম। শকুন্তলার হরিণও বুঝি ওরকমধারা তাকাতে পারত না।

দাওয়াই ধরলো। এক ছোকরা এসে অতিশয় বিনয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় নিল এবং জানালো তাদের আড্ডায় বিস্তর সীট ভেকেন্ট, আমি যদি ইত্যাদি। আমাকে তখন আর পায় কে? ভাঙা ফরাসী, টুটাফুটা আরবী, পিজ্‌ন ইংরিজী সবকিছু জড়িয়ে-মড়িয়ে দু'মিনিটের ভিতরেই তাঁদের সবাইকে বসন্ত রেস্টুরেন্টে নেমন্তন্ন করলুম, পটলা-হাবলুর ঠিকানা দিলুম, বসন্ত যে ভেজাল তেল আর পচা হাঁসের ডিম দিয়ে খাসা মামলেট বানায় তার বর্ণনা দিতেও ভুললুম না।

কিন্তু কোথায় লাগে আমাদের আড্ডা কাইরোর আড্ডার কাছে। বাঙালী-আড্ডার সব কটা সুখ কাইরোর আড্ডাতে তো আছেই; তার উপর আরেকটা মস্ত সুবিধার কথা এই বেলা বলি, যার জন্য এতক্ষণ ধরে ভূমিকা দিলুম।

দুনিয়ার যত ফেরিওলা কাইরোর কাফেতে চক্কর মেরে যায়। টুথব্রাশ, সাবান, মোজা, আরশি, চিরুনি, নোটবুক, পেন্সিল, তালাচাবি, ফাউন্টেন পেন, ঘড়ি—হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা নিয়ে আসে না। আমি জানি, আপনি সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু ধর্মসাক্ষী, দর্জি পর্যন্ত বস্তা বস্তা কাপড় মুটের ঘাড়ে চাপিয়ে কাফের ভিতর চক্কর মেরে যায়। কাইরোর লোক দোকানে যেতে ভালোবাসে না। তাতে নাকি সময় নষ্ট হয়, আর দোকানী একা পেয়ে আপনাকে ঠকাবেও নিশ্চয়। আড্ডাতে বন্ধু-বান্ধব রয়েছেন। পাঁচজনে মিলে বরং ফেরিওয়ালাকে ঘায়েল করার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

একপ্রস্ত সুট বানাবার বাসনা ছিল। আড্ডাতে সেটা সবিনয় নিবেদন করলুম। পাশ দিয়ে দর্জি যাচ্ছিল—ডাক দিতে সবাই 'হাঁ হাঁ, করো কি করো কি!' বলে বাধা দিলেন। 'ও ব্যাটা সুট বানাবার কি জানে? প্লাস্তিরাস আসুক। গ্রীক বটে, ঠকাবার চেষ্টা করবে, কিন্তু আমরাও তো পাঁচজন আছি। ও কাপড় আনে ঠকিয়ে, কাস্টম না দিয়ে। আমরাও ওকে ঠকাতে পারলে টাকায় আট আনা লাভ। ঠকলে দু আনা লাভ। অথবা কুইট্‌স।' তারপর আড্ডা আমায় বুঝিয়ে বলল, যে সুট বানাতে চায় সে যেন বর। তার কথা কওয়া ভালো দেখায় না। সে কনেপক্ষের প্যাঁচে পড়ে বানচাল হয়ে যাবে, গয়নাগুলো যাচাই না করে নিয়ে ফেলে আখেরে পস্তাবে।

প্লাস্তিরাস এল। তারপর বাপরে বাপ। সে কী অসম্ভব দরদস্তুর, বকাবকি...শেষটায় হাতাহাতির উপক্রম। আড্ডা বলে, 'ব্যাটা তুমি দুনিয়া ঠকিয়ে খাও, তোমাকে পুলিশে দেব।' প্লাস্তিরাস বলে, 'ও দামে সুট বানালে আমাকে আপন পাতলুন বন্ধক দিয়ে কাচ্চা-বাচ্চার জন্য আণ্ডারুটি কিনতে হবে।'

পাক্কা তিনঘণ্টা লড়াই চলেছিল। এর ভিতর প্লাস্তিরাস তিনবার রাগ করে কাপড়ের বস্তা নিয়ে চলে গেল, তিনবার ফিরে এল। আড্ডাও দল বাড়াবার জন্য কাফের ছোকরাকে পাঠিয়ে আমাদের গ্রীক সভ্য পাউলুসকে ডেকে আনিয়েছে। তখন লাগল গ্রীকে গ্রীকে লড়াই। সুড-এটেন্ নিয়ে হিটলার চেম্বারলেনে এর চেয়ে বেশি দর-কষাকষি নিশ্চয়ই হয় নি। যখন রফারফি হল তখন রাত এগারোটা। আমি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিলুম—আড্ডা তাতে আপত্তি জানান নি, বরের উপস্থিতি অপরিহার্য নয়। কাফের ছোকরা আমাকে বিছানা থেকে টেনে নিয়ে গেল। মাপ দেওয়া হল। তিন দিন বাদে পয়লা ট্রায়েল—অবশ্য কাফেতেই।

তিন দিন বাদে আড্ডা ফুল স্ট্রেন্থে হাজির। আমি কাফের পিছনের কামরায় গিয়ে নূতন সুট পরে বেরিয়ে এলুম। সর্বত্র চকের দাগ আর তাঁতীবাড়ির মত আমার সর্বাঙ্গ থেকে সুতো ঝুলছে। সুটের চেহারা দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মার লাগাও ব্যাটা প্লাস্তিরাসকে; এ কি সুট বানিয়েছে, না মৌলবী সাহেবের জোব্বা কেটেছে? ও কি পাতলুন, না চিমনির চোঙা? প্লাস্তিরাস দর্জি না হাজাম? ইত্যাদি সর্বপ্রকারের কটুকাটব্য। প্লাস্তিরাসও হেঁকে বলল, সে স্বয়ং বাদশার সুট বানায়। সবাই বললে, 'কোন্ বাদশা? সাহারার?'

তারপর এ বলে আস্তিন কাটো, ও বলে কলার ছাঁটো। কেউ বলে পাতলুন নামাও, কেউ বলে কোট তোলো। প্লাস্তিরাসও পয়লা নম্বরের ঘড়েল—সকলের কথায় কান দেয় আবার কারও কথায় কান দেয়ও না, অর্থাৎ বা ভালো বোঝে তাই করে।

এই করে করে কাফেতে আড্ডা জমানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনটে ট্রায়েল পেরলুম। সুট তৈরি হল। আমি সেইটে পরে বরের মত লাজুক হাসি হেসে সবাইকে সেলাম করলুম। সুট দীর্ঘজীবী হোক বলে সবাই আশীর্বাদ করলেন। কাফের মালিক পর্যন্ত আমাদের পরবে শামিল হল। আমি সব্বাইকে একপ্রস্থ কফি খাওয়ালুম। সে-সুট পরে আজও যখন ফার্পোতে যাই গুণীরা তারিফ করেন।

[পঞ্চতন্ত্র প্রথম খণ্ড—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

হিডজিভাই পি মরিস

একদা 'স্ট্র্যান্ড্' পত্রিকা একটি নতুন ধরনের অনুসন্ধানের সূত্রপাত করে সাহিত্যের মহা মহা মহারথীদের শুধোয়, তাঁরা সর্বজন-সম্মানিত, সর্বশিক্ষিতজনের অবশ্যপাঠ্য কোন্ কোন্ পুস্তক, যে কোনো কারণেই হোক, পড়ে উঠতে পারেন নি। উত্তরে এমন সব তথ্য আবিষ্কৃত হল যাকে 'মোহনে'র ভাষায় লোমহর্ষক বলা যেতে পারে ঃ যেমন, কথার কথা কইছি—বানার্ডশ পড়েন নি অলিভার টুইস্ট, কিংবা মনে করুন—রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি 'একেই কি বলে সভ্যতা'।

কাজেই বিখ্যাত সাহিত্যিকদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে এই অখ্যাত সাহিত্যসেবক যে তাঁরা যেন তড়িঘড়ি শ্রীযুক্ত বিশী মহাশয়ের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বইখানা পড়ে নেন।

এই পুস্তকে 'কাব্যের উপেক্ষিতা' জাতীয় দু'চারটি চরিত্রের উল্লেখ করে বিশী মহাশয় বহু প্রাক্তন শান্তিনিকেতনবাসীদের সাধুবাদ পেয়েছেন। তাঁদেরই একজন হিডজিভাই মরিস্।

তাঁর পুরো নাম হিডজিভাই পেস্তনজি মরিসওয়ালা। গুজরাতীদের প্রায় সকলেরই পারিবারিক নাম থাকে; যেমন গাঁধী, জিন্না (আসলে ঝিঁড়া ভাই), হটিসিং ইত্যাদি। পার্সীদের অনেকেরই ছিল না বলে কেউ কেউ তাঁদের ব্যবসার নাম পারিবারিক নাম রূপে গ্রহণ করতেন। যেমন ইঞ্জিনীয়ার, কনট্রাকটর ইত্যাদি। এই নিয়ে পার্সীরা ঠাট্টা করে একটি চরম দৃষ্টান্ত দেন—সোডাওয়াটারবট্লওপনারওয়ালা!

বোম্বাইয়ের পতীত্ পরিবার বিখ্যাত। এঁরা ফরাসী 'পতী' (Petit) ফার্মে কাজ করতেন বলে প্রথমে পতীত্ওয়ালা ও পরে পতীত্ নামে পরিচিত হন। ঠিক সেইরকম মরিস কোম্পানিতে কাজ করে আমাদের অধ্যাপক মরিসওয়ালা পরে শুধু মরিস নামে বোম্বাই অঞ্চলে নাম করেন।

অত্যুত্তম ফরাসী ও লাতিন শেখার পর না জানি কোন্ যোগাযোগে তিনি শান্তিনিকেতন পৌঁছে সেখানে অধ্যাপনা আরম্ভ করেন।

দুটো বিষয়ে তিনি ছিলেন খাঁটি বাঙালী—সেন্টিমেন্টাল এবং আদর্শবাদী। আমার আশ্চর্য লাগতো, কারণ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে যেসব গুজরাতী ছেলেরা—এবং পাঠিকারা অপরাধ নেবেন না, মেয়েরাও—শান্তিনিকেতন আসে, তারা পর্যন্ত টাকা আনা পাই হিসেব করতো; শুনেছি, ছাত্রেরা আকছারই আদর্শবাদী হয়। (নইলে অত নিঃস্বার্থ ট্রাম-বাস পোড়ানোর সৎকর্মটা করে কে? কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কথা না। হক্ কথা কইলে পুলিশ ধরবে।) তাই গুজরাতী মরিস সাহেবের আদর্শবাদ আমাকে বিস্মিত করেছিল।

সামান্য বাঙলা শেখার পরই মরিস সাহেবের প্রেম উপচে পড়ল রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি এবং তিনি সম্মোহিত হলেন

"তাহাতে এ জগতে ক্ষতি কার
নামাতে পারি যদি মনোভার" শুনে।

অন্যত্র আলোচনা করেছি, ভারতের বাইরে কোনো ভাষাই 'ত' এবং 'ট'-র উচ্চারণে পার্থক্য করে না; এমন কি ভারতীয়দের ভিতর যাঁদের গায়ে প্রচুর বিদেশী রক্ত তাঁরাও এ-দুটোতে গুবলেট করেন। উদাহরণস্থলে, গুজরাতের বোরা সম্প্রদায়—এখানকার রাধাবাজারে এঁদের ব্যবসা আছে—ব্রহ্ম উপত্যকার আসামবাসী ও পার্সী সম্প্রদায়।

তাই মরিস সাহেবের উচ্চারণে ছত্র দুটি বেরুতো :

"টাহাটে এ জগটে ক্ষটি কার
নামাটে পারি যডি মনোভার।"

আমরা আর কি করে ওঁকে বোঝাই যে 'ত' 'দ'-এর অনুপ্রাস ছাড়াও গুরুদেবের গান আছে।

মরিস সাহেব নূতন বাঙলা শেখার সময় যে না বুঝে বিশীদাকে 'বেটা ভূত' বলেছিলেন, তার চেয়েও আরও মারাত্মকতম উদাহরণ আমি শুনেছি। তিনি আমাদের ফরাসী শেখাতেন এবং শ্রদ্ধেয় বিধুশেখর, ক্ষিতিমোহন এবং আরও কিছু অধ্যাপকও তাঁর ক্লাসে যেতেন। আমার হাসি পেত যখন গুরু মরিস ছাত্র বিধুশেখরকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন ও ছাত্র বিধুশেখর তাঁকে 'তুমি' বলে। একদিন হয়েছে কি, ফরাসী ব্যাকরণের কি একটা কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ফেলেছেন অধ্যক্ষ বিধুশেখর। মরিস সাহেব বললেন, 'চমৎকার! শাস্ত্রী মশায়, সত্যি, আপনি একটি আস্টো ঘুঘু।'

শাস্ত্রী মশাইয়ের তো চক্ষুস্থির। একটু চুপ করে থাকার পর গুরু, গুরু—যদ্যপি ছাত্র, তথাপি গুরু-কণ্ঠে শুধালেন, 'মরিস, এটা তোমাকে শেখালে কে?'

নিরীহ মরিস বোধ হয় কণ্ঠনিনাদ থেকে বিষয়টার গুরুত্ব খানিকটে আমেজ করতে পেরে বললেন, 'ডিন্‌ডা (দিনদা, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। উনি বলেছেন ওটার অর্থ "অসাডারণ বুড্‌ডিমান"। টবে কি ওটা ভুল?"

শাস্ত্রী মশাই শুধু ঈষৎ কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'আচ্ছা, আমি দিনেন্দ্রনাথকে বোঝাবো।'

দিনুবাবু নাকি বিদেশীকে ভাষা শেখাবার সময় কর্তব্যবোধহীন চপলতার জন্য বেশ কিছুটা ভালোমন্দ শুনেছিলেন শাস্ত্রী মশাইয়ের কাছ থেকে।

ঐ সময় প্যারিস থেকে অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে আসেন। উভয়েই একাধিকবার বলেন, মরিস সাহেব উল্লেখ না করা পর্যন্ত তারা কখনো বিশ্বাস করতে পারেন নি, ফ্রান্স না গিয়ে মানুষ কি করে এরকম বিশুদ্ধ ফরাসী শিখতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে রলাঁর 'যীশুজীবনী' পড়ান। এ বই আমার মহদুপকার করেছে এবং করছে।

বলা বাহুল্য এই সরল সজ্জন যুবা পণ্ডিতটি সকলেরই হৃদয়ে স্থান পেয়েছিলেন। গুরুদেবের তো কথাই নেই, মরিস সাহেব ঋষিতুল্য দ্বিজেন্দ্রনাথেরও অশেষ স্নেহ পেয়েছিলেন। বড়বাবু বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে বাক্যালাপ কালক্ষয় বলে মনে করতেন; বলতেন, 'এরা সব তো জানে কোন্ শতাব্দীতে প্রজ্ঞাপারমিতা কিংবা একাক্ষরপারমিতা প্রথম লেখা হয়, প্রথম ছাপা হয়। ওসব জেনে আমার কি হবে? তার চেয়ে নিয়ে আসো না ওদের কোনো একজন, যে কান্টের দর্শন সমর্থন করতে পারে, আর আমি নেব বিরুদ্ধ মতবাদ, কিংবা সে নেবে বিরুদ্ধ মতবাদ, আমি নেব কান্টপক্ষ—তার যেটা খুশী।' মরিস সাহেব তাঁকে তখন অনুনয় বিনয় করে সম্মত করাতেন বিদেশী পণ্ডিতকে দর্শন দিতে। অবশ্য দু'মিনিট যেতে না যেতেই বড়বাবু সব ভুলে গিয়ে কোনো কিছু অন্য তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন। আমাদের মতন ছেলে-ছোকরাদের কিন্তু তাঁর কাছে ছিল অবাধ গমন। আমার মনে পড়তো খ্রীস্টের কথা; তিনি যেহোভার মন্দির থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিস্তর তথাকথিত কুলাঙ্গার ভি আই পি-কে, এবং আদেশ দিতেন 'লেট দি চিলড্রেন কাম্ আনটু মী'।

মরিস সাহেব প্রথমটায় সম্মত ছিলেন না; আর সকলের চাপাচাপিতে তিনি প্যারিসের সরবনে গিয়ে ডক্টরেটের জন্য প্রস্তুত হতে রাজি হলেন।

প্যারিসের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে তাঁর সঙ্গে আমার অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা। আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করাতে আমি দুঃখ প্রকাশ করলুম। তিনি বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ; জর্মনিতে ডক্টরেট করবে। আমিও এখানে তাই করছি। আমরা এখন এক-বয়েসি।' আমার বয়েস তখন চব্বিশ, তাঁর বত্রিশ। তারপর আমাকে রেস্তোরাঁয় উত্তমরূপে খানদানী ডিনার খাওয়ালেন। বিনয় এবং সঙ্কোচের সঙ্গে পরের দিন বললেন, 'তোমাকে ভালো করে এন্টারটেন করতে পারলুম না। তোমাকে বলতে লজ্জা নেই, আমার এ মাসের টাকাটা এখনো দেশ থেকে আসে নি।' আমি তারস্বরে প্রতিবাদ জানালুম। বহু বৎসর পরে ঐ সময়কার এক প্যারিসবাসী ভারতীয়ের কাছে শুনতে পাই মরিস সাহেব অন্যান্য দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্রদের টাকা 'ধার' দিয়ে মাসের বেশির ভাগ দেউলে হওয়ার গহ্বর-প্রান্তে পড়ি পড়ি করে বেঁচে থাকতেন। আসলে তাঁর পরিবার বিত্তশালী ছিল।...তাঁর সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা। কিন্তু এখনো তাঁর সেই শান্ত সংযত প্রসন্ন বদনটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু তার পূর্বের একটি ঘটনা চিরকাল ধরে আমার ও আমার সতীর্থদের চিত্তে কৌতুক রস এনে দেবে, প্রতিবার সেটার স্মরণে।

গুরুদেব শারদোৎসবের মোহড়া নিচ্ছেন। তিনি স্বয়ং দিনুবাবু—এমন কি জগদানন্দবাবুর মত রাশভারী লোক—অজিন ঠাকুর এঁরা সব অভিনয় করবেন। এক প্রান্তে বসে আছেন শুষ্কাস্য বিষণ্ণবদন মরিস সাহেব। আমি হোম্‌টাস্‌ক্‌ না করলে তাঁর মুখে যে বিষণ্ণতা আসতো তিনি যেন তারই গোটাদশেক 'হেলপিং' নিয়েছেন। মোহড়ার শেষে দিনুবাবু কাঁচুমাচু হয়ে গুরুদেবকে অনুরোধ জানালেন, মরিস সাহেবকে ড্রামাতে একটা পার্ট দিতে।

গুরুদেবের ওষ্ঠাধর প্রান্তের মৃদুহাস্য সব সময় ঠাহর করা যেত না। এবারে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যে সব পার্টেরই বিলিব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। গুরুদেব বললেন, 'ঠিক আছে। একে শ্রেষ্ঠীর পার্ট দিচ্ছি।' হয় মূল নাটকে শ্রেষ্ঠীর পার্ট আদৌ ছিল না, ঐটে মরিস সাহেবের জন্য 'ইস্‌পিসিলি' তৈরি হয় কিংবা হয়তো তখন মাত্র বড় বড় পার্টগুলোর বণ্টনব্যবস্থা আছে।

তা সে যা-ই হোক, শ্রেষ্ঠীর অভিনয় করবেন 'নটরাজ' মরিস—শাস্ত্রী মশাই তাঁর নাম দিয়েছিলেন মরীচি (ব্রহ্মার পুত্র, কশ্যপের পিতা ও তিনি সূর্যকিরণও বটেন)—মরিসও সগর্বে কাঁচা-হাতে সেই নামই সই করতেন। এবারে শুনুন, পার্টটি কি?

রাজা : ওগো শ্রেষ্ঠী!

শ্রেষ্ঠী : আদেশ করুন, মহারাজ!

রাজা : এই লোকটিকে হাজার কার্ষাপণ গুনে দাও।

শ্রেষ্ঠী : যে আদেশ!

ব্যস্‌! ঐটুকু! আমার শব্দগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই, কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে মরিসকে ঐ পাঁচটি শব্দ বলতে হবে, গুরুদেব সায়েবের বাঙলা উচ্চারণ সম্বন্ধে বিলক্ষণ ওকীব-হাল ছিলেন বলে। কিন্তু মরিস সাহেব বেজায় খুশ, জান্‌ তর্‌র্‌র্‌—ড্যাম্‌গ্ল্যাডে—হোক না পার্ট ছোট, তাতেই বা কি? বলেন নি স্বয়ং গুরুদেব, 'The rose which is single need not envy the thorns which are many?'

কিন্তু এইবারে শুরু হল ট্রবল। গুরুদেবের ভাষাতেই বলি, মরিসকে শুতে হল কণ্টকশয্যায়, গোলাপ-পাপড়ির আচ্ছাদিত পুষ্পশয্যায় নয়—যদিও থর্ন মাত্র একটি।

গুরুদেব যতই বলেন 'আদেশ করুন, মহারাজ' মরিস বলেন, 'আডেস করুন, মহারাজ।' মহা মুশকিল! মরিস আপন মরীচ-তাপে ঘর্মাক্তবদন। শেষটায় গুরুদেব বরাত দিলেন দিনুবাবুকে, তিনি যেন সাহেবের 'ত' 'ট'র জট ছাড়িয়ে দেন। আফটার অল—তিনিই তো খাল কেটে ঘরে কুমির এনেছেন; বিপদ, এক্স্‌কিউজ মি—বিপডটা টারই টেরি।

মরিস সাহেব ছন্নের মত হয়ে গেলেন। সেই প্রফেট জরথুস্ত্রের আমল থেকে কোন্ পার্সী-সন্তান এই 'ত' 'ট'য়ের গর্দিশ মোকাবেলা করেছে—এই আড়াই হাজার বছর ধরে—যে আজ এই নিরীহ, হাড্ডিসার মরিস বিদেশ-বিভুঁইয়ে একা একা এই 'ত'য়ের তাবৎ 'দ'য়ের দানব—আই মীন ডানব, টাবড ডানবের সঙ্গে লড়াই দেবে?

মরিস ছন্নের মত আশ্রমময় ঘুরে বেড়ান—দৃষ্টি কখনো হেথায় কখনো হোথায়, আর ঠোঁট দুটি বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। আমি বললুম, 'নমস্কার, স্যার।' সম্বিতে এসে বললেন, 'আ! সায়েড (সৈয়দ)—' ও হরি! এখনো 'সায়েড'! তবে তো আডেশ এখনো মোকামে কায়েম আছে, রাজাদেশেরই মত—'শোনো টো ঠিক হচ্ছে কি না "আডেশ করুন, মহারাজ"।' আমি সন্তপ্ত চিত্তে চুপ করে রইলুম। বার দশেক আডেশ আডেশ করে বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে এগিয়ে গেলেন।

একটা ডরমিটরি ঘরের কোণ ঘুরতেই হঠাৎ সমুখে মরিস—বিড়বিড় করছেন 'আডেশ আডে—।' রেললাইনের কাছে নির্জনে 'আডেশ—!' দূর অতি দূর খোয়াইয়ের নালা থেকে মাথা উঠছে সায়েবের, আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। চন্দ্রালোকে, খেলার মাঠে মরিস, আসন্ন উষার প্রদোষে শ্মশানপ্রান্তে কার ঐ ছায়ামূর্তি? মরিস। হিন্দী কবি সত্যি বলেছেন, গুরু তো লাখে লাখে, উত্তম চেলা কই। আশ্রমের ছেলেবুড়ো এখন সবাই সায়েবের গুরু। এন্তেক শিশুবিভাগের কানাই, সাগর কেউ বাদ পড়ে নি। পড়ে থাকলে তাদের দোষ। সবাইকে টেস্ট করতে অনুরোধ করেন তাঁর আডেশ আডেশানুযায়ী হচ্ছে কি না। ইতিমধ্যে এক সন্ধ্যায় মোহড়া শেষে দিনুবাবু গুরুদেবকে ভয়ে ভয়ে অনুরোধ জানালেন, 'আদেশে'র বদলে অন্য কোনো শব্দ দিতে, যেটাতে "ত" "দ" নেই। গুরুদেব বললেন, 'না; মরিসকে "ত" "দ" শিখতেই হবে।'

এরপর দ্বিতীয় পর্ব। হঠাৎ সক্কলের সামনে এক দিন বেরিয়ে গেল "আদেশ" অত্যুত্তম 'দ' সহ। আমি 'ইয়াল্লা' বলে লম্ফ দিলুম। কেউ 'সাধু সাধু', কেউ বা 'কনগ্রাচুলেশনস্' বললেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট! আমরা বন থেকে বেরুবার পূর্বেই হর্ষধ্বনি করে ফেলেছি! সায়েব পরক্ষণে আডেশ-এ ল্যাপস্ করেছেন। তারপর তাঁর ক্ষণে আসে 'দ' ক্ষণে 'ড'। কলকাতার বাজারে মাছ ওঠা-না-ওঠার মত বেটিঙের ব্যাপার! এই করে করে চললো দিন সাতেক। সম্মুখে আশার আলো।

এরপর তৃতীয় পর্ব। দ্বিতীয় পর্বের মত এটাও অপ্রত্যাশিত। সায়েব এখন চাঁচাছোলা, ভোরবেলার নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক শিশিরবিন্দুর ন্যায় 'দ' বলতে পারেন। পয়গম্বর জরথুস্ত্র এবং তাঁর প্রভু আহুর মজদাকে অশেষ ধন্যবাদ!

আমরাও আমাদের সঙ্কটটা ভুলে গেলুম। মোহড়ায় প্রতিবাব ঋষি মরীচি বৈদিক পদ্ধতিতে 'দ' উচ্চারণ করেন।

মরিস সাহেব স্টেজে নামলেন পার্সী দস্তুর বা যাজকের বেশ পরে। সবকিছু ধবধবে সাদা। শুধু মাথার টুপিটি দাদাভাই নোরজী স্টাইলের লেটার বক্স্ প্যাটার্নের কালোর উপর সফেদ বুট্টাদার। গুরুদেব এই বেশই চেয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা পার্সীরা বাপু এ দেশের শ্রেষ্ঠী। তোমরা যা পরবে তাই শ্রেষ্ঠীর বেশ।'

নাট্যশালা গম গম করছে। ওঃ, সে কী অভিনয়! গুরুদেবকে দেখাচ্ছে দেবদূতের মত। অজিনের চেহারা এমনিতেই খাপসুরত, এমন দেখাচ্ছে রাজপুত্রের মত। গুরুমশাই জগদানন্দ রায়ের কী বেত্রাস্ফালন! আশ্রমে বেতের বেসাতি বিলকুল বে-আইনি। এ মোকায় জগদানন্দবাবু যে হৃতোপবীত-দ্বিজ লুণ্ঠিত যজ্ঞোপবীত ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কঠিনদর্শন মুখচ্ছবি ঈষৎ স্নিগ্ধতা ধরেছে।

মরিস সাহেব প্রবেশ করলেন রঙ্গমঞ্চে।

রাজা দিলেন ডাক।

মরিস সাহেব—হে ইন্দ্র, তোমার বজ্র কেন তৎপূর্বেই অবতীর্ণ হল না?

উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় মরিস বলে ফেলেছেন, 'আ ডে শ।'

অট্টহাস্যে ছাদ যেন ভেঙে পড়ে। তিনি কিন্তু ঐ একই উত্তেজনার নাগপাশে বদ্ধ বলে সে অট্টহাস্য শুনতে পান নি।

সে সন্ধ্যার অভিনয়ের জন্য অধ্যাপক হিড্‌জিভাই মরিসই পেয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন। আমাদের বিবেকবুদ্ধি সেই আদেশই দিয়েছিল—খুব সম্ভব আডেশই।[১]

[পঞ্চতন্ত্র দ্বিতীয় খণ্ড—রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড]

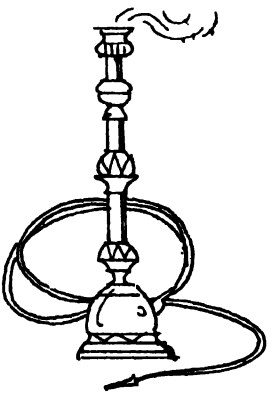

১ মরিস সর্বদাই ঈষৎ বিষণ্ণ বদন ধারণ করতেন—খুব সম্ভব এটাকেই বলে 'মেলানকলিয়া'। প্যারিস থেকে ফেরার পথে তিনি জাহাজ থেকে অন্তর্ধান করেন। আমার মত আর পাঁচজন তার কারণ জানে না। শুনেছি, তিনি উইল করে তাঁর সর্বস্ব বিশ্বভারতীকে দিয়ে যান।

ধন্য অবাঙালী!

ভিন্ন ভিন্ন জাত সম্বন্ধে পৃথিবীর লোক কতকগুলো ধারণা করে বসে আছে। যেমন স্কচ্ কিপ্টে, ফরাসী দুশ্চরিত্র, জর্মন ভোঁতা, ইংরেজ অবিশ্বাসী, এমন কি প্রখ্যাত ফরাসী সাংবাদিকা মাদাম তাবুই-এর একখানা বই আছে যার শিরোনামা 'লা পেরফিড আলবিয়োঁ' (বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ) দিয়ে আরম্ভ। (অবশ্য তিনি তাঁর পুস্তকে প্রমাণ করার চেষ্টা দিয়েছেন যে এ 'কুসংস্কারে'র জন্য ইংরেজ সম্পূর্ণ দায়ী নয়, ফরাসীও অনেকখানি)।

এরকম ঢালাও 'জাতিবিচার' থেকে ঐ যে ধারকর্জ দেনেওলা আমাদের নিরীহ কলকাত্তাই পাঠানও (চলতি ভাষায় কাবুলীওয়ালা) মুক্ত নয়। আমাদের পার্ক সার্কাসের বাড়িতে আসতো দুই ঈদের দিনে এক পাঠান। একবার কথায় কথায় বললে, 'আপকা কলকাত্তা শহরমে বহুৎ আচ্ছা আলু, চান্না হোতা হৈ।' আমরা তো অবাক—কলকাতা শহরের রাস্তার উপর যত লক্ষ লক্ষ গভীর গর্ত থাক না কেন কোনোটাতেই তো আজ অবধি আলু বা চানা ফলতে দেখিনি—সরকারের 'অধিক ফসল ফলাও' কান ঝালাপালা করা প্রপাগান্ডা সত্ত্বেও। পাঠান ফের বললে, 'ঘর ঘর মেঁ।' আমরা তো আরও সাত হাত পানীমে। শেষটায় বোঝা গেল পাঠান 'আলু চান্না' বলতে 'আলোচনা' বোঝাতে চেয়েছিল।

পাঠানের এই ঢালাও জাতিবিচার কিন্তু এস্থলে ভুল নয়। রকবাজি আড্ডাবাজিতে কলকাত্তাইয়া এখনো অলিম্পিকের গোল্ড মেডেল ধারণ করে। এই যে হালে আমরা নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ক্রিকেট 'খেললুম' ঠিক তার উল্টোটি। ক্রিকেটের সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে হলে আমাদের রক-আড্ডাবাজির টিমে আছেন চারটে রণজী, তিনটে ব্রাডম্যান, দুটো লারউড, একটা নিসার আর গুগ্‌লির জন্য ঐ একটা বসান্‌কে। তা সে কথা থাক। পাঠান বাস করে খাঁটি বাঙালী পাড়ায়—সাম্‌-বাজারে। রাস্তার পর রাস্তা পেরুতে পেরুতে সুবোশাম নিত্যি নিত্যি দু-পাশে দেখে রকের পর রক—মহাসভা, কানে যায় আলু চান্না।

কিন্তু পাঠানের দ্বিতীয় জাতবিচারটা একদম ভুল বেরুলো। বললে, 'কলকত্তেমে বহুৎ অচ্ছী ফার্সী বোলী জাতী—হর রাস্তে পর।' বলে কী? আলু আর চানা তবু না হয় বুঝি, হয়তো বা পাঠান কলকাতার মুদীর দোকানে ঐ দুই বস্তু অত্যুত্তম সরেস জাতের পেয়েছিল। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় 'অচ্ছী ফার্সী' বলা হয় এটা কেমনতর? পাঠান বোঝালে, দিনে অন্তত একশ' বার সে শুনতে পায় বহু কণ্ঠে, কিন্তু সর্বদাই অনবদ্য ফার্সী উচ্চারণে 'ব্‌-তালাশে বক্রী'। এ-স্থলে বাঙালী পাঠককে বোঝাই 'ব্‌' = with এবং for (যেমন ব্‌ কলমে বকলমে শেখ ফিরোজ, বা ব্‌হাল = বহাল তবিয়ৎ, ব্‌মল = বমাল গ্রেফতার) 'তালাস = তল্লাসী; এবং 'বক্রী' = ছাগল। অর্থাৎ কোনো লোক বক্রীর তল্লাসীতে (for বক্রী) বেরিয়েছে।

এ কি কথা! আমরা তো কখনো শুনিনি।

এমন সময় বাইরে ফেরিওয়ালার হাঁক শোনা গেল। পাঠান লম্ফ দিয়ে সোল্লাসে বললে, 'ঐ তো বলছে ব্‌-তালাশে বক্রী।'

ওমা। ইয়াল্লা! ও হরি! ফেরিওলা চেঁচাচ্ছে, 'বোতল আছে বিক্রি।'

তাই বলছিলুম, এস্থলে পাঠানের জাতবিচারে ভুল হয়ে গেল।

এগুলোর নিষ্পত্তি তো সহজেই হয়ে গেল কিন্তু অন্যগুলোর বেলা? যেমন মনে করুন, লোকে বলে ফ্রান্সের লোক অসচ্চরিত্র। এবং সেই সূত্রে বহু বহু চুটকিলা প্রচলিত আছে। তারই একটি :

এক ফরাসী নিমন্ত্রিত হয়েছে এক মার্কিন পরিবারে। বিস্তর হইহুল্লোড়। ফরাসী সঠিক বুঝতে পারেনি পরবটা কিসের। পাশে বসেছিল এক মার্কিন। তাকে কানে কানে শুধোলো, 'ব্যাপারটা কি?' মার্কিন বুঝিয়ে বললে, 'ঐ যে দেখতে পাচ্ছেন বুড়ো-বুড়ী—এঁরা পঞ্চাশ বৎসর সুখে সহবাস করার পর আজ তাঁদের "বিবাহের সুবর্ণজয়ন্তী" পালন করছেন।' ফরাসী বললে, 'অ বুঝেছি। এঁরা পঞ্চাশ বছর সহবাস করার পর এই এখন বিয়ে করতে যাচ্ছেন।' তারপর খানিকক্ষণ ঘাড় চুলকে বললো, 'তা—তা ঐ নিয়ে এত তুলকালাম কাণ্ড কেন? আমরা তো আকছারই করে থাকি।'

পাঠানের গল্প যে-রকম 'জাতিবিচারে'র ব্যাপারে পরখ করা গেল, এখানে তো তা করা যাচ্ছে না। তবে কি সত্যিই হুদো হুদো ফরাসী ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর সহবাস করার পর বিয়ে করে? প্রধানত জারজ সন্তানদের আইনত সন্তানরূপে স্বীকৃতি দেবার জন্যে?

কিন্তু এ বিষয়ে ফরাসীদের নিয়েই এ গল্পটা তৈরি হল কেন?

আমরা একটি সত্য ঘটনা জানি এবং সেটা অস্ট্রিয়া দেশের ব্যাপার।

জনৈক অস্ট্রিয়ার লোক, য়োহান গেওর্গ হিটলার যখন একটি 'কুমারী'কে বিয়ে করলেন, তখন সেই 'কুমারী'র একটি পাঁচ বছর বয়সের ছেলে ছিল। বিয়ের পাঁচ বছর পর ঐ মহিলার মৃত্যু হয়। সঙ্গে সঙ্গে য়োহান হিটলার অস্ট্রিয়া থেকে অন্তর্ধান করলেন। তার সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর পর তিনি আবার ফিরে এলেন মাতৃভূমিতে এবং একজন উকিল ও দু'জন সাক্ষীর সামনে শপথ নিয়ে বললেন, তাঁর বিয়ের পাঁচ বছর পূর্বে ঐ যে সন্তান জন্মেছিল সে তাঁরই ঔরসের সন্তান।

এই লোকটিই জর্মনীর ফুরার আডলফ হিটলারের পিতা।*

এতক্ষণ ধরে আমি শুধু পটভূমি নির্মাণ করেছিলুম। এইবারে দেখি, সেয়ানা পাঠক, তোমার পেটে এলেম কতখানি।

মার্কিনরা চাঁদে গেছে শুনে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আত্মসম্মানবোধ হুঙ্কার দিয়ে বললে, 'ভারতীয়েরাও যাবে।' কিন্তু শ্রীযুক্ত সত্যেন বসু এ-বাবদে উদাসীন তাই কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, 'চাঁদে যাঁরা যেতে চান তাঁরা আবেদন করুন।' বিস্তর দরখাস্ত এল। শেষ পর্যন্ত মাত্র তিনজনকে ইন্টারভ্যুর জন্য ডাকা হল, একজন বাঙালী, বাকি দু'জন ভিন্ন প্রদেশের।

যে কর্তা ইন্টারভ্যু নিচ্ছিলেন তিনি প্রথম ডেকে পাঠালেন বাঙালীকে। শুধোলেন, 'চাঁদে যাওয়ার জন্য কত টাকা চান?'

'পাঁচ লাখ।'

'অত কেন?'

'এজ্ঞে, বুড়ো মা বাপ রয়েছেন। বোনটির বিয়ে দিতে হবে। দুটো ছোট ভাই ইস্কুলে যায়। বিধবা পিসিও রয়েছেন। চাঁদ থেকে ফিরে না আসতে পারলে ঐ টাকাতেই তাদের চলে যাবে।'

কর্তা : 'আচ্ছা, পরে জানাবো।'

তারপর ডাকা হল দ্বিতীয়জনকে। সে প্রদেশের লোক একটু ফুর্তিফার্তি করতে ভালোবাসে। বললে, 'দশ লাখ।'

* W. Shirer; Aufsteg unid Fall in S. W. পৃষ্ঠা ৭।

কর্তা : 'অত কেন?'

'হানজী পাঁচ লাখ দিয়ে মদ্যপানাদি, কাবারে গমন, হেঁ হেঁ—রমণীসঙ্গ ইত্যাদি ইত্যাদি। ফিরে তো নাও আসতে পারি; তাই সর্বশেষ শখটখ। বাকি পাঁচ লাখ রেখে যাবো বুড়ো মা, বাপ, অবিবাহিত ভগ্নী, দুই ভাই, বিধবা পিসির জন্য।'

কর্তা : "আচ্ছা, পরে জানাবো।'

এরপর এলেন তৃতীয় এক প্রদেশের লোক। ইনি চাইলেন পনেরো লাখ।

কর্তা তাজ্জব মেনে বললেন, 'অত বেশি কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে, লোকটি ডাইনে-বাঁয়ে দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে বললে—

'বাবুজী, পনেরো লাখের পাঁচ লাখ তো তোমার। পাঁচ লাখ আমার। আর বাকি পাঁচ লাখ দিয়ে ঐ ব্যাটা বাঙালীকে চাঁদে পাঠিয়ে দেব।'

এইবারে পাঠক, বের করো তো, দোসরা আর তেসরা ওমেদার কোন্ কোন্ প্রদেশের লোক? কিন্তু সাবধান। 'প্রকাশককে' এ-বাবদে চিঠি দেবে না। তিনি ছাপাবেন না। আমাকেও লিখবে না। আম্মো উত্তর দেব না।

[কত না অশ্রুজল—রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড]

তোতা কাহিনী

পারস্য দেশের গুণী-জ্ঞানীরা বলেন, আল্লা যদি আরবী ভাষায় কোরান প্রকাশ না করে ফার্সীতে করতেন, তবে মৌলানা জালালউদ্দীন রুমীর 'মসনবি' কেতাবখানাকে কোরান নাম দিয়ে চালিয়ে দিতেন। এ ধরনের তারিফ আর কোন দেশের লোক তাদের কবির জন্য করেছে বলে তো আমার জানা নেই।

মৌলানা রুমী ছিলেন ভক্ত। তিনি ভগবানকে পেয়েছিলেন কদম্ববন-বিহারিণী শ্রীরাধা যেরকম করে গোপীজনবল্লভ শ্রীহরিকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ প্রেম দিয়ে। রুমী তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা মসনবিতে বর্ণনা করেছেন। বেশির ভাগ গল্পচ্ছলে, তারই একটি 'তোতা কাহিনী'।

ইরান দেশের এক সদাগরের ছিল একটি ভারতীয় তোতা। সে তোতা জ্ঞানে বৃহস্পতি, রসে কালিদাস, সৌন্দর্যে রুডলফ ভেলেন্টিনো, পাণ্ডিত্যে ম্যাক্সমুলার। সদাগর তাই ফুরসত পেলেই সেই তোতার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ, তত্ত্বালোচনা করে নিতেন।

হঠাৎ একদিন সদাগর খবর পেলেন ভারতবর্ষে কার্পেট বিক্রি হচ্ছে আক্রা দরে। তখনই মনস্থির করে ফেললেন ভারতে যাবেন কার্পেট বেচতে। যোগাড়-যন্ত্র তদ্দণ্ডেই হয়ে গেল। সর্বশেষে গোষ্ঠীকুটুমকে জিজ্ঞেস করলেন, কার জন্য হিন্দুস্থান থেকে কি সওদা নিয়ে আসবেন। তোতাও বাদ পড়ল না—তাকেও শুধালেন সে কি সওগাত চায়। তোতা বললে, 'হুজুর, যদিও আপনার সঙ্গে আমার বেরাদরি, ইয়ারগিরি বহু বৎসরের, তবু খাঁচা থেকে মুক্তি চায় না কোন্ চিড়িয়া? হিন্দুস্তানে আমার জাতভাই কারোর সঙ্গে যদি দেখা হয় তবে আমার এ অবস্থার বর্ণনা করে মুক্তির উপায়টা জেনে নেবেন কি? আর তার প্রতিকূল ব্যবস্থাও যখন আপনি করতে পারবেন, তখন এ সওগাতটা চাওয়া তো কিছু অন্যায়ও নয়।

সওদাগর ভারতবর্ষে এসে মেলা পয়সা কামালেন, সওগাতও কেনা হল, কিন্তু তোতার সওগাতের কথা গেলেন বেবাক ভুলে। মনে পড়ল হঠাৎ একদিন এক বনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় একঝাঁক তোতা পাখি দেখে। তখ্খুনি তাদের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমাদের এক বেরাদর ইরান দেশের খাঁচায় বন্ধ হয়ে দিন কাটাচ্ছে। তার মুক্তির উপায় বলে দিতে পারো?' কোনো পাখিই খেয়াল করল না সদাগরের কথার দিকে। শুধু দুঃসংবাদটা একটা পাখির বুকে এমনি বাজ হানল যে, সে তৎক্ষণাৎ মরে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। সদাগর বিস্তর আপসোস করলেন নিরীহ একটি পাখিকে বেমক্কা বদ-খবর দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে। স্থির করলেন, এ মূর্খামি দু-বার করবেন না। মনে মনে নিজের গালে ঠাস-ঠাস করে মারলেন গণ্ডা দুই চড়।

বাড়ি ফিরে সদাগর সওগাত বিলোলেন দরাজ হাতে। সবাই খুশ, নিশ্চয়ই 'জয় হিন্দ' বলেছিল ব্যাটা-বাচ্চা সবাই। শুধু তোতা গেল ফাঁকি—সদাগর আর ও-ঘরে যান না পাছে তোতা তাঁকে পাকড়ে ধরে সওগাতের জন্য। উঁহু, সেটি হচ্ছে না, ও খবরটা যে করেই হোক চেপে যেতে হবে।

কিন্তু হলে কি হয়—গোঁপ কামানোর পরও হাত ওঠে অজানাতে চাড়া দেবার জন্য (পরশুরাম উবাচ), বে-খেয়ালে গিয়ে ঢুকে পড়েছেন হঠাৎ একদিন তোতার ঘরে। আর যাবে কোথায়—'অস্-সালাম আলাই কুম, ও রহমৎ উল্লাহি, ও বরকত ওহু, আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞে হোক। হুজুরের আগমন শুভ হোক ইত্যাদি ইত্যাদি, তোতা চেঁচাল।

সদাগর 'হেঁ হেঁ' করে গেলেন। মনে মনে বললেন, খেয়েছে!

তোতা আর ঘুঘু এক জিনিস নয় জানি, কিন্তু এ তোতা ঘুঘু। বললে, 'হুজুর সওগাত?'

সদাগর ফাটা বাঁশের মধ্যিখানে। বলতে পারেন না, চাপতেও পারেন না। তোতা এমন ভাবে সদাগরের দিকে তাকায় যেন তিনি বেইমানস্য বেইমান। সওগাতের ওয়াদা দিয়ে গড্ড্যাম্ ফক্কিকারি! মানুষ জানোয়ারটা এই রকমই হয় বটে! তওবা, তওবা!

কি আর করেন সদাগর। কথা রাখতেই হয়। দুম করে বলে ফেললেন।

যেই না বলা তোতাটি ধপ করে পড়ে মরে গেল। তার একটা বেরাদর সেই দূর হিন্দুস্তানে তার দুরবস্থায় খবর পেয়ে হার্টফেল করে মারা গেল, এরকম একটা প্রাণঘাতী দুঃসংবাদ শুনলে কার না কলিজা ফেটে যায়?

দিলের দোস্ত তোতাটি মারা যাওয়ায় সদাগর তো হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন। 'হায়, হায়, কী বেকুব, কী বে-আক্কেল আমি। একই ভুল, দুবার করলুম।' পাগলের মত মাথা থাবড়ান সদাগর। কিন্তু তখন আর আপসোস, ফায়দা নেই—ঘোড়া চুরির পর আর আস্তাবলে তালা মেরে কি লভ্য। সদাগর চোখের জল মুছতে মুছতে খাঁচা খুলে তোতাকে বের করে আঙ্গিনায় ছুঁড়ে ফেললেন।

তখন কী আশ্চর্য, কী কেরামতি! ছুঁড়ে ফেলতেই তোতা উড়ে বসল গিয়ে বাড়ির ছাদে। সদাগর তাজ্জব—হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন তোতার দিকে। অনেকক্ষণ পরে সম্বিত ফিরে শুধালেন, 'মানে?'

তোতা এবারে প্যাঁচার মত গম্ভীর কণ্ঠে বললো, 'হিন্দুস্থানী যে তোতা আমার বদনসিবের খবর পেয়ে মারা যায়, সে কিন্তু আসলে মরে নি। মরার ভান করে আমাকে খবর পাঠালো, আমিও যদি মরার ভান করি, তবে খাঁচা থেকে মুক্তি পাবো।'

সদাগর মাথা নিচু করে বললেন, 'বুঝেছি, কিন্তু বন্ধু, যাবার আগে আমাকে শেষ তত্ত্ব বলে যাও। আর তো তোমাকে পাব না।'

তোতা বললে, 'মরার আগেই যদি মরতে পারো, তবেই মোক্ষলাভ। মড়ার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, মান-অপমান বোধ নেই। সে তখন মুক্ত, সে নির্বাণ মোক্ষ সবই পেয়ে গিয়েছে। মরার আগে মরবার চেষ্টা করো।'

* * *

এই গল্প ভারতবর্ষে বহু পূর্বে এসেছিল। কবীর বলেছেন,

'ত্যজো অভিমানা শিখো জ্ঞানা
সত্‌গুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর, কোই বিরল হংসা
জীবতহী জো মরতা হৈ॥'

(অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। করীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুলাভ করেছেন সেরকম হংসসাধক বিরল')।

আর বাঙলা দেশের লালন ফকিরও বলেছেন,

'মরার আগে মলে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশীদ ধরে জানতে হয়॥'

[পঞ্চতন্ত্র প্রথম খণ্ড—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আব্‌সুর্ডুম!

গিয়ে দেখলুম ক্লাবের প্রত্যন্ত প্রদেশে সেই নিমগাছের তলায় চীনা বন্ধু, গুণী অধ্যাপক উ বসে আছেন। নিমপাতা এখন বর্ষণ রসে টেটম্বুর বলে টেবিলের উপর ঝরে পড়ে না। তাই উ বকুল ফুল দিয়ে আলপনা আঁকছেন।

আমি চীনা কায়দায় ঝুঁকে ঝুঁকে দুলতে দুলতে বললুম, 'জয় হিন্দ!'

অধ্যাপক মৃদু হাস্য করে মাথা নাড়িয়ে বললেন, "আলাইকুম সালাম, আজ তোমাদের ইদের পরব না?'

আমি বললুম, 'ছুটির বাজার, তাই আপনার কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনতে এলুম।'

'তৎপূর্বে বল, এ ফুলের নাম কি?'

মূল বক্তব্যের সঙ্গে এ প্রশ্নোত্তরের কোনো যোগ নেই তবু বাঙালীর মনে বিমলানন্দের সৃষ্টি হবে বলে নিবেদন করছি।

বললুম, 'বাঙলা, মারাঠী, সংস্কৃতে, "বকুল", হেথাকার নেটিভ ভাষাতে "মোলশী"।'*

অনেকক্ষণ ধরে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, 'বকুল, মোলশী,—মোলশী বকুল। উহুঁ, বকুলটিই মিষ্টি।' বাঙালীর ছাতি তিন বিঘৎ ফুলে উঠল তো?

আমি বললুম, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবেন তবে "প্রাণনাথ" বলে ডাকলেই পারেন।'

ভুরু কুঁচকে বললেন, 'সে আবার কি?'

'প্রাণনাথ মানে, মাই ডার্লিং।'

'আরও বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'আমি বাঙাল। আমারই দেশের এক "চুকুমবুদাই" অর্থাৎ এদিকে মুখচোরা ওদিকে চটে যায় ক্ষণে ক্ষণে, এসেছে কলকাতায়। গেছে বেগুন কিনতে। দোকানীকে বললে, "দাও তো হে, এক সের বাইগন।" দোকানী পশ্চিম বাঙলার লোক। "বেগুনে"র উচ্চারণ "বাইগন" শুনে একটুখানি গর্বের ঈষৎ মৌরী-হাসি হেসে শুধালো, "কি বললে হে জিনিসটার নাম?" বাঙাল গেছে চটে, উচ্চারণ নিয়ে যত্রতত্র এরকম ঠাট্টা-মস্করা করার মানে?—চতুর্দিকে আবার বিস্তর "ঘটি" দাঁড়িয়ে। তেড়েমেড়ে বলল, "বাইগন কইছি তো বেশ কইছি হইছে কি"?'

দোকানী আরেক দফা হাম্বড়াই আত্মম্ভরিতার মৃদু হাসি হেসে বললে, 'ছ্যাঃ, বাইগন, বাইগন। দেখো দিকিনি আমাদের শব্দটা কি রকম মিষ্টি—বেগুন, বেগুন।'

বাঙাল বলল, 'মিষ্টি নামই যদি রাখবো, তবে "প্রাণনাথ" ডাকলেই পারো। দাও তবে এক সের প্রাণনাথ। প্রাণনাথের সের কত? ছ' পয়সা না সাত পয়সা?'

উ প্রাণভরে হাসলেন উচ্চস্বরে। তারপর চোখ বন্ধ করে মিটমিটিয়ে। সর্ব শেষে চেশায়ার বেড়ালের হাসিটার মত 'আকাশে আকাশে রহিল ছড়ানো সে হাসির তুলনা।'

সুশীল পাঠক, তুমি রাগত হয়েছ, বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। এ বাসি মাল আমি পরিবেশন করছি কেন? এ গল্প জানে না কোন্ মর্কট? পদ্মার এ-পারে কিংবা হে-পারে?

তিষ্ঠ, তিষ্ঠ। এ গল্পের খেই ধরে চীনা-গুণী সেদিন তত্ত্ব বিতরণ করেছিলেন বলেই এটাকে 'এনকোর' করতে হল।

*বানানে ভুল থাকতে পারে, আমি যেরকম শুনেছি, সেই রকমই লিখলুম।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'এ গল্পে কি তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে?'

খাইছে। আমি করজোড় বললুম, 'আপনিই মেহেরবাণী করুন।'

বললেন, "রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম" কাকে বলে জানো?

আমার পেটের এলেম আপনারা বিলক্ষণ জানেন। কাজেই বলতে লজ্জা নেই, অতিশয় মনোযোগের সহিত গ্রীবাকণ্ডুয়নে নিযুক্ত হলুম।

বললেন, 'কেন। জানো না, যখন কোনো বিষয় টানাটানি করলে অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয় তখনই তাকে বলে "রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম"।'

ততক্ষণে বুঝে গিয়েছি। সোৎসাহে বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রিডাকশিও অ্যাড অ্যাবসার্ডাম।' একটুখানি গর্বের হাসিও হেসে নিলুম।

বাঁকা নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কথাটা যখন লাতিন তখন ইংরিজি উচ্চারণ করছো কেন? ইংরেজের মুখ না হলে তোমরা কোনো ঝাল খেতে পারো না বুঝি?'

'সে কথা থাক। শোনো।

'আসল কথা হচ্ছে বাঙাল দেখিয়ে দিল, মিষ্টি নামই যদি রাখবে তবে যাও একস্ট্রিমে। রাখো নাম "প্রাণনাথ"। তৎক্ষণাৎ প্রমাণ হয়ে গেল, মিষ্টত্বের দোহাই কত অ্যাবসার্ড।

'এই দেখো না, মার্কিন জাতটা কি রকম অ্যাবসার্ড। কোনো কর্মে সুনিপুণ হতে পারাটা অতীব প্রশংসনীয়। এতে সন্দেহ করবে কে? কিন্তু এরও তো একটা সীমা থাকা দরকার। গল্প দিয়ে জিনিসটে বোঝাচ্ছি।

'ব্রুকলিন ব্রিজ যখন বানানো হয় তখন দু'পাড় থেকে দু'দল লোক পুল তৈরি করে মাঝ গাঙের দিকে রওয়ানা হল। এমনি চৌকশ তাদের হিসেব, এমনি সুনিপুণ তাদের কলকব্জা যে মধ্যিখানে এসে যখন পুলের দু'দিকে জোড়া লাগল তখন দেখা গেল এক ইঞ্চির আঠারো ভাগের উঁচু-নিচুর ফেরফার হয়েছে। তারিফ করবার মত কেরদানি, কোনো সন্দ নেই।

'পক্ষান্তরে আমার স্বর্ণভূমি চীনদেশে কি হয়? দু'দল লোককে এক পাহাড়ের দু'দিকে দেওয়া হয়েছিল সুড়ঙ্গ বানানোর জন্য। এদিক থেকে এনারা যাবেন, ওদিক থেকে ওনারা আসবেন। মধ্যিখানে মিলে গিয়ে খাসা টানেল।

'কিন্তু কার্যত হল কি? দেখা গেল, ডবল সময় চলে গেল তবু মধ্যিখানে দু'দলের দেখা নেই। তারপর এক সুপ্রভাতে দু'দল বেরিয়ে এলেন দু'দিকে। মধ্যিখানে মেলামেলি, কোলাকুলি হয়নি।'

আমি চোখ টিপে ইশারায় জানালুম, এ কি রঙ্গ বুঝতে পেরেছি।

তিনি বললেন, 'আদপেই না। মার্কিনরা সুনিপুণ, সেই নৈপুণ্যের প্রসাদাৎ তারা পেল কুল্লে একখানা ব্রিজ। আর আমরা পেয়ে গেলুম, দু'খানা টানেল। লাভ কার বেশি হল বল তো।'

তাই বলি অত্যধিক নৈপুণ্য ভালো নয়।

রেডুক্‌ৎসিয়ো আড্‌ আবসুর্ডুম!'

.[পঞ্চতন্ত্র প্রথম খণ্ড—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

গল্প শুনেছি, ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন আর স্কচ এই চারজনে মিলে একটা চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করল। বন্দোবস্ত হল সবাই কিছু কিছু সঙ্গে নিয়ে আসবেন। ইংরেজ নিয়ে এল বেকন আর আণ্ডা, ফরাসী নিলে এল এক বোতল স্যাম্পেন, জর্মন নিয়ে এল ডজনখানেক সসেজ, আর স্কচম্যান—? সে সঙ্গে নিয়ে এল তার ভাইকে।

এ জাতীয় বিস্তর গল্প ইয়োরোপে আছে। স্কচদের সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলেই মনে মনে প্রত্যাশা করতে পারবেন যে গল্পটার প্রতিপাদ্য বস্তু হবে, হয় স্কচদের হাড়কিপ্‌টেমিগিরি নয় তাদের হুইস্কির প্রতি অত্যধিক দুর্বলতা। ওদিকে আবার বিশ্বসংসার জানে স্কচরা ভয়ঙ্কর গোঁড়া ক্রীশ্চান আর মারাত্মক রকমের নীতিবাগীশ (বঙ্গজ হেরম্ব মৈত্র অতুলনীয়)। তাই এই তিনগুণ মিলে গিয়ে গল্প বেরল :—

এক স্কচ পাদ্রী এসেছেন লন্ডনে, দেখা করতে গেছেন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন হৈহৈ রৈরৈ, ইলাহি ব্যাপার, পেল্লাই পার্টি, মেয়েমদ্দে গিসগিস করছে। বন্ধুর স্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁচুমাচু হয়ে পাদ্রীকে অভ্যর্থনা জানালেন। কারণ জানতেন স্কচ পাদ্রীরা এরকম পার্টি পরবের মাতলামো আদপেই পছন্দ করেন না। অথচ ভদ্রতাও রক্ষা করতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে শুধালেন,

'একটুখানি চা খাবেন?'

পাদ্রী হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'নো টী!'

আরও ভয়ে ভয়ে শুধালেন, 'কফি?'

'নো কফি!'

'কোকো?'

'নো কোকো!'

ভদ্রমহিলা তখন মরীয়া। মৃদুস্বরে কাতর কণ্ঠে শেষ প্রশ্ন শুধালেন, 'হুইস্কি সোডা?'

'নো সোডা!'

অথচ কলকাতায় একবার অনুসন্ধান করে আমি খবর পাই, যে সব ব্রিটিশ এদেশে দানখয়রাত করে গিয়েছেন তাঁদের বেশির ভাগই স্কচ্—ইংরেজের দান অতি নগণ্য। তারপর বিলেতে খবর নিয়ে জানলুম, স্কচরা হুইস্কি খায় কম, বেশির ভাগ রপ্তানি করে দেয়, আর নিজেরা খায় বিয়ার।

ঠিক সেই রকমই বিশ্বদুনিয়ার বিশ্বাসী ফরাসী জাতটা বড্ডই উচ্ছৃঙ্খল। পঞ্চমকার নিয়ে অষ্টপ্রহর বেএক্তেয়ার। তাই ইংরিজী 'ক্যারিইঙ কোল্ টু নিউ কাসলের' ফরাসী রূপ নাকি 'ক্যারিইঙ এ ওয়াইফ টু প্যারিস'।

এ প্রবাদটি আমি ফরাসী ভাষায় শুনি নি; শুনেছি ইংরেজের মুখে ইংরেজি ভাষাতে। তাই প্যারিস গিয়ে আমার জানবার বাসনা হল ফরাসীরা সত্যই উপরের প্রবাদবাক্য মেনে চলে কিনা?

খানিকটা চলে, অস্বীকার করা যায় না। যৌন ব্যাপারে ফরাসীরা বেশ উদার কিন্তু একটা ব্যাপারে দেখলুম তারা ভয়ঙ্কর নীতিবাগীশ। ফষ্টিনষ্টি তারা অনেকখানি বরদাস্ত করে—অবশ্য নিয়ম, সেটা যেন বিয়ের পূর্বে না করে পরেই করা হয়—কিন্তু সেই ফষ্টিনষ্টি যদি এমন চরমে পৌঁছয় যে স্ত্রী স্বামীকে কিংবা স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তবে ফরাসী মেয়েমদ্দ দু'দলই চটে যায়। 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠানটিকে ফরাসী জাত

বড়ই সম্ভ্রমের সঙ্গে মেনে চলে। তাই পরকীয়া প্রেম যতই গভীর হোক না কেন, তারই ফলে যদি কোনো পরিবার ভেঙে পড়ার উপক্রম করে তবে অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, নাগর-নাগরী একে অন্যকে ত্যাগ করেছেন।

কাজেই মেনে নিতে হয়, এ-ব্যাপারে ফরাসীদের যথেষ্ট সংযম আছে।

ঈষৎ অবান্তর, তবু হয়ত পাঠক প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে এই যে শুনতে পাই প্যারিসে হরদম ফুর্তি সেটা কি তবে ডাহা মিথ্যে?

নিশ্চয়ই নয়। প্যারিসে ফুর্তির কমতি নেই। কিন্তু সে ফুর্তিটা করে অফরাসীরা। যৌন ব্যাপারে ইংরেজের ভণ্ডামি সকলেই অবগত আছেন—লরেন্‌স্‌ সেটা বিশ্বসংসারের কাছে গোপন রাখেন নি। তাই ইংরেজ মোকা পেলেই ছুটে যায় প্যারিসে। পাড়াপ্রতিবেশী তো আর সেখানে সঙ্গে যাবে না—বেশ যাচ্ছেতাই করা যাবে। শুধু ইংরেজ নয়, আরও পাঁচটা জাত আসে, তবে তারা আসে খোলাখুলি সরাসরিভাবে—ইংরেজের মত 'ফরাসী আর্ট' দেখার ভান করে না। কোন জর্মনকে যদি বার্লিনে শুনতে পেতুম বলছে, 'ভাই, হপ্তাখানেকের জন্য প্যারিস চললুম' তখন সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেতুম আর পাঁচজন মিটমিটিয়ে হাসছে—অবশ্য প্রথম জর্মনও সে হাসিতে যোগ দিতে কসুর করছে না।

তা সে যাই হোক, একটা প্রবাদ আমি বিশ্বাস করি। ফরাসীরা বলে, 'পারফিডিয়স অ্যালবিয়ন' অর্থাৎ 'ভণ্ড ইংরেজ'। একটি গল্প শুনুন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগার খবর শুনে এক বুড়ো শিখ মেজর জিজ্ঞেস করলেন, 'কে কার বিরুদ্ধে লড়ছে?'

'ইংরেজ-ফরাসী জর্মনির বিরুদ্ধে।'

সর্দারজী আপসোস করে বললেন, 'ফরাসী হারলে দুনিয়া থেকে সৌন্দর্যের চর্চা উঠে যাবে আর জর্মনি হারলেও বুরি বাত, কারণ জ্ঞানবিজ্ঞান কলকৌশল মারা যাবে।' কিন্তু ইংরেজরা হারা সম্বন্ধে সর্দারজী চুপ।

'আর যদি ইংরেজ হারে?'

সর্দারজী দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তবে দুনিয়া থেকে বেইমানি লোপ পেয়ে যাবে।'

[পঞ্চতন্ত্র প্রথম খণ্ড—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

আমরা হাসি কেন?

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কবিগুরু বিশ্বভারতী সাহিত্য-সভায় এক খ্যাতনামা লেখকের সদ্য-প্রকাশিত একটা রচনা পাঠ করেন। রচনার আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, 'আমরা হাসি কেন?'

এতদিন বাদে আজ আর সব কথা মনে নেই, তবে এইটুকু স্পষ্ট স্মরণে পড়ছে যে, বের্গসন হাসির কারণ অনুসন্ধান করে যে সব তত্ত্বকথা আবিষ্কার করেছিলেন, প্রবন্ধটি মোটের উপর তারই উপর খাড়া ছিল।

প্রবন্ধ পাঠের পর রবীন্দ্রনাথ আপন বক্তব্য বলেন।

সভায় উপস্থিত অন্যান্য গুণীরাও তখন নানারকম মতামত দেন এবং সবাই মিলে প্রাণপণ অনুসন্ধান করেন, 'আমরা হাসি কেন?' যতদূর মনে পড়ছে, শেষ পর্যন্ত সর্বজনগ্রাহ্য কোনো পাকাপাকি কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন সভার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'হাসির কারণ বের করতে গিয়ে সকলের চোখের জল বেরিয়ে গিয়েছিল।' (ঠিক কি ভাষায় তিনি জিনিসটে রসিয়ে বলেছিলেন আজ আর আমার সম্পূর্ণ মনে নেই—আশা করি আচার্য অপরাধ নেবেন না)।

* * *

দিল্লীর ফরাসিস ক্লাবের ('সের্কল ফ্রাসেঁ' অর্থাৎ 'ফরাসী-চক্র') এক বিশেষ সভায় মসিয়ে মার্তে নামক এক ফরাসী গুণী গত বুধবার দিন ঐ একই বিষয় নিয়ে অর্থাৎ 'আমরা হাসি কেন?' একখানি প্রামাণিক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

ফরাসী রাজদূত এবং আরও মেলা ফরাসী-জাননেওয়ালা ফরাসী অ-ফরাসী ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন। ফরাসী কামিনীগণ সর্বদাই অত্যুত্তম সুগন্ধ ব্যবহার করেন বলে ক্ষণে ক্ষণে মনে হচ্ছিল আমি বুঝি প্যারিসে বসে আছি।

(এ কিছু নূতন কথা নয়—এক পূর্ববঙ্গবাসী শিয়ালদা স্টেশনে নেমেও গেয়েছিলেন,—

ল্যামা ইসটিশানে গাড়ির থনে
মনে মনে আমেজ করি
আইলাম বুঝি আলী-মিয়ার রঙমহলে
ঢাহা জেলায় বশ্যাল ছাড়ি।)

শুধু প্যারিস নয় আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন 'কোতি', 'উবিগাঁর' খুশবায়ের দোকানে বসে আছি।

ডাঃ কেসকর উত্তম ফরাসী বলতে পারেন। তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করে প্রাঞ্জল ফরাসীতে বক্তার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বের্গসন আর সেই চিরন্তন কারণানুসন্ধান, 'হাসি কেন'? আমি তো নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলুম—ত্রিশ বৎসর পূর্বে যেরকমধারা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কোনো হদিস মিলল না।

কিন্তু সেইটে আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, এই দিল্লী শহর যে ক্রমে ক্রমে আন্তর্জাতিক মহানগরী হতে চলল সেইটেই বড় আনন্দের কথা।

এতদিন ধরে আমরা ইয়োরোপকে চিনতে শিখলুম ইংরেজের মাধ্যমে এবং তাতে করে মাঝে মাঝে আমরা যে মারাত্মক মার খেয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ এখনো আরম্ভ হয় নি। একটা সামান্য উদাহরণ নিন।

ইংরেজের আইরিশ স্টু, মাটন রোস্ট আর প্লাম পুডিং খেয়ে খেয়ে আমরা ভেবেছি ইয়োরোপবাসী মাত্রই বুঝি আহারাদি বাবতে একদম হটেনটট। তারপর যেদিন উত্তম ফরাসী রান্না খেলুম, তখন বুঝতে পারলুম, ক্রোয়াসা রুটি কি রকম উপাদেয়, একটি মামুলী অমলেট বানাতে ফরাসী কতই না কেরদানি-কেরামতি দেখাতে পারে, পাকা টমাটো, কাঁচা শসা আর সামান্য লেটিসের পাতাকে একটুখানি মালমশলা লাগিয়ে কী অপূর্ব স্যালড্ নির্মাণ করতে পারে। মাস্টার্ড, উস্টারসস আর বিস্তর গোলমরিচ না মাখিয়েও যে ইয়োরোপীয় রান্না গলাধঃকরণ করা যায় সেইটি হৃদয়ঙ্গম হল ফরাসী রান্না খেয়ে।

তাই আমার আনন্দ যে, ধীরে ধীরে একদিন ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের মোলাকাত এ-দেশে বসেই হবে।

সের্কল ফ্রাসেঁ দিল্লীবাসীকে তার জন্য তৈরি করে আনছেন।

* * *

প্রবন্ধ পাঠের পর মসিয়ো মার্তে কয়েকটি রসালো গল্প বলেন। তিনি যে অনবদ্য ভাষায় এবং তার সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি সঞ্চালনে গল্পগুলো পেশ করেছিলেন সে জিনিস তো আর কালি-কলমে ওতরাবে না—তাই গল্পটি পছন্দ না হলে মসিয়োর নিন্দা না করে দোষটা আমারই ঘাড়ে চাপাবেন।

এক রমণী গিয়েছেন এক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে। তিনি ডাক্তারের ঘরে ঢুকতেই ডাক্তার তাঁকে কোনো কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই আধঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতে লাগলেন। অতি কষ্টে সুযোগ পাওয়ার পর রমণী বললেন, 'ডাক্তার, আমাকে অতশত বোঝাচ্ছেন কেন? আমি এসেছি আমার স্বামীর চিকিৎসা করাতে।'

ডাক্তার বললেন, 'ও! তাঁর কি হয়েছে?'

রমণী বললেন, 'ঠিক ঠিক বলতে পারব না তবে এইটুকু জানি, তাঁর বিশ্বাস তিনি সীল মাছ।'

'বলেন কি? তা তিনি এখন কোথায়?'

'তিনি বারান্দায় বসে আছেন।'

'তাঁকে নিয়ে আসুন তো, দেখি ব্যাপারটা কি।'

ভদ্রমহিলা বাইরে গিয়ে সঙ্গে নিয়ে এলেন একটা সীল মাছ।

[ময়ূরকণ্ঠী—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

দরখাস্ত

এই মাত্র কয়েকদিন পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে। আমার এক বন্ধুপুত্র ঝাড়া তেরোটি বচ্ছর কাজ করার পর মিন্ নোটিশে চাকরি হারাল। টাইপ করা একখানা কাগজ হাতে তুলে দিল, তার সারমর্ম—তোমাকে দিয়ে আমাদের আর কোনো প্রয়োজন নেই, কেটে পড়ো।

চোদ্দ বছর পর চাকরি গেলে খুব আশ্চর্য হতুম না। কারণ আজকাল যাবৎজ্জীবন দ্বীপান্তর অর্থাৎ চোদ্দ বছর। তারপর মুক্তি। ঠিক সেইরকম আমার এক ফরাসী-বন্ধু তাঁর সিলভার ওয়েডিঙের পরবে আমায় শুধোলেন, আমাদের দেশে, জেলে ম্যাক্সিমাম ক'বছর পুরে রাখে? আমি ঐ উত্তর দিলে তিনি বললেন, 'তবে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না কেন?'

আমি শুধালুম 'কিসের থেকে?'

কড়ে আঙুল দিয়ে সন্তর্পণে বউকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ যে, ওর সঙ্গে পঁচিশটি বৎসর বন্দী হয়ে কাটালুম। এখনো কি মুক্তি পাবো না?'

উল্টোটাও শুনেছি। এক ইংরেজকে শুধিয়েছিলুম—নিজে বিয়ে করতে যাবার ঠিক আগের দিন—ওদের বিবাহিত জীবনের কাহিনী শোনাতে। বললেন, 'বিয়ের চোদ্দ বছর পর একদিন বউকে একটুখানি সামান্য কড়া কথা বলতেই সে ডান ভুরুটি একটু উপরের দিকে তুলে শুধলো, "ডার্লিং! তবে কি আমাদের হানি-মুন শেষ হয়ে গেল?" ইংরেজ একটু থেমে বললেন, 'ঐ আমার আক্কেল হয়ে গেল। এরপর আর কক্খনো রা-টি পর্যন্ত কাড়িনি।' তারই কিছুদিন পর তাঁর যমজ সন্তান হলে পর আমি তাঁকে বলেছিলুম, 'চীনা ভাষায় প্রবাদ আছে "যে লোক মোমবাতির খর্চা বাঁচাবার জন্য সন্ধ্যার সময়েই শুয়ে পড়ে তার যমজ সন্তান হয়।" ইংরেজ সেয়ানা; সঙ্গে সঙ্গে সক্কলকে একটা রাউন্ড খাইয়ে দিলে।'

এ বাবদে আমাকে লাখ কথার সেরা কথা শুনিয়েছেন আমাদের রাষ্ট্রপতি—তখন অবশ্য তিনি কাশীতে সাদামাটা অধ্যাপক—জুলুদের অভিধানে নাকি স্বামীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকার জংলী পশু যাকে স্ত্রী পোষ মানায়।'

এবং দুই এক্সট্রিম সদাই মিলে যায় বলে অভিজাত চীনাদের অভিধানে লেখকের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, 'এক প্রকারের বন্যজন্তু যাকে সম্পাদক পোষ মানায়।'

গেল চোদ্দটি বছর ধরে বঙ্গদেশের সম্পাদক তথা প্রকাশককুল আমাকে পোষ মানাবার চেষ্টা করেছেন। আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু এখন তাঁরা আর আমাকে ছাড়তে চায় না। উত্তম শায়েস্তাপ্রাপ্ত কয়েদীকে জেলার ছাড়তে চায় না। বাড়ির এডা-সেডা করে দেয়—অথচ তাকে মাইনে দিতে হয় না।

আমি কিন্তু মহারানীর কাছে আপিল করেছি—'চোদ্দ বছর পূর্বে ঠিক ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে আমার প্রথম বই বেরোয়। আজ ১৯৬৪, আমার ছুটি মঞ্জুর হোক।'

কুকর্ম করে মানুষ জেলে যায়। আমিও কুমতলব নিয়ে লেখক হয়েছিলুম।

সাধারণের বিশ্বাস, লেখকের কর্তব্য পাঠককে পরিচিত করে দেবে বৃহত্তম চিন্তাজগতের সঙ্গে, তাকে উদ্বুদ্ধ করবে মহান আদর্শের পানে, প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক জেরোম কে জোরোমের ভাষায়, তাকে 'এলিভেট' করবে। এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, 'মাই বুক উইল নট এলিভেট ঈভন্ এ বাউ।'

লেখকের কর্তব্য যদি পাঠককে মহত্তর করে তোলাই হয়, তবে নিঃসন্দেহে কুমতলব নিয়েই আমি সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলুম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, অর্থলাভ।

মহাকবি হাইনে একাধিকবার বলেছেন—তাই তাঁকে একাধিকবার উদ্ধৃত করতে আপত্তি নেই—'কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝি নে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে তখনই বুঝেছি।' আমার বেলা আর চেয়েও সরেস। আমার হাতে অর্থ কখনোই আসেনি। কাজেই মূল্য বোঝা না-বোঝার কোন প্রশ্নই ওঠে নি। আমি চিরটা কাল, 'খেয়েছি লঙ্গরখানায়, ঘুমিয়েছি মস্‌জিদে'! কাজেই বছরটা আঠারো মাসে যাচ্ছিল।

এমন সময় লঙ্গরখানা বন্ধ হয়ে গেল। আমাকে যিনি পুষতেন তিনি আল্লার ডাক শুনে ওপারে চলে গেছেন। বেহশ্‌তে গিয়েছেন নিশ্চয়ই; কারণ আমাকে নাহক পোষা ছাড়া অন্য কোনো অপকর্ম (গুনাহ্‌) তিনি করেননি।

মাত্র কিছুদিন পূর্বে ঈভনিং স্ট্যান্ডার্ডে বেরিয়েছে, ফ্লেমিঙের মৃত্যুর পর তাঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে যাতে আছে 'আন্‌অ্যাশেমডলি আই অ্যাডমিট—আই রাইট ফর্‌ মানি।'

এরপর যে সব পূর্বসূরিগণ নিছক অর্থের জন্যই লিখনবৃত্তি গ্রহণ করেন তাঁদের নাম করতে গিয়ে বাল্‌জাক্‌, ডিকেন্স, স্কট, ট্রলোপের নাম করেছেন।

এই প্রবন্ধটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন মিঃ কাউলি। তিনি তারপর আপন মন্তব্য জুড়েছেন, 'কিন্তু এখানেই থেমে যাওয়া কেন?' বস্‌ওয়েলের লেখা যাঁরা স্মরণে রাখেন তাঁরাই মনে করতে পারবেন, ডঃ জনসনও এ-বাবদে কুহকাচ্ছন্ন ছিলেন না, 'নিত্যন্ত গাড়োল (block-head) ভিন্ন অন্য কেউ অর্থ ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে না'—এই ছিল সেই মহাপুরুষের সুচিন্তিত অভিমত।

অবশ্য তার চেয়েও বড় গাড়োল, যে টাকার জন্য লিখেও টাকা কামাতে পারলো না।

আমি ডঃ জনসনের পদধূলি হওয়ার মতও স্পর্ধা ধরি নে; অতএব তাঁর মত কটুভাষা ব্যবহার না করে, অর্থাৎ কে কোন্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখে, সেই অনুযায়ী কে পাঁঠা, কে গোলাপফুল সে আলোচনা না করে শুধু বলবো আমি স্বয়ং লিখেছি, নিছক টাকার জন্য।

আমার বয়েস যখন উনিশটাক তখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাকে একদিন বললেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর্‌। আর দেখ্‌, লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।'

আমার অর্থাভাব তিনি জানতেন; তদুপরি আমার হাত দিয়ে কেউ যেন তামাক না খায়, অর্থাৎ আমাকে exploit না করে। তিনি একদা উত্তমরূপেই জমিদারী চালিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু কষ্টেশ্রেষ্ঠে দিন চলে যাচ্ছিল তাই বাগ্দেবীকে বানরীর মত ঘাগরা পরিয়ে ঘরে ঘরে নাচতে হল না (এটি বিদ্যাসাগর মশাই দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন, অস্য দগ্ধ উদরস্যার্থে কিং কিং ন ক্রিয়তে ময়া। বানরীমিব বাগ্দেবীং নর্তয়ামি গৃহে।)

আমি শান্তিনিকেতন ছাড়ি ১৯২৬-এ। ১৯৩৮-এ গুরুদেবকে প্রণাম করতে এলে তিনি জানতে চাইলেন, আমি কোনো লেখা ছাপাচ্ছি না কেন? উত্তরে কি বলেছিলুম সেটা আর এখানে বলে কাজ নেই।

কায়ক্লেশে চলে গেল ১৯৪৯ পর্যন্ত। লঙ্গরখানা (অর্থাৎ ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্ট-মস্‌জিদে) বন্ধ হয়ে গেল তখন; যেটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

সর্বশ্রেষ্ঠ না হলেও পৃথিবীতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অপ্‌রা কম্পজিস্ট রস্‌সীনি বলতেন, 'আমি ছেলেবেলা থেকেই জানতুম, অর্থের প্রয়োজন আছে। কিন্তু দেখলুম, এক অপ্‌রা কম্পোজ করা ভিন্ন অন্য কোনো এলেম্‌ আমার পেটে নেই। সেই করে টাকা হয়েছে যথেষ্ট। এখন আর কম্পোজ করবো কোন্‌ দুঃখে!' খ্যাতির মধ্যগগনে, যৌবনে, তিনি এই আপ্তবাক্যটি ছাড়েন।

তারপর তিনি বোধ হয় আরও দুটি অপ্‌রা তৈরি করেন—একবার নিতান্ত বাধ্য হয়ে, প্রায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য, ও আরেকবার একজনকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য।

রস্‌সীনির তুলনায় আমি কীটস্য কীট। কিন্তু আমি দেখলুম, ঐ এক বই লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে পয়সা কামাবার মত বিদ্যে আমার ব্রেনবাক্সে নেই। আশ্চর্য, তারপর একটা চাকরি পেয়ে গেলুম। কাজেই লেখা বন্ধ করে দিলুম। চাকরি ইস্তফা দিলুম। ফের কলম ধরতে হল। ফের চাকরি। ফের কলম। ফের চাকরি, ফের—ইত্যাদি।

আমার লেখা অল্প লোকেই পড়েন, আমার জীবন এমন কিছু একটা নয় যা নিয়ে লোকের কৌতূহল থাকতে পারে। তবু যাঁরা নিতান্তই 'নোজী' (পীপিং টম্—নোজী পার্কার) তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন, যখন আমার চাকরি থাকে, তখন আমি লিখি না।

একবার ফ্রান্সে ঢোকবার ফর্মে প্রশ্ন ছিল—'তোমার জীবিকা নির্বাহের উপায় কি?'

উত্তরে লিখেছিলম, 'কিছুদিন অন্তর অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া (রিজাইনিং জব্ ফ্রম্ টাইম টু টাইম)।'

ফরাসী শুধালে, 'তাহলে চলে কি করে?'

বললুম, 'তুমি রেজিগনেশনগুলো দেখছো; আমি জব্‌গুলো দেখছি।'

পেটের দায়ে লিখেছি মশাই, পেটের দায়ে। বাংলা কথা স্বেচ্ছায় না লেখার কারণ—

(১) আমার লিখতে ভাল লাগে না। আমি লিখে আনন্দ পাই নে।

(২) এমন কোনো গভীর, গূঢ় সত্য জানি নে যা না বললে বঙ্গভূমি কোনো এক মহাবৈভব থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৩) আমি সোসাল রিফর্মার বা প্রফেট নই যে দেশের উন্নতির জন্য বই লিখব।

(৪) খ্যাতিতে আমার লোভ নেই। যেটুকু হয়েছে, সেইটেই প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে। নাহক্ লোকে চিঠি লিখে জানতে চায়, আমি বিয়ে করেছি কিনা, করে থাকলে সেটা প্রেমে পড়ে না কোল্ড ব্লাডেড, যে রকম কোল্ড ব্লাডেড খুন হয়—অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন ঠিক করে দিয়েছিলেন কিনা? শব্‌নমের সঙ্গে আমার আবার দেখা হল কিনা, 'চাচা'টি কে, আমি আমার বউকে ডরাই কিনা—ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং কেউ কেউ আসেন আমাকে দেখতে। এখানকার বাঘ সিঙ্গি নন্দলাল, সুধীরঞ্জনকে দেখার পর আমার মত খাটাশ্‌টাকেও একনজর দেখে নিতে চান। কারণ কলকাতায় ফেরার ট্রেন সেই বিকেল পাঁচটায়; ইতিমধ্যে আর কি করা যায়। এবং এসে রীতিমত হতাশ হন। ভেবেছিলেন দেখবেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মত সুপুরুষ সৌম্যদর্শন নাতিবৃদ্ধ এক ভদ্রজন লীলাকমল হাতে নিয়ে সুদূর মেঘের পানে তাকিয়ে আছেন; দেখেন বাঁধিপোতার গামছা পরা, উত্তমার্ধ অনাবৃত, বক্ষে ভাল্লুকের মত লোম, মাথা-জোড়া-টাক—ঘনকৃষ্ণ ছ্যাবড়া ছ্যাবড়া রঙ, সাতদিন খেউরি হয় নি বলে মুখটি কদমফুল,—হাতলভাঙা পেয়ালায় করে চা খাচ্ছে আর বিড়ি ফুঁকছে।

আমি রীতিমত নোটিশ দিয়ে লেখা বন্ধ করেছি। গত বৎসর মে মাসে আমি 'দেশ' পত্রিকা মারফত সেটা জানিয়ে দিয়েছিলুম। কেউ কেউ আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন —তাঁদের স্নেহ পেয়ে ধন্য হয়েছি। তারপরও দু-একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। দাদন শোধের জন্য।

আর কখনো লিখব না, একথা বলছি নে। চাকরি গেলেই লিখব। খেতে পরতে তো হবে।

[বড়বাবু—রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড]

ত্রিমূর্তি (চাচা-কাহিনী)

বার্লিন শহরের উলান্ড স্ট্রীটের উপর ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে 'হিন্দুস্থান হৌস' নামে একটি রেস্তোরাঁ জন্ম নেয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর যা স্বভাব, রেস্তোরাঁর সুদূরতম কোণে একটি আড্ডা বসে যায়। আড্ডার চক্রবর্তী ছিলেন চাচা—বরিশালের খাজা বাঙাল মুসলমান—আর চেলারা গোসাঁই, মুখুয্যে, সরকার, রায় এবং চ্যাংড়া গোলাম মৌলা, এই ক'জন।

চাচার ন্যাওটা শিষ্য গোসাঁই বললেন, 'যা বলো, যা কও, চাচা না থাকলে আমাদের আড্ডাটা কি রকম যেন দরকচ্চা মেরে যায়। তা বলুন, চাচা, দেশের—না, দ্যাশের—খবর কি? কি খেলেন, কি দেখলেন, বেবাক কথা খুলে কন।'

চাচা বরিশাল গিয়েছিলেন। তিন মাস পরে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'কি খেলুম? কই মাছ—এক-একটা ইলিশ মাছের সাইজ; ইলিশ মাছ—এক-একটা তিমি মাছের সাইজ; আর তিমি মাছ—তা সে দেখি নি। তবে বোধ হয়, তাবৎ বাখরগঞ্জ ডিসটিক্‌টাই তারই একটার পিঠের উপর ভাসছে। ঐ যেরকম সিন্দবাদ তিমির পিঠটাকে চর ভেবে তারই পিঠের উপর রশুই চড়িয়েছিল।'

বাকি কথা শেষ হওয়ার পূর্বে সক্কলের দৃষ্টি চলে গেল দোরের দিকে। দুটি জর্মন চ্যাংড়া একটি চিংড়িকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল। ভারতীয় রান্নার ঝালের দাপটে জর্মনরা সচরাচর হিন্দুস্থান হৌসে আসতো না। পাড়ার জর্মনরা তো আমাদের লঙ্কা-ফোড়ন চড়লে পয়লা বিশ্বযুদ্ধের ডিসপোজেলের গ্যাসমাস্‌ক পরতো। তবে দু'একজন যে একেবারেই আসতো না তা নয়—'ইন্ডিশে রাইস-কুরি' অর্থাৎ ভারতীয় ঝোল-ভাতের খুশবাই জর্মনি হাঙ্গেরি সর্বত্রই কিছু কিছু পাওয়া যায়।

আলতো ভাবে ওদের উপর একটা নজর বুলিয়ে নিয়ে আড্ডা পুনরায় চাচার দিকে তাকাল। চাচা বললেন, 'খাইছে! আবার সেই ইটারনেল্ ট্রায়েঙ্গল্!'

পাইকিরি বিয়ার খেকো সুয্যি রায় বললে, 'চাচা হরবকতই ট্রায়েঙ্গল্ দেখেন। এ যেন ঘামের ফোঁটাতে কুমীর দেখা। দ্য ত্রো নিয়ে কি কেউ কখনো বেরয় না?'

রায়ের গ্রাম সম্পর্কে ভাগ্নে, সতেরো বছরের চ্যাংড়া সদস্য লাজুক গোলাম মৌলা শুধালে, 'মামু, দ্য ত্রো কারে কয়?'

রায় বললেন, 'পই পই করে বলেছি ফরাসী শিখতে, তা শিখবি নি। ডি, ই দ্য; টি, আর, ও, পি ত্রো—পি সাইলেন্ট। অর্থাৎ একজন অনাবশ্যক বেশি—One too many। এই মনে কর্, তুই যদি তোর ফিয়াঁসেকে—এ কথাটাও বোঝাতে হবে নাকি?—নিয়ে বেরোস আর আমি খোদার-খামোখা তোদের সঙ্গে ছুটে যাই, তবে আমি দ্য ত্রো। বুঝলি?'

গোলাম মৌলা মাথা নিচু করে সেই বার্লিনের শীতে বরাব্বর লজ্জায় ঘামতে লাগলো।

আড্ডার লটবর লেডি-কিলার পুলিন সরকার মৌলাকে ধমক দিয়ে বললে, 'তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন রে বুড়বক্? লজ্জা পাবেন রায়। ডাণ্ডা-গুলি খেলার সময় গুলিকে ভয় দেখাস্ নি ডাণ্ডাকে না ছোঁবার জন্য? তখন কি বলিস? ভাগ্নে-বৌ দুয়ারে—কোণা কেটে ফালদি যা। বরঞ্চ সুয্যি রায় যদি তাঁর ম্যাডামকে নিয়ে বেরোন, আর তুই যদি সঙ্গে জুটে যাস, তবু কিন্তু তুই দ্য ত্রো নস্। রাধা কেষ্টর কি হন জানিস তো?'

গোলাম মৌলা এবার লজ্জায় জল না হয়ে একেবারে পানি।

গোসাঁই বললেন, 'চাচা, আপনি কিন্তু যেভাবে ঘন ঘন মাথা দোলাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে, আপনি একদম শোয়ার, এ হচ্ছে দুটো-হুনো-একটা-মেনীর ব্যাপার। তা কি কখনো হওয়া যায়?'

চাচা বললেন, 'যায়, যায়, যায়। আকছারই যায়। অবশ্য প্র্যাক্‌টিস থাকলে।'

আড্ডা সমস্বরে বললে, 'প্র্যাক্‌টিস!'

চাচা বললেন, 'হ্। এবারে দেশে যাবার সময় জাহাজে হয়েছে।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আড্ডা আসন জমিয়ে বললে, 'ছাড়ুন চাচা।'

চাচা বললেন, 'এবার দেখি, জাহাজ ভর্তি ইহুদির পাল। জর্মনি, অস্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া থেকে ঝেঁটাই করে সবাই যাচ্ছে শাংহাই। সেখানে যেতে নাকি ভিজার প্রয়োজন হয় না। কি করে টের পেয়েছে, এবারে হিটলার দাবড়াতে আরম্ভ করলে নেবুকাডনাজারের বেবিলোনিয়ান ক্যাপটিভিটি নয়, এবারে স্রেফ কচু-কাটার পালা। তাই শাংহাই হয়ে গেছে ওদের ল্যান্ড অব মিলক্ অ্যান্ড হানি, ননীমধুর দেশ।

আমার ডেক-চেয়ারটা ছিল নিচের তলা থেকে ওঠার সিঁড়ির মুখের কাছে। ডাইনে এক বুড়ো ইহুদি আর বাঁয়ে এক ফরাসী উকিল। ইহুদি ভিয়েনার লোক, মাতৃভাষা জর্মন, ফরাসী জানে না। আর ফরাসী উকিল জর্মন জানে না, সে তো জানা কথা। ফরাসী ভাষা ছাড়া পৃথিবীতে অন্য ভাষা চালু আছে সে তত্ত্ব জাহাজে উঠে সে এই প্রথম আবিষ্কার করলে। এতদিন তার বিশ্বাস ছিল, পৃথিবীর আর সর্বত্র ভাঙা-ভাঙা ফরাসী, পিজিন ফ্রেঞ্চই চলে—বিদেশীরা প্যারিসে এলে যে রকম টুকিটাকি ফরাসী বলে ঐ রকম আর কি।

তিনজনাতে তিনখানা বই পড়ার ভান করে এক একবার সিঁড়ি দিয়ে উঠনেওলা নামনে-ওলা চিড়িয়াগুলোর দিকে তাকাই, তারপর বইয়ের দিকে নজর ফিরিয়ে আপন আপন সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করি।

একটি মধ্যবয়স্কা উঠলেন। জর্মন ইহুদি বললে, 'হাল্‌ব্-উন্‌ট্‌হাল্‌ব্—অর্থাৎ হাফাহাফি।' ফরাসী বললে 'অঁ প্যো আঁসিয়েন্—একটুখানি এনশেন্ট।' জর্মন আমাকে শুধালে, 'ফ্রেঞ্চি কি বললে?' 'কি বললে?' আমি অনুবাদ করলুম। জর্মন বললে, 'চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ হবে। তা আর এমন কি বয়স—নিষ্‌ট্‌ভার—নয় কি?' ফরাসী আমাকে শুধালে, 'ক্যাস্ কিল্ দি—কি বললে ও?' উত্তর শুনে বললে, 'মঁ দিয়ো—ইয়াল্লা—চল্লিশ আবার বয়স নয়! একটা কেথীড্রেলের পক্ষে অবশ্য নয়। কিন্তু মেয়েছেলে, ছোঃ!'

এমন সময় হঠাৎ একসঙ্গে তিনজনের তিনখানা বই ঠাস করে আপন উরুতে পড়ে গেল। কোর্ট মার্শালের সময় যে রকম দশটা বন্দুক এক ঝটকায় গুলি ছোঁড়ে। কি ব্যাপার? দেখ্ তো না দ্যাখ্ সিঁড়ি দিয়ে উঠলো এক তরুণী!

সে কী চেহারা! এ রকম রমণী দেখেই ভারতচন্দ্রের মুণ্ডুটি ঘুরে যায় আর মানুষে দেবতাতে ঘুলিয়ে ফেলে বলেছিলেন, 'এ তো মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়।'

ইটালীর গোলাপী মার্বেল দিয়ে কোদা মুখখানি, যেন কাজল দিয়ে আঁকা দুটি ভুরুর জোড়া পাখিটি গোলাপী আকাশে ডানা মেলেছে, চোখ দুটি সমুদ্রের ফেনার উপর বসানো দুটি উজ্জ্বল নীলমণি, নাকটি যেন নন্দলালের আঁকা সতী অপর্ণার আবক্ররেখা মুখের সৌন্দর্যকে দু'ভাগ করে দিয়েছে, ঠোঁট দুটিতে লেগেছে গোলাপ ফুলের পাপড়িতে যেন বসন্তের মৃদু পবনের ক্ষীণ শিহরণ।

চাচা বললেন, 'তা সে যাক্ গে। আমার বয়সে হয়েছে। তোদের সামনে সব কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অপূর্ব, অপূর্ব।'

দেখেই বোঝা যায়, ইহুদি—প্রাচ্য প্রতীচ্য উভয় সৌন্দর্যের অদ্ভুত সম্মেলন।

জর্মন এবং ফরাসী দুজনাই চুপ। আম্মো।

আর সঙ্গে সঙ্গে দুটি ছোকরা জাহাজের দু'প্রান্ত থেকে চুম্বকে টানা লোহার মত তার গায়ের দু'দিকে যেন সেঁটে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এতক্ষণ ধরে দু'জনাই তার পদধ্বনির প্রতীক্ষায় ছিল।

জাহাজে প্রথম দু'একদিন ঠিক আঁচা যায় না, শেষ পর্যন্ত কার সঙ্গে কার পাকাপাকি দোস্তী হবে। কোন্ মসিয়ো কোন্ মাদ্‌মোয়াজেলের পাল্লায় পড়বেন, কোন্ হ্যার্ কোন্ ফ্রাউ বা ফ্রলাইনের প্রেমে হাবুডুবু খাবেন, কোন্ মিসিস কোন্ মিস্টারের সঙ্গে রাত তেরোটা অবধি খোলা ডেকে গোপন প্রেমালাপ করবেন। এ তিনটির বেলা কিন্তু সবাই বুঝে গেল এটা ইটার্নাল্ ট্রায়েঙ্গল। আমি অবশ্য গোসাঁইয়ের মত প্রথমটায় ভাবলুম, হার্মলেস ব্যাপারও হতে পারে।

মেয়েটা ফরাসিস, ছেলে দুটোর একটা মারাঠা, আরেকটা গুজরাতি বেনে। প্যারিস থেকেই নাকি রঙ্গরস আরম্ভ হয়েছে। বোম্বাই অবধি গড়াবে। উপস্থিত কিন্তু আমাদের তিনজনারই মনে প্রশ্ন জাগলো, আখেরে জিতবে কে?

শুনেছি, এহেন অবস্থায় দুজনাই স্পানিয়াড হলে ডুয়েল লড়ে, ইতালীয় হলে একজন আত্মহত্যা করে, ইংরেজ হলে নাকি একজন অন্যকে গম্ভীর ভাবে স্টিক বাও করে দু'দিকে চলে যায়, ফরাসী হলে নাকি ভাগাভাগি করে নেয়!

প্রথম ধাক্কাতেই গুজরাতি গেলেন হেরে। মারাঠা চালাকি করে ডবল পয়সা খর্চা করে দু'খানি ডেক-চেয়ার ভাড়া করে রেখেছিল পাশাপাশি। বেনের মাথায় এ বুদ্ধিটা খেললো না কেন আমরা বুঝে উঠতে পারলুম না। মারাঠা নটবর সেই হুরীকে নিয়ে গেল জোড়া ডেক-চেয়ারের দিকে—স্যর ওয়ালটর রেলে যে রকম রানী ইলিজাবেথকে কাদার উপর আপন জোব্বা ফেলে দিয়ে হাত ধরে ওপারের পেভমেন্টে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দুজনা লম্বা হলেন দুই ডেক-চেয়ারে। বেনেটা ক্যাবলাকান্তের মত সামনে দাঁড়িয়ে খানিকটা কাঁই-কুঁই করে কেটে পড়লো!

আমার পাশের ফরাসী বলল, 'ইডিয়ট!' জর্মন শুনে বললে, 'নাইন, আখেরে জিতবে বেনে।' 'এ্যাপসিব্‌ল্!' 'বেট্?' 'বেট্!' 'পাঁচ শিলিঙ?' 'পাঁচ শিলিঙ?'

আড্ডার দিকে ভালো করে একবার তাকিয়ে নিয়ে চাচা বললেন, বিশ্বাস করো আর নাই করো, আস্তে আস্তে জাহাজের সবাই লেগে গেল এই বাজি ধরাধরিতে। বুকিরও অভাব হল না। আর সে বেট্ কী অদ্ভুত ফ্লাক্‌চুয়েট করে। কোনোদিন ভোরে এসে দেখি জর্মনটা গুম হয়ে বসে আছে—যেন জাহাজ একটা কনসান্‌ট্রেশন ক্যাম্প—আর ফরাসীটা উল্লাসে ত্রিং ত্রিং করে পল্‌কা নাচ নাচছে। ব্যাপার কি? পাক্কা খবর মিলেছে, আমাদের পরীটি কাল রাত দুটো অবধি মারাঠার সঙ্গে গুজুর-গুজুর করেছেন। বেনে মনের খেদে এগারোটাতেই কেবিন নেয়। ফরাসী এখন সক্কলের গায়ে পড়ে থ্রি টু ওয়ান্ অফার করছে। সে জিতলে পাবে কুল্লে এক শিলিং, হারলে দেবে তিন শিলিং। নাও, বোঝ ঠ্যালা। আর কোনোদিন বা খবর রটে, বেনের পো জাহাজের ক্যাম্বিসের চৌবাচ্চায় হুরীর সঙ্গে দু'ঘণ্টা সাঁতার কেটেছে—মারাঠা জলকে ভীষণ ডরায়। ব্যস্, সেদিন বেনের স্টক স্কাই হাই!

ইতিমধ্যে একদিন বেনের বাজার যখন বড্ড ঢিলে যাচ্ছে তখন ঘটলো এক নবীন কাণ্ড। হুরী ও মারাঠা তো বসতো পাশাপাশি কিন্তু লাইনের সর্বশেষ নয় বলে হুরীর অন্য পাশে বসতো এক অতিশয় গোবেচারী ভালো মানুষ নিগ্রো পাদ্রী। সে গিয়ে তার ডেক-চেয়ারের সঙ্গে বেনের ডেক-চেয়ারের বদলা-বদলির প্রস্তাব করেছে। বেনে নাকি উল্লাসে ইয়াল্লা বলে আকাশ-ছোঁয়া লম্ফ মেরেছিল। বেটিঙের বাজার আবার স্টেডি হলে গেল।

ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠলো, এ বেটিঙের শেষ ফৈসালা হবে কি প্রকারে? বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থির হল, যেদিন হুরী মারাঠা কিংবা বেনের সঙ্গে তার কেবিনে ঢুকবেন সেদিন হবে শেষ ফৈসালা। যার সঙ্গে ঢুকবেন তার হবে জিত।

দু'একজন রুচিবাগীশ আপত্তি করেছিলেন কিন্তু ফরাসী উকিল হাত-পা চোখ-মুখ নেড়ে বুঝিয়ে দিল, 'C'est, c'est, এটা, এটা হচ্ছে একটা লিগাল ডিসিশন, একটা আইনত ন্যায্য হক্কের ফৈসালা। ঢলাঢলির কোনো কথাই হচ্ছে না।'

রেসের বাজি তখন চরমে। কখনো বেনে, কখনো মারাঠা। সেই যে চণ্ডুখোর গল্প বলেছিল, পাখিকে গুলি মেরে সঙ্গে সঙ্গে শিকারী কুকুরকেও দিয়েছে লেলিয়ে। তখন বুলেটে কুকুরে কী রেস্—কভী কুত্তা, কভী গুলি, কভী গুলি, কভী কুত্তা।

এমন সময় আদন বন্দর পেরিয়ে আমরা ঢুকলাম আরব সাগরে। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আঠারো হাজার টনের জাহাজকে মারলে মৌসুমী হাওয়া তার বাইশ হাজারি টনের থাবড়া। জাহাজ উঠলো নাগর বেনাগর সবাইকে নিয়ে নাগরদোলায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সী সিক্‌নেস! বমি আর বমি! প্রথম ধাক্কাতেই মারাঠা হল ঘায়েল। রেলিঙ ধরে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বের করার চেষ্টা দিয়ে টলতে টলতে চলে গেল কেবিনে। বেনের মুখে শুকনো হাসি, কিন্তু তিনিও আরাম বোধ করছেন না। পরদিন সমুদ্র ধরল রুদ্রতর মূর্তি। এবারে হুরী পড়ে রইলেন একা। তাঁর মুখও হরতালের মত হলদে। তার পরের দিন ডেক প্রায় সাফ। নিতান্ত বরিশালের পানি-জলের প্রাণী বলে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কোনোগতিকে আমি টিকে আছি আর কি! খাবার সময় পেটে যা যায় সে-সব রিটার্ন টিকিট নিয়ে মোকামে পৌঁছবার আগেই ফিরি-ফিরি করছে। হুরী নিতান্ত একা বলে ফরাসী বন্ধু তাকে আদর করে ডেকে এনে আমাদের পাশে বসালো।

সে রাত্রে জাহাজ খেলো ঝড়ের মোক্ষমতম থাবড়া। ফরাসী গায়েব। হুরী এই প্রথম ছুটে গিয়ে ধরলো রেলিঙ। আমিও এই যাই কি তেই যাই। তবু ধরলুম গিয়ে তাকে। হুরী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "কেবিন।" আমি ধরে ধরে কোনোগতিকে তাকে তার কেবিনের দিকে নিয়ে চললুম। দুজনাই টলটলায়মান। আমার কেবিনের সামনে পৌঁছতেই ঝড়ের আরেক ধাক্কায় খুলে গেল আমার কেবিনের দরজা। ছিটকে পড়লুম দুজনাই ভিতরে। কী আর করি? তাকে তুলে ধরে প্রথম বিছানায় শোয়ালুম। তারপর কেবিন-বয়কে ডেকে দু'জনাতে মিলে তাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলুম তার কেবিনে। বাপ্‌স্!'

চাচা থামলেন। একদম থেমে গেলেন।

আড্ডায় সবাই একবাক্যে শুধালে, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'কচু, তারপর আর কি?'

তবু সবাই শুধায়, 'তারপর?'

চাচা বললেন, 'এ তো বড় গেরো। তোরা কি ক্লাইমেক্‌স্ বুঝিস নে? আচ্ছা বলছি। ভোর হতেই বোম্বাই পৌঁছলুম। ডেকে যাওয়া মাত্রই সবাই আমাকে জাবড়ে ধরে কেউ

বলে ফেলিসিতাসিয়োঁ, মসিয়ো, কেউ বলে কন্‌গ্রাচুলেশনস্‌, কেউ বলে গ্রাতুলিয়েরে—দুচ্ছাই, এ সব কে? কিন্তু কেউ কিচ্ছুটি বুঝিয়ে বলে না।'

শেষটায় ফরাসী উকিলটা বললে, 'আ মসিয়ো, কী কেরদানিটাই না দেখালে। ওস্তাদের মার শেষ রাতে। মহারাষ্ট্র গুজরাত দু'জনাই হার মানলে। জিতলে বেঙ্গল! ভিভ্‌ল্য বাঁগাল! লং লিভ বেঙ্গল!'

'আমি যতই আপত্তি করি কেউ কোনো কথা শোনে না।'

'আর শুধু কি তাই? ব্যাটারা সবাই আপন আপন বাজির টাকা ফেরত পেল—বেনে কিংবা মারাঠা কেউ জেতে নি বলে। কিন্তু আমার দশ শিলিং স্রেফ বেপরোয়া মেরে দিলে। বলে কি না, আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে জিতেছি, আমার বাজি ধরার হক্ক নেই। টাকাটা নাকি তছরূপ হয়ে যায়।'

খানেকক্ষণ চুপ থেকে চাচা বললেন, 'কিন্তু সেই থেকে আমার চোখ বলে দিতে পারে ইটার্নেল ট্রায়েঙ্গল কোথায়!'

এমন সময় দুই জর্মন ছোকরায় লেগে গেল মারামারি। সেটা থামাতে গিয়ে আড্ডা সেদিন ভঙ্গ হল।

[চতুরঙ্গ—রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড]

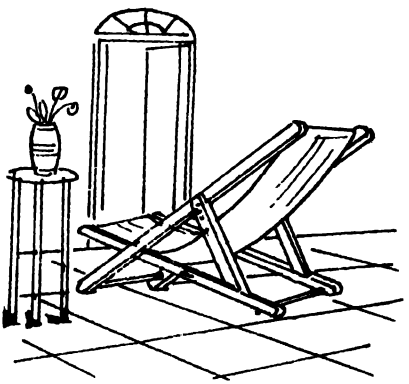

নোনাজল

সেই গোয়ালন্দ চাঁদপুরী জাহাজ। ত্রিশ বৎসর ধরে এর সঙ্গে আমার চেনাশোনা। চোখ বন্ধ করে দিলেও হাতড়ে হাতড়ে ঠিক বের করতে পারব, কোথায় জলের কল, কোথায় চা-খিলির দোকান, মুর্গীর খাঁচাগুলো রাখা হয় কোন্ জায়গায়। অথচ আমি জাহাজের খালাসী নই—অবরের-সবরের যাত্রী মাত্র।

ত্রিশ বৎসর পরিচয়ের আমার আর সবই বদলে গিয়েছে বদলায় নি শুধু ডিসপ্যাচ স্টীমারের দল। এ-জাহাজের ও-জাহাজের ডেকে-কেবিনে কিছু কিছু ফেরফার সব সময়ই ছিল, এখনও আছে, কিন্তু সব কটা জাহাজের গন্ধটি হুবহু একই। কীরকম ভেজা-ভেজা, সোঁদা-সোঁদা যে গন্ধটা আর সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে, সেটা মুর্গী-কারি রান্নার। আমার প্রায়ই মনে হয়েছে, সমস্ত জাহাজটাই যেন একটা আস্ত মুর্গী, তার পেটের ভেতর থেকে যেন তারই কারি রান্না আরম্ভ হয়েছে। এ-গন্ধ তাই চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, যে কোন স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই পাওয়া যায়। পুরনো দিনের রূপরসগন্ধস্পর্শ সবই রয়েছে, শুধু লক্ষ্য করলুম ভিড় আগের চেয়ে কম।

দ্বিপ্রহরে পরিপাটি আহারাদি করে ডেকচেয়ারে শুয়ে দূর-দিগন্তর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। কবিত্ব আমার আসে না, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য আমার চোখে ধরা পড়ে না, যতক্ষণ না রবি ঠাকুর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তাই আমি চাঁদের আলোর চেয়ে পছন্দ করি গ্রামোফোনের বাক্স। পোর্টেব্‌লটা আনব আনব করছি, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা মর্দিতা 'দেশ'—মালিক না আসা পর্যন্ত তিনি যদি পরহস্তে কিঞ্চিৎ 'ভ্রষ্টা'ও হয়ে যান, তা তাঁর স্বামী বিশেষ বিরক্ত হবেন না নিশ্চয়ই।

'রূপদর্শী' ছদ্মনাম নিয়ে এক নতুন লেখক খালাসীদের সম্বন্ধে একটি দরদ-ভরা লেখা ছেড়েছে। ছোকরার পেটে এলেম আছে, নইলে অতখানি কথা গুছিয়ে লিখল কী করে, আর এত সব কেচ্চা-কাহিনীই বা যোগাড় করল কোথা থেকে? আমি তো একখানা ছুটির আর্জি লিখতে গেলেই হিমসিম খেয়ে যাই। কিন্তু লোকটা যা সব লিখেছে, এর কি সবই সত্যি? এতবড় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে খালাসীরা লড়াই দেয় না কেন? হুঁঃ! এ আবার একটা কথা হল। সিলেট নোয়াখালির আনাড়ীরা দেবে ঘুঘু ইংরেজের সঙ্গে লড়াই...আমিও যেমন!

জাহাজের মেজো সারেঙের আজ বোধ হয় ছুটি। সিল্কের লুঙ্গি, চিকনের কুর্তা আর মুগার কাজ-করা কিস্তি টুপি পরে ডেকের ওপর টহল দিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আবার আমার দিকে আড়নয়নে তাকাচ্ছেও। ডিসপ্যাচের পুঁটি ও মানওয়ারির তিমি দুই-ই মাছ—একেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন, 'রূপদর্শী' দর্শন করেছে কতটুকু আর কল্পনায় বুনেছে কতখানি!

একটুখানি গলা খাঁকারি দিয়ে শুধালুম, 'ও সারেঙ সাহেব, জাহাজ লেট যাচ্ছে না তো?'

লোকটা উত্তর দিয়ে সবিনয়ে বলল, 'আমাকে "আপনি" বলবেন না সাহেব। আমি আপনাকে দু-একবারের বেশি দেখি নি, কিন্তু আপনার আব্বা সাহেব, বড় ভাই সাহেবেরা এ-গরিবকে মেহেরবানি করেন।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তোমার বাড়ি কোথা? বস না, তার ফুরসত নেই?' ধপ করে ডেকের উপর বসে পড়ল।

আমি বললুম, 'সে কী? একটা টুল নিয়ে এসো। এসব আর আজকাল—' কথাটি শেষ করলুম না, সারেঙও টুল আনল না। তারপর আলাপ পরিচয় হল। দ্যাশের লোক—সুখ-দুঃখের কথা অবশ্যই বাদ পড়ল না। শেষটায় মোকা পেয়ে 'রূপদর্শী দর্শন' তাকে আগাগোড়া পড়ে শোনালুম। সে গভীর মনোযোগ দিয়ে তার জাতভাই চাষারা যেরকম পুঁথিপড়া শোনে, সেরকম আগাগোড়া শুনল, তারপর খুব লম্বা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

আল্লাতালার উদ্দেশে এক হাত কপালে ঠেকিয়ে বললে, 'ইনসাফের (ন্যায়ধর্মের) কথা তুললেন, হুজুর, এ-দুনিয়ায় ইনসাফ কোথায় আর বে-ইনসাফি তো তারাই করেছে বেশি, যাদের খুদা ধনদৌলত দিয়েছেন বিস্তর, খুদাতালাই কার জন্যে কী ইনসাফ রাখেন, তাই বা বুঝিয়ে বলবে কে? আপনি সমীরুদ্দীকে চিনতেন, বহু বছর আমেরিকায় কাটিয়েছিল, অনেক টাকা কামিয়েছিল?'

আমেরিকার কথায় মনে পড়ল। 'চৌতলি পরগণায় বাড়ি, না, যেন ওই দিকেই কোন্‌খানে।'

সারেঙ বললে, 'আমারই গাঁ ধলাইছাড়ার লোক। বিদেশে সে যা টাকা কামিয়েছে ওরকম কামিয়েছে অল্প লোকই। আমরা খিদিরপুরে সইন (sign) করে জাহাজের কামে ঢুকেছিলাম—একই দিন একই সঙ্গে।'

আমি শুধালুম, 'কী হল তার? আমার ঠিক মনে পড়ছে না।'

সারেঙ বললে, 'শুনুন।'

'যে লেখাটি হজুর পড়ে শোনালেন, তার সব কথাই অতিশয় হক। কিন্তু জাহাজের কাজে, বিশেষ করে গোড়ার দিকে যে কী জান মারা খাটুনি তার খবর কেউ কখনও দিতে পারবে না যে সে জাহান্নামের ভিতর দিয়ে কখনও যায় নি। বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে কয়লা ঢালে, তার সর্বাঙ্গ দিয়ে কী রকম ঘাম ঝরে দেখেছেন। এই জাহাজেই যার দুদিক খোলা, পদ্মার জোর বাতাসের বেশ খানিকটা যেখানে স্বচ্ছন্দে বেশ আনাগোনা করতে পারে। এ তো বেহেশ্‌ৎ। আর দরিয়ার জাহাজের গর্ভের নিচে যেখানে এঞ্জিন-ঘর, তার সব দিক বন্ধ, তাতে কখনও হাওয়া-বাতাস ঢোকে না। সেই দশ বারো চৌদ্দ হাজার-টনী ডাঙর ডাঙর জাহাজের বয়লারের আকারটা কত বড় হয় এবং সেই কারণে গরমিটার বহর কতখানি, সে কি বাইরের থেকে কখনও অনুমান করা যায়? খাল বিল নদীর খোলা হাওয়ার বাচ্চা আমরা—হঠাৎ একদিন দেখি, সেই জাহান্নামের মাঝখানে, কালো-কালো বিরাট-বিরাট শয়তানের মত কলকব্জা, লোহালক্কড়ের মুখোমুখি।

'পয়লা পয়লা কামে নেমে সবাই ভিরমি যায়। তাদের তখন উপরে টেনে জলের কলের নিচে শুইয়ে দেওয়া হয়, হুঁশ ফিরলে পর মুঠো মুঠো নুন গেলান হয়, গায়ের ঘাম দিয়ে সব নুন বেরিয়ে যায় বলে মানুষ তখন আর বাঁচতে পারে না।

'কিংবা দেখবেন কয়লা ঢেলে যাচ্ছে বয়লারে ঠিক ঠিক, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, বেলচা ফেলে ছুটে চলেছে সিঁড়ির পর সিঁড়ি বেয়ে, খোলা ডেক থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে। অসহ্য গরমে মাথা বিগড়ে গিয়েছে, জাহাজী বুলিতে একেই বলে "এমখ"—'

আমি শুধালুম, 'একেই কি ইংরাজীতে বলে এমাক্ (amuck)? কিন্তু তখন তো মানুষ খুন করে।'

সারেঙ বললে, 'জী হাঁ। তখন বাধা দিতে গেলে হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে খুন করতে আসে।' তারপর একটু থেমে সারেঙ বললে, 'আমাদের সকলেরই দু-একবার হয়েছে, আর সবাই জাবড়ে ধরে চুবিয়ে আমাদের ঠাণ্ডা করেছে—শুধু সমীরুদ্দী কখ্খনো একবারের তরেও কাতর হয় নি। তাকে আপনি দেখেছেন, সায়েব? বাং মাছের মত ছিল তার শরীর, অথচ হাত দিয়ে টিপলে মনে হত কচ্ছপের খোল। জাহাজের চীনা বাবুর্চির ওজন ছিল তিন মণের কাছাকাছি—তাকে সে এক থাবড়া মেরে বসিয়ে দিতে পারত। লাঠি খেলে খেলে তার হাতে জমেছিল বাঘের থাবার তাগদ। কিন্তু সে যে ভিরমি যায় নি, "এমখ" হয় নি, তার কারণ তার শরীরের জোর নয়—দিলের হিম্মৎ—সে মন বেঁধেছিল, যে করেই হোক পয়সা সে কামাবেই, ভিরমি গেলে চলবে না, বিমারি পাকড়ানো সখ্‌ৎ মানা।'

সারেঙ বললে, 'কী বেহদ তকলীফে জানপানি হয়ে যে কুলুম শহরে পৌঁছলাম—'

আমি শুধালাম, 'সে আবার কোথায়?'

বললে, 'বাংলায় যারে লঙ্কা কয়।'

আমি বললুম, 'ও, কলম্বো!'

'জী। আমাদের উচ্চারণ তো আপনাদের মত ঠিক হয় না। আমরা বলি কুলুম শহর। সেখানে ডাঙায় বেড়াবার জন্য আমাদের নামতে দিল বটে, কিন্তু যারা পয়লা বার জাহাজে বেরিয়েছে, তাদের উপর কড়া নজর রাখা হয়, পাছে জাহাজের অসহ্য কষ্ট এড়াবার জন্যে পালিয়ে যায়। সমীরুদ্দী বন্দরে নামলেই না। বললে, নামলেই তো বাজে খরচা। আর সে-কথা ঠিকও বটে, হুজুর, খালাসীরা কাঁচা পয়সা বন্দরে যা ওড়ায়! যে জীবনে কখনও পাঁচ টাকার নোট দেখে নি, আধুলির বেশি কামায় নি, তার হাতে পনের টাকা। সে তখন কাগের বাচ্চা কেনে।

'আমরা পেট ভরে যা খুশি তাই খেলাম। বিশেষ করে শাক-সবজি। জাহাজে খালাসীদের কপালে ও জিনিস কম। নেই বললেও হয়—দেশে যার ছড়াছড়ি।

'তারপর কুলুম থেকে আদন বন্দর।'

আমার আর ইংরিজী 'এইডন' বলার দরকার হল না।

'তারপর লাল-দরিয়া পেরিয়ে সুসোর খাড়ি—দু দিকে ধু-ধু মরুভূমি, বালু আর বালু, মাঝখানে ছোট্ট খাল।'

বুঝলুম, 'সুসোর খাড়ি' মানে সুয়েজ কানাল।

'তারপর পুর্সই। সেখানে খালের শেষ। বাড়িয়া বন্দর। আমরা শাক-সবজি খেতে নামলাম সেখানে। ঝানুরা গেল খারাপ জায়গায়।'

পোর্ট সঈদের গণিকালয় যে বিশ্ববিখ্যাত, দেখলুম, সারেঙের পো সে খপরটি রাখে।

'পুর্সই থেকে মার্সই, মার্সই থেকে হামবুর—জর্মনির মুলুকে।'

ততক্ষণে সিলেটী উচ্চারণে বিদেশী শব্দ কী ধ্বনি নেয়, তার খানিকটা আন্দাজ হয়ে গিয়েছে, তাই বুঝলুম, মারসেইলজ, হামবুর্গের কথা হচ্ছে। আর এটাও লক্ষ্য করলুম যে, সারেঙ বন্দরগুলোর নাম সোজা ফরাসী-জর্মন থেকে শুনে শিখেছে, তারা যে-রকম উচ্চারণ করে, ইংরিজীর বিকৃত উচ্চারণের মারফতে নয়।

সারেঙ বলল, 'হামবুরে সব মাল নেমে গেল। সেখান থেকে আবার মাল গাদাই করে আমরা দরিয়া পাড়ি দিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম নুউক বন্দরে—মিরকিন মুলুকে।

'নয়া ঝুনা কোন খালাসীকে নুউক বন্দরে নামাতে দেয় না। বড় কড়াকড়ি সেখানে।

আর হবেই বা না কেন? মিরকিন মুলুক সোনার দেশ। আমাদের মত চাষাভুষাও সেখানে মাসে পাঁচ-সাত শো টাকা কামাতে পারে। আমাদের চেয়েও কালা, একদম মিশকালা আদমীও সেখানে তার চেয়েও বেশি কামায়। খালাসীদের নামতে দিলে সব কটা ভেগে গিয়ে তামাম মুলুকে ছড়িয়ে পড়ে প্রাণভরে টাকা কামাবে। তাতে নাকি মিরকিন মজুরদের জবর লোকসান হয়। তাই আমরা হয়ে রইলাম জাহাজে বন্দী।

'নুউক পৌঁছবার তিন দিন আগে থেকে সমীরুদ্দীর করল শক্ত পেটের অসুখ। আমরা আর পাঁচজন ব্যামোর ভান করে হামেশাই কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সমীরুদ্দী এক ঘণ্টার তরেও কোন প্রকারের গাফিলি করে নি বলে ডাক্তার তাকে শুয়ে থাকবার হুকুম দিলে।'

'নুউক পৌঁছবার দিন সন্ধ্যেবেলা সমীরুদ্দী আমাকে ডেকে পাঠিয়ে কসমকিরে খাইয়ে কানে কানে বললে, সে জাহাজ থেকে পালাবে। তারপর কী কৌশলে সে পারে পৌঁছবে, তার ব্যবস্থা সে আমায় ভাল করে বুঝিয়ে বললে।

'বিশ্বাস করবেন না সায়েব, কী রকম নিখুঁত ব্যবস্থা সে কত ভেবে তৈরি করেছিল। কলকাতার চোরা-বাজার থেকে সে কিনে এনেছিল একটা খাসা নীল রঙের সুট, শার্ট, টাইকলার, জুতা, মোজা।

'আমাকে সাহায্য করতে হল শুধু একটা পেতলের ডেগচি যোগাড় করে দিয়ে। সন্ধ্যার অন্ধকারে সমীরুদ্দী সাঁতারের জাঙিয়া পরে নামল জাহাজের উলটো ধার দিয়ে, খোলা সমুদ্রের দিকে। ডেগচির ভিতরে তার সুট, জুতো, মোজা আর একখানা তোয়ালে। বুক দিয়ে সেই ডেগচি ঠেলে ঠেলে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে সে প্রায় আধ-মাইল দূরে গিয়ে উঠবে ডাঙায়। পাড়ে উঠে, তোয়ালে দিয়ে গা মুছে, জাঙিয়া ডেগচি জলে ডুবিয়ে দিয়ে শিস দিতে দিতে চলে যাবে শহরের ভিতর। সেখানে আমাদেরই এক সিলেটী ভাইকে সে খবর দিয়ে রেখেছিল হামবুর থেকে। পুলিশের খোঁজাখুঁজি শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে কয়েকদিন, তারপর দাড়িগোঁফ কামিয়ে চলে যাবে নুউক থেকে বহুদূরে, যেখানে সিলেটীরা কাঁচা পয়সা কামায়। পালিয়ে ডাঙায় উঠতে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার যে কোন ভয় ছিল না তা নয়, কিন্তু একবার সুটটি পরে রাস্তায় নামতে পারলে পুলিশ দেখলেও ভাববে, সে নুউকবাসিন্দা, সমুদ্রপারে এসেছিল হাওয়া খেতে।

'পেলেনটা ঠিক উতরে গেল, সায়েব। সমীরুদ্দীর জন্য খোঁজ খোঁজ রব উঠল পরের দিন দুপুরবেলা। ততক্ষণে চিড়িয়া যে শুধু উড় গিয়া তা নয় সে বনের ভিতর বিলকুল উধাও। একদম না-পাত্তা। বরঞ্চ বনের ভিতর পাখিকে পেলেও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নুউক শহরের ভিতর সমীরুদ্দীকে খুঁজে পাবে কোন্ পুলিশের গোসাঁই?'

গল্প বলায় ক্ষান্ত দিয়ে সারেঙ গেল জোহরের নমাজ পড়তে। ফিরে এসে ভূমিকা না দিয়েই সারেঙ বললে, 'তারপর হুজুর আমি পুরো সাত বচ্ছর জাহাজে কাটাই। দু-পাঁচবার খিদিরপুরে নেমেছি বটে, কিন্তু দেশে যাবার আর ফুরসত হয়ে ওঠে নি। আর কী-ই বা হত গিয়ে, বাপ-মা মরে গিয়েছে, বউ-বিবিও তখন ছিল না। যতদিন বেঁচে ছিল, বাপকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতাম—বুড়া শেষে ক'বছর সুখেই কাটিয়েছে—খুদাতালার শুকুর—বুড়ি নাকি আমার জন্য কাঁদত। তা হুজুর দরিয়ার অথৈ নোনা পানি যাকে কাতর করতে পারে না, বুড়ির দু ফোঁটা নোনা জল তার আর কী করতে পারে বলুন।'

বলল বটে হক কথা, তবু সারেঙের চোখেও এক ফোঁটা নোনা জল দেখা দিল।

সারেঙ বললে, 'যাক সে কথা। এ সাত বছর মাঝে মাঝে এর মুখ থেকে ওর মুখ থেকে খবর কিংবা গুজব, যাই বলুন, শুনেছি, সমীরুদ্দী বহুত পয়সা কামিয়েছে, দেশেও নাকি টাকা পাঠায়, তবে সে আস্তানা গেড়ে বসেছে মিরকিন মুলুকে, দেশে ফেরার কোন মতলব নেই। তাই নিয়ে আমি আফসোস করি নি, কারণ খুদাতালা যে কার জন্য কোন্ মুলুকে দানাপানি রাখেন, তার হদিস বাতলাবে কে?

'তারপর কল-ঘরের তেলে-পিছল মেঝেতে আছাড় খেয়ে ভেঙে গেল আমার পায়ের হাড্ডি। বড় জাহাজের কাম ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এসে ঢুকলাম ডিসপ্যাচারের কামে। এ-জাহাজে আসার দুদিন পরে, একদিন খুব ভোরবেলা ফজরের নমাজের ওজু করতে যাচ্ছি, এমন সময় তাজ্জব মেনে দেখি, ডেকে বসে রয়েছে সমীরুদ্দী! বুকে জাবড়ে ধরে তাকে বললাম, ভাই সমীরুদ্দী! এক লহমায় আমার মনে পড়ে গেল, সমীরুদ্দীকে এককালে আমি আপনার ভাইয়ের মতন কতই না প্যার করেছি।

'কিন্তু তাকে হঠাৎ দেখতে পাওয়ার চেয়েও বেশি তাজ্জব লাগল আমার, সে আমার প্যারে কোন সাড়া দিল না বলে। গাঙের দিকে মুখ করে পাথরের পুতুলের মত বসে রইল সে। শুধালাম, "তোর দেশে ফেরার খবর তো আমি পাই নি। আবার এ জাহাজে করে চলেছিস তুই কোথায়? কলকাতা? কেন? দেশে মন টিকল না?"

'কোন কথা কয় না। ফকির-দরবেশের মত বসে রইল ঠায়, তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, যেন আমাকে দেখতেই পায় নি।

'বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। তখনকার মত তাকে আর কথা কওয়াবার চেষ্টা না করে, ঠেলেঠুলে কোন গতিকে তাকে নিয়ে গেলাম আমার কেবিনে। নাশতার পেলেট সামনে ধরলাম, আণ্ডা ভাজা ও পরটা দিয়ে সাজিয়ে—ওই খেতে সে বড় ভালবাসত—কিছু মুখে দিতে চায় না। তবু জোর করে গেলালাম, বাচ্চাহারা মাকে মানুষ যে-রকম মুখে খাবার ঠেসে দেয়, কিন্তু হুজুর, পরের জন্য অনেক কিছু করা যায়, জানতক কুরবানি দিয়ে তাকে বাঁচানো যায়, কিন্তু পরের জন্য খাবার গিলি কী করে?

'সেদিন দুপুরবেলা তাকে কিছুতেই গোয়ালন্দে নামতে দিলাম না। আমার হুজুর, মনে পড়ে গেল বহু বৎসরের পুরনো কথা—নুউক বন্দরেও আমাদের নামতে দেয় নি, তখন সমীরুদ্দী সেখানেই গায়েব হয়েছিল।

'রাত্রের অন্ধকারে সমীরুদ্দীর মুখ ফুটল।

'হঠাৎ নিজের থেকেই বলতে আরম্ভ করল, কী ঘটেছে।'

সারেঙ দম নেবার জন্য না অন্য কোন কারণে খানিকক্ষণ চুপ করে রইল বুঝতে পারলুম না। আমিও কোন খোঁচা দিলুম না। বললে, 'তা সে দুঃখের কাহিনী—ঠিক ঠিক বলি কী করে সাহেব? এখনও মনে আছে কেবিনের ঘোরঘুট্টি অন্ধকারে সে আমাকে সব-কিছু বলেছিল। এক-একটা কথা যেন সে-অন্ধকার ফুটো করে আমার কানে এসে বিন্ধেছিল, আর অতি অল্প কথায়ই সে সব কিছু সেরে দিয়েছিল।

'সাত বছরে সে প্রায় বিশ হাজার টাকা পাঠিয়েছিল দেশে তার ছোট ভাইকে। বিশ হাজার টাকা কতখানি হয়, তা আমি জানি নে, একসঙ্গে কখনও চোখে দেখি নি—'

আমি বললুম, 'আমিও জানি নে, আমিও দেখি নি।'

'তবেই বুঝুন হুজুর, সে-টাকা কামাতে হলে কটা জান কুরবানি দিতে হয়।

'প্রথম পাঁচশো টাকা পাঠিয়ে ভাইকে লিখলে, মহাজনের টাকা শোধ দিয়ে বাড়ি ছাড়াতে। তার পরের হাজার দেড়েক বাড়ির পাশের পতিত জমি কেনার জন্য। তারপর

আরও অনেক টাকা দিঘি খোদাবার জন্য, তারপর আরও বহুত টাকা শহুরী ঢঙে পাকা চুনকাম করা দেয়াল-ওলা টাইলের চারখানা বড় ঘরের জন্য, আরও টাকা ধানের জমি, বলদ, গাই, গোয়ালঘর, মরাই, বাড়ির পিছনে মেয়েদের পুকুর, এসব করার জন্য এবং সর্বশেষে হাজার পাঁচেক টাকা টঙিঘরের উল্টোদিকে দিঘির এপারে পাকা মসজিদ বানাবার জন্য।

'সাত বছর ধরে সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে, অসুরের মত খেটে দু শিফ্‌ট্‌ আড়াই শিফ্‌টে গতর খাটিয়ে জান পানি করে পয়সা কামিয়েছে, তার প্রত্যেকটি কড়ি হালালের রোজকার, আর আপন খাই-খরচার জন্য সে যা পয়সা খরচ করেছে, তা দিয়ে মিরকিন মুলুকের ভিখারীরও দিন গুজরান হয় না।

'সব পয়সা সে ঢেলে দিয়েছে বাড়ি বানাবার জন্য, জমি কেনার জন্য। মিরকিন মুলুকের মানুষ যে-রকম চাষবাসের খামার করে, আর ভদ্রলোকের মত ফ্যাশানের বাড়িতে থাকে, সে দেশে ফিরে সেই রকম করবে বলে।

'ওদিকে ভাই প্রতি চিঠিতে লিখেছে, এটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে—করে করে যেদিন সে খবর পেল মসজিদ তৈরি শেষ হয়েছে, সেদিন রওয়ানা দিল দেশের দিকে। নুউক বন্দরে জাহাজে কাজ পায় আনাড়ী কালা আদমিও বিনা তকলিফে। তার ওপর সমীরুদ্দী হরেক রকম কারখানার কাজ করে করে কলকব্জা এমনি ভাল শিখে গিয়েছিল যে, তারই সার্টিফিকেটের জোরে, জাহাজে আরামের চাকরি করে ফিরল খিদিরপুর। সন্ধ্যের সময় জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে গেল শেয়ালদা। সেখানে প্লাটফর্মে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরে চাটগাঁ মেল ধরে শ্রীমঙ্গল স্টেশনে পৌঁছল রাত তিনটেয়। সেখান থেকে হেঁটে রওয়ানা দিল ধলাইছড়ার দিকে—আট মাইল রাস্তা, ভোর হতে না-হতেই বাড়ি পৌঁছে যাবে।

'রাস্তা থেকে পোয়াটাক মাইল ধানক্ষেত, তারপর ধলাইছড়া গ্রাম। আলের উপর দিয়ে গ্রামে পৌঁছতে হয়।

'বিহানের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গে সমীরুদ্দী পৌঁছল ধানক্ষেতের মাঝখানে।

'মসজিদের একটা উঁচু মিনার থাকার কথা ছিল—কারণ মসজিদের নকশাটা সমীরুদ্দীকে করে দিয়েছিলেন এক মিশরী ইঞ্জিনিয়ার, আর হুজুরও মিশর মুলুকে বহুকাল কাটিয়েছেন, তাদের মসজিদে মিনারের বাহার হুজুর দেখেছেন, আমাদের চেয়ে ঢের বেশি।

'কত দূর-দরাস্ত থেকে সে-মিনার দেখা যায়, সে আপনি জানেন, আমিও জানি, সমীরুদ্দীও জানে।'

'মিনার না দেখতে পেয়ে সমীরুদ্দী আশ্চর্য হয়ে গেল, তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে দেখে—কোথায় দিঘি, কোথায় টাইলের টঙিঘর!'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালাম, 'সে কী কথা!'

সারেঙ যেন আমার প্রশ্ন শুনতে পায় নি। আচ্ছন্নের মত বলে যেতে লাগল, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, সেই পুরনো ভাঙা খড়ের ঘর, আরও পুরনো হয়ে গিয়েছে। যেদিন সে বাড়ি ছেড়েছিল, সেদিন ঘরটা ছিল চারটা বাঁশের ঠেকনায় খাড়া, আজ দেখে ছটা ঠেকনা। তবে কি ছোট ভাই বাড়ি-ঘরদোর গাঁয়ের অন্য দিকে বানিয়েছে? কই, তা হলে তো নিশ্চয়ই সে-কথা কোন-না-কোন চিঠিতে লিখত। এমন সময় দেখে গাঁয়ের বাসিত মোল্লা। মোল্লাজী আমাদের সবাইকে বড্ড প্যার করে। সমীরুদ্দীকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

'প্রথমটায় তিনিও কিছু বলতে চান নি। পরে সমীরুদ্দীর চাপে পড়ে সেই ধানক্ষেতের মধ্যিখানে তাকে খবরটা দিলেন। তার ভাই সব টাকা ফুঁকে দিয়েছে। গোড়ার দিকে শ্রীমঙ্গল, কুলাউড়া, মৌলবীবাজারে, শেষের দিকে কলকাতায়—ঘোড়া, মেয়েমানুষ আরও কত কী।'

আমি থাকতে না পেরে বললুম, 'বল কী সারেঙ! এ-রকম ঘা মানুষ কি সইতে পারে? কিন্তু বল দিকিন, গাঁয়ের কেউ তাকে চিঠি লিখে খবরটা দিলে না কেন?'

সারেঙ বললে, 'তারাই বা জানবে কি করে, সমীরুদ্দী কেন টাকা পাঠাচ্ছে। সমীরুদ্দীর ভাই ওদের বলেছে, বড় ভাই বিদেশে লাখ টাকা কামায়, আমাকে ফুর্তি-ফার্তির জন্য তারই কিছুটা পাঠায়। সমীরুদ্দীর চিঠিও সে কাউকে দিয়ে পড়ায় নি—সমীরুদ্দী নিজে আমারই মত লিখতে পড়তে জানে না, কিন্তু হারামজাদা ভাইটাকে পাঠশালায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শিখিয়েছিল। তবু মোল্লাজী আর গাঁয়ের পাঁচজন তার টাকা ওড়াবার বহর দেখে তাকে বাড়িঘরদোর বাঁধতে, জমি-খামার কিনতে উপদেশ দিয়েছিলেন। সে নাকি উত্তরে বলেছিল, বড় ভাই বিয়ে শাদি করে মিরকিন মুলুকে গেরস্থালী পেতেছে, এ দেশে আর ফিরবে না, আর যদি ফেরেই বা, সঙ্গে নিয়ে আসবে লাখ টাকা। তিন দিনের ভিতর দশখানা বাড়ি হাঁকিয়ে দেবে।'

আমি বললুম, 'উঃ! কী পাষণ্ড! তারপর?'

সারেঙ বললে, 'সমীরুদ্দী আর গাঁয়ের ভিতর ঢোকে নি। সেই ধানক্ষেত থেকে উঠে ফিরে গেল আবার শ্রীমঙ্গল স্টেশনে। সমীরুদ্দী আমাকে বলে নি কিন্তু মোল্লাজী নিশ্চয়ই তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন, কিন্তু সে ফেরে নি। শুধু বলেছিল, যেখান থেকে এয়েছে, সেখানেই আবার ফিরে যাচ্ছে।

'কলকাতার গাড়ি সেই রাত আটটায়। মোল্লাজী আর গাঁয়ের মুরুবীরা তার ভাইকে নিয়ে এলেন স্টেশনে—টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে সে গাঁয়েই ছিল। সমীরুদ্দীর দু পা জড়িয়ে ধরে সে মাপ চেয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে চাইলে। আরও পাঁচজন বললেন, বাড়ি চল, ফের মিরকিন যাবি তো যাবি, কিন্তু এতদিন পরে দেশে এসেছিস, দুদিন জিরিয়ে যা।'

আমি বললুম, 'রাস্কেলটা কোন্ মুখ নিয়ে ভাইয়ের কাছে এল সারেঙ?

সারেঙ বললে, 'আমিও তাই পুছি। কিন্তু জানেন সায়েব সমীরুদ্দী কী করলে? ভাইকে লাথি মারলে না, কিছু না, শুধু বললে সে বাড়ি ফিরে যাবে না।

'তার পরদিন ভোরবেলা এই জাহাজে তার সঙ্গে দেখা। আপনাকে তো বলেছি, শা-বন্দরের বারুণীর পুতুলের মত চুপ করে বসে।'

দম নিয়ে সারেঙ বললে, 'অতি অল্প কথায় সমীরুদ্দী, আমাকে সব কিছু বলেছিল। কিন্তু হুজুর, শেষটায় সে যা আপন মনে বিড়বিড় করে বলেছিল, তার মানে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি। তবে কথাগুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে বলেছিল, "ভিখিরী স্বপ্নে দেখে সে বড়লোক হয়ে গিয়েছে, তারপর ঘুম ভাঙতেই সে দেখে সে আবার দুনিয়ায়। আমি দেশে টাকা পাঠিয়ে বাড়ি ঘরদোর বানিয়ে হয়েছিলাম বড়লোক, সেই দুনিয়া যখন ভেঙে গেল তখন আমি গেলাম কোথায়"?'

বাস্তব ঘটনা না হয়ে যদি শুধু গল্প হত, তবে এইখানেই শেষ করা যেত, কিন্তু আমি যখন যা শুনেছি তাই লিখছি তখন সারেঙের বাদবাকি কাহিনী না বললে অন্যায় হবে।

সারেঙ বললে, 'চৌদ্দ বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমার সর্বক্ষণ মনে হয় যেন কাল সাঁঝে সমীরুদ্দী আমার কেবিনের অন্ধকারে তার ছাতির খুন ঝরিয়েছিল।

'কিন্তু ওই যে ইনসাফ বললেন না হুজুর তার পাত্তা দেবে কে?'

সমীরুদ্দী মিরকিন মুলুকে ফিরে গিয়ে দশ বছরে আবার তিরিশ হাজার টাকা কামায়। এবারে আর ভাইকে টাকা পাঠায় নি। সেই ধন নিয়ে যখন দেশে ফিরছিল তখন জাহাজে মারা যায়। ত্রিসংসারে তার আর কেউ ছিল না বলে টাকাটা পৌঁছল সেই ভাইয়েরই কাছে। আবার সে টাকাটা ওড়াল।'

ইনসাফ কোথায়?

[দ্বন্দ্বমধুর—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

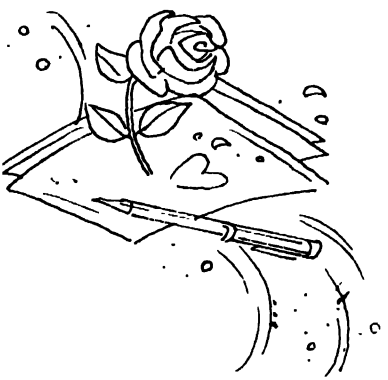

দ্বিজ

এই গত শারদীয়া বেতার জগতে 'কোষ্ঠীবিচার' নামক একটি কথিকা এ অধম নিবেদন করে। বিবরণটি ছিল সত্য ঘটনা অবলম্বনে বর্ণিত। তৎসত্ত্বেও আমার এক দোস্ত সেটি পড়ে কিঞ্চিৎ অপ্রসন্ন হন। আমি সবিনয় বললুম, 'ব্রাদার, এটা বরহক্ জলজ্যান্ত ঘটেছিল; আমাকে দুষছো কেন?' তিনি বললেন, 'তুমি সেটি রসস্বরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছ; সেক্ষেত্রে সত্যি-মিথ্যের কোনো অজুহাত নেই।' একদম খাঁটি কথা। তাই এবারে কিন্তু যেটি নিবেদন করবো সেটি পড়ে তিনি প্রসন্ন হবেন, এমত আশা করি, আর আপনারা পাঁচজন তো আছেনই। এই সুবাদে আরেকটি সামান্য বক্তব্য আমার আছে। হিন্দু-মুসলমান বাঙালী-অবাঙালী কাউকেই আমি বেদনা দিতে চাই নে। দিলে সেটা অজানিত এবং তার জন্যে এইবেলাই বে-কৈফিয়ৎ মাফ চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আমার বক্তব্য দুষ্টবুদ্ধিজনিত ভ্রমাত্মক সপ্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সেটি সংহরণ করতে আমি অক্ষম—এটা গুরুর আদেশ।

এদানির কিছু লোক আবার আমার কাছ থেকে প্রাচীন দিনের শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ভালোমন্দ শুনতে চান। আমি তাঁদের লুক্কায়িত বক্তব্যটিও বিলক্ষণ মালুম করতে পেরেছি; সেটি এই, 'যা বুড়োচ্ছ, দুদিন বাদেই ভীমরতি ধরবে এবং তখন হয়ে দাঁড়াবে একটি চৌকশ "লিটারারি বোর"; যদ্যবধি দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে সওয়া যাচ্ছে ততক্ষণ তোমার আপন কথা ধানাই-পানাই না করে আশ্রমের কথা কও, গুরুদেবের কথা কও ইত্যাদি।'

তাই সই। দেশকাল ঠিক ঠিক রাখবো। পাত্র ভিন্ন নামে ভিন্ন বেশে আত্মপ্রকাশ করবেন।

১৯২০/২১ সনে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে কলেজ কোর্স খোলেন। ঐ সময় গাঁধীজী সরকারী ইস্কুল-কলেজের পড়ুয়াদের গোলামী-তালিম বর্জন করতে আহ্বান জানান। ফলে ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে যেসব মেধাবী ছিল, গাঁধীজীর বাণী গ্রহণ করলো তারা, জমায়েত হল শান্তিনিকেতনে। আর এলেন কয়েকটি খাজা মাল, যাঁরা বছরের পর বছর পৌনঃপুনিক দশমিকের পাইকিরি হিসেবে বেধড়ক ফেল মেরে যাচ্ছিলেন। অবশ্য এঁদের একজন বলেছিলেন, 'ঐসন্ অ্যানসার বুক লিখেছিলুম, স্যর, যে এগজামিনার বললে, 'এনকোর!" তাইতে ফের একই পরীক্ষা দিতে হল।' এঁদের মধ্যে আমার মত গুণ্ডাপ্রকৃতির দু-চারটি কাবেল সন্তান ছিলেন।

ইতিমধ্যে এলেন বিশ্বনাথ তিরুমল রাও অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ থেকে। এঁকে নিয়ে যখন দু'দলে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল তখন ধরা পড়লো ইনি বরের পিসি, কনের মাসি। অর্থাৎ ইনি যেমন অনেকটা ইন্দ্রনাথের মত অন্ধকার রাস্তায় স্যাডিস্ট ক্লাস-টীচারের মাথায় হঠাৎ কম্বল ফেলে তাকে কয়েক ঘা বসিয়ে বাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে এখানে চলে আসেন, ঠিক তেমনি কলাভবনে প্রবেশ করার পর দেখা গেল, তিনি একই হাতে পাঁচটা তুলি নাচাতে পারেন—যাদুকররা যেমন পাঁচটা বল নাচায়। স্কেচে ওস্তাদ, ফিনিশে তালেবর।

তদুপরি আরেকটি অতিশয় আশ্রমপ্রিয় সদ্‌গুণ তাঁর ছিল, যার প্রসাদাৎ তিনি সর্বত্রই কল্‌কে পেতেন। উচ্চতায় যদ্যপি পাঁচ ফুট দুই, কিন্তু পেশীগুলো যেন মানওয়ারি জাহাজের দড়া দিয়ে তৈরী, এবং ফুটবল-চৌকশ। বীরভূমের কাঁকরময় গ্রাউণ্ডে ডজনখানেক আছাড় খেয়ে সর্বাঙ্গে রক্তলাঞ্ছন আঁকার পরও তিনি বুলেটবেগে ছুট লাগাতে কসুর করতেন না এবং হাসিমুখে। বিচক্ষণ জন সে হাসিতে নষ্টামির গোপন চিহ্ন দেখতে পেত।

আমাদের দোস্তি প্রথম দিন থেকেই। নাম যখন শুধালুম সেটা দ্রুতগতিতে দায়সারার মত বলে নিয়ে জানালে, 'ওটা তোলা নাম। আমার ডাকনাম চিন্নি। তোমার?'

'সীত।'

পরবর্তী যুগে চিন্নি, ওরফে মিঃ রাও, স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে দিল্লীতে কাজ করে। তার ভুলে-ভর্তি অনর্গল বাঙলা কথার তুবড়িবাজি রাশভারি শ্যামাপ্রসাদের মুখেও কৌতুকহাস্য এনে দিত এবং বিশেষ করে ঐ কারণেই তিনি চিন্নিকে মাত্রাধিক স্নেহ করতেন। চিন্নি উত্তম ইংরিজি বলতে পারত, কিন্তু তার বক্তব্য, দিল্লীর মন্ত্রণালয়ই হোক আর ভুবনডাঙার ঝুরঝুরে চায়ের দোকানই হোক, সে তার শান্তিনিকেতনে শেখা বাঙলা ছাড়বে কেন? স্বয়ং গুরুদেবের সঙ্গে সে বাঙলায় কথা কইত নির্ভয়ে—চারটিখানি কথা নয়, এবং শ্যামাপ্রসাদ এই তত্ত্বটি আবিষ্কার করে, চিন্নির ডজন ডজন ভুল-ভর্তি বাঙলা সম্বন্ধে বলতেন, 'রাও কিন্তু তার বাঙলা প্রতিদিন ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে।' অর্থাৎ ভুল বাড়ছে!

শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রিত্ব রিজাইন দিলে পর চিন্নিও তার জুতো থেকে দিল্লীর ধুলো ঝেড়ে ফেলে মাদ্রাজ চলে যায়। সেখান থেকে ইউনেস্কোর আহ্বানে তাইল্যান্ড, কলম্বো, জিনীভা, ওয়াশিংটন, বাগদাদে কীর্তিজাল বিস্তার করে।

সে যে দড়মালে তৈরি সেটা আশ্রমে তার আঠেরো বছর বয়সেই ধরা পড়ে। সেখানে ইস্কুলের ছেলেরা দুবেলা উপাসনা করে; প্রস্তাব হল আমাদেরও করতে হবে। চিন্নি উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল সে নাস্তিক। ফৈসালা করার জন্য আমাদের মীটিং বসলো। প্রিন্সিপাল মেসেজ পাঠালেন, তিনি চান, আমরা যেন উপাসনা করি। চিন্নি বললে, 'ইস্কুলের ছেলেদের বাপ-মা উপাসনার কথা জেনেশুনেই বাচ্চাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমাদের অধিকাংশই এসেছি তাঁদের অমতে (এ কথাটা খুবই খাঁটি; আমাদের গার্জেনদের অধিকাংশই ছিলেন সরকারী চাকুরে; তাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে সায় দেন কি প্রকারে? আমার পিতাকে তো ইংরেজ রীতিমত ভয় দেখায়)। আমরা সাবালক; আমি নাস্তিক।' চিন্নি পার্লামেন্টেরেনও বটে—তার দোস্ত মাসোজীকে চ্যালেঞ্জ করে বললে, 'তুমি তো ক্রীশ্চান; তোমার সর্ব প্রার্থনা পাঠাতে হয় প্রভু যীশুর মাধ্যমে। আশ্রমের উপাসনায় যোগ দেবে কি করে?' আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুই তো মিয়া ভাই (মুসলমান)! পাঁচবেকৎ নেমাজ করিস।' (করবো বলে বাবার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে এসেছিলুম) সভাপতির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওর ঘাড়ে দুটো চাপানো কি ধর্মসম্মত?' ইত্যাদি ইত্যাদি। রেভারেন্ড অ্যানড্রুজ আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন সভাকে রাজি করাতে। পাদ্রীসাহেবের যাবতীয় স্কিল, তদুপরি তাঁর সরল আন্তরিকতা, তিনি সবকিছু প্রয়োগ করে খুব সুন্দর বক্তৃতা দেন। কিন্তু ভোটে চিন্নিপন্থীরা কয়েকটি ভোটে জিতে গেল। তখন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হল, গুরুদেব যা আদেশ দেবেন তাই হবে। অ্যানড্রুজ সাহেবকেই আমরা দূত করে পাঠালুম।

গুরুদেব মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণ করেন—'না'।

এই গেল চিন্নির পরিচয়।

ইতিমধ্যে আরেকটি ছেলে এল অন্ধ্র থেকে। মাধব রাও। সেও চমৎকার ফুটবল খেলে।

* * *

রাজ রাজমহেন্দ্রবরাম নগর—অর্থাৎ রাজমনড্রীর শ্রীযুত জগন্নাথ রাও চিন্নির বন্ধু। তিনি চিন্নিদের বাড়ির ছেলের মত। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ব্রাহ্মছাত্র অন্ধ্রদেশের শ্রীযুক্ত

চালাময় গুরুদেবের প্রচুর কবিতা গল্প উপন্যাস এবং বিশেষ করে তাঁর ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনা অনবদ্য তেলেগুতে অনুবাদ করেন। জগন্নাথ রাও সেগুলো পড়ে আকণ্ঠ রবীন্দ্রভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। চিন্নির আশ্রমাগমনের ফলে তাঁর আশ্রমদর্শনের সদিচ্ছা প্রবলতর হল। চিন্নিকে আকস্মিক আনন্দদানের উদ্দেশ্যে তাকে কোনো প্রকারের নোটিশ না দিয়ে শুধু চিন্নির পিতা-মাতাকে জানিয়ে এক শুভপ্রাতে রওনা দিলেন কলকাতা অভিমুখে।

কলকাতায় উঠলেন বড়বাজার অঞ্চলে এক অন্ধ্র মেসে। সেখানে শুধোলেন, শান্তিনিকেতন কি প্রকারে যেতে হয়? কেউ কিছু জানে না বলে টাইমটেবল যোগাড় করা হল—সেখানেও শান্তিনিকেতনের সন্ধান নেই। তখন একজন বললে, কাছেই তো পোয়েটের বাড়ি; সেখানে গেলেই জানা যাবে। শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রাও তাই করলেন। সেখানে দেখেন 'বিশ্বভারতী পাবলিকেশেন্‌স' দফতর খোলা বটে, কিন্তু লোকজন কেউ নেই। শেষটায় একটি ছোকরা কেরানীকে আবিষ্কার করা হলে সে বললে, হাওড়া থেকে যেতে হয়, সে কখনো ওখানে যায় নি। যাঁরা যাওয়া-আসা করেন, তাঁরা সবাই গেছেন শ্মশানে। শান্তিনিকেতনের কে এক মিস্টার রাও সেই ভোরে হাসপাতালে মারা গেছেন।

জগন্নাথ রাও ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলেন। সম্বিতে ফিরে আর্তকণ্ঠে শুধোলেন, 'কে?' ছোকরাটি বললে, বড়ই দুঃখের বিষয়। মিস্টার রাও আশ্রমের হয়ে ফুটবল খেলতে যান শিউড়িতে। সেখানে খেলাতে জোর চোট লাগার ফলে তাঁর হার্নিয়া স্ট্রেনগুলেটেড্ হয়ে যায়। অ্যান্‌ড্রুজ সাহেব এখানকার হাসপাতালকে জরুরী চিঠি লিখে লোকজনসহ তাঁকে পাঠান কাল রাত্রে। সবই করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

জগন্নাথ রাও টলতে টলতে বেরিয়ে এলেন। চিন্নি ওয়াল্‌টেয়ারে আরেকবার এইরকম খেলার মাঠে বেহুঁশ হয়।

রাস্তা থেকে আবার ফিরে গেলেন ছোকরাটির কাছে। শুধোলেন, 'তার বাড়িতে তার পাঠানো হয়েছে?' ছোকরাটি বললে সে জানে না।

জগন্নাথ রাও মেসে ফিরে এসে শয্যা নিলেন। দেশবাসীরা পরামর্শ করে তাঁর কথামত চিন্নির বাড়িতে তার পাঠালেন দুঃসংবাদটা জানিয়ে।

জগন্নাথ রাওয়ের কোনোই ইচ্ছা আর রইল না শান্তিনিকেতন যাবার, কিন্তু তিনি পরিবারের বন্ধু—এখন এত দূর কলকাতা অবধি এসে যদি সবিস্তার খবর নেবার জন্য সেখানে না যান তবে সবাই দুঃখিত হবেন।

নিতান্ত কর্তব্যের পীড়নে জগন্নাথ রাও হাওড়া গিয়ে বোলপুরের ট্রেন ধরলেন।

বিকেলের দিকে যখন আশ্রমে পৌঁছলেন তখন গেস্ট্ হাউসে হিতলাল (বর্তমান কালোর দোকানের কালোর পিতা) ভিন্ন কেউ ছিল না—হিতলাল ইংরিজি জানে না। জগন্নাথ বিছানাপত্র সেখানে রেখে বেরুলেন কলাভবনের সন্ধানে। চিন্নি তাঁকে কলাভবনের ঠিকানা দিয়ে চিঠি লিখত।

সে কলাভবন বাড়ি আর নেই। তবে তার ভিতটা এখনো দেখতে পাওয়া যায়, গুরুদেবের 'দেহলী' বাড়ির কাছে, বোলপুর যাবার রাস্তার পাশে।

কলাভবন সে সময়টায় নির্জন থাকে। নিচের তলায় কাউকে না পেয়ে তিনি সিঁড়ি দিয়ে ল্যান্ডিঙে পৌঁছে সেখান থেকে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন—,

আমি যাচ্ছিলুম বোলপুর—নস্যি কিনতে; হঠাৎ শুনি, সেই অবেলায় কলাভবনে শোরগোল, স্পষ্ট চিনতে পেলুম আর্টিস্ট রমেন চক্রবর্তীর গম্ভীর গলা। কিন্তু আর্ত কণ্ঠে...তুমি যাও, শিগগির যাও, জল নিয়ে এস। আমি ততক্ষণে দেখছি,—

তিন লম্ফে সেখানে পৌঁছে দেখি, চিন্নি 'দেহলী' বাড়ির দিকে কালবৈশেখী বেগে ছুটেছে। আমি সেদিকে খেয়াল না করে সিঁড়ি বেয়ে মাঝখানে উঠে দেখি কে একজন লোক দু'পা ইয়া ফাঁক আর দু'হাত ইয়া লম্বা করে ধূলিশয়নে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। জোয়ারের সমুদ্র বেলাভটকে মড়া ফিরিয়ে দিলে সে যেরকম শুয়ে থাকে। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে, আর বিড় বিড় করে বলছে, 'চিন্নি, চিন্নি!' চক্রবর্তী বললেন, সে আবার কি? তিনি বিশ্বনাথ রাওয়ের ডাকনাম জানতেন না। আমি বুঝিয়ে বললুম। চক্রবর্তী বললেন, দেখো তো সৈয়দ, ডাক্তার এসেছে কিনা, বিকেলে তো মাঝে-সাঝে আসে। আমি বললুম, দেখি, মনে তো হচ্ছে ভিরমি কেটে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ পরে ফিরে এসে দেখি, ওদের কেউই আর সেখানে নেই।

চিন্নি ভালো অভিনয় করতে জানে। রাত্রে তার ঘরে সে দেখালে জগন্নাথ রাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ তাকে দেখে—সে আর চক্রবর্তী তখন সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন—থমকে গিয়ে কাঁপতে লাগলেন। দু'হাত দুদিকে দুটো হাঁটুর সঙ্গে একতালে মৃগী রুগীর মত কাঁপতে কাঁপতে ধপাস্। চিন্নি বললে, 'অবশ্য আমার মুখেও জগন্নাথ বিস্ময় দেখতে পেয়েই ভয় পেয়েছিল আরো বেশি। ভাগ্যিস্ রমেনবাবু সঙ্গে ছিলেন! আমাকে ঐ আবছায়া আলোতে একলা-একলা দেখতে পেলে তার কোনো সন্দেহ থাকতো না যে, আমার ভূত কলাভবনের মায়া কাটাতে না পেরে সন্ধ্যার নির্জনে সেখানে আবার এসেছে।'

হঠাৎ দেখি জগন্নাথ রাওয়ের মুখ একেবারে রক্তহীন, মাছের পেটের মত পাঁশুটে হয়ে গিয়েছে। কাঁপতে কাঁপতে যা বললেন তা শুনে রমেনবাবুর মত ঠাণ্ডামাথা স্থিরবুদ্ধির লোক পর্যন্ত অচল দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। এতক্ষণে জগন্নাথের খেয়াল গেছে যে, তিনি চিন্নির বাপ-মাকে তার করে জানিয়ে বসে আছেন যে চিন্নি নেই।

আমি তেড়ে বললুম, 'আপনি তো আচ্ছা—নেবার মাইন্ড!—রাও তো আপনাদের দেশে প্রত্যেক সেকেন্ড ইডিয়ট।'

জগন্নাথ বার বার বলেন, 'চিন্নি তো আমায় জানায় নি যে আরেকজন অন্ধ্রবাসী এসেছে। তার উপর ফুটবল, তারপর পেটে—'

রমেনবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'ওহে! এতক্ষণ তো খুব রগড় করলে! শোনো, ব্যাপারটা সিরিয়স! অ্যান্ড্রুজ সাহেবের কাছে যাও। আর কারও টেলিগ্রাম বাপ-মা বিশ্বাস না করতে পারেন। গুরুদেব তো বার্লিনে!'

সাহেব মোটেই চটলেন না। নাস্তিক চিন্নির জন্য খাঁটি খ্রীস্টান ছ'পাতা লম্বা তার করলেন সই বুঝিয়ে। আর আমি চিন্নিকে তাঁর সামনেই বললুম, এবার প্রার্থনা করোগে, বাড়িতে যেন ভালো-মন্দ কিছু একটা না হয়। দুই অন্ধ্র ভাইজ্যাগ্ বাগের ট্রেন ধরলেন।

চিন্নি ফোকটে ছুটি মেরে হপ্তাতিনেক পরে ফিরলো। আমরা শুধালুম, 'কি, আপন ছেরান্দ সাঁপটাবার মত ঠিক সময়ে পৌঁচেছিলি তো? হুঁকোটা লে, খুলে ক!'

চিন্নি বললে, 'টেলিগ্রাম পৌঁচেছিল দেরিতে। ইতিমধ্যে দাদাকে আনানো হয়েছে মাদ্রাজ থেকে। বাড়িতে কান্নাকাটি সে আর কি বলতে—অবশ্য আমার শোনা কথা। যেদিন তার পৌঁছল সেদিন বামুন এসেছে শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে। আর ট্র্যাজেডিটা দেখ, বাড়িসুদ্ধ সবাই শোকে এমনি বিকল যে, কে একজন তারটা সই করে নিয়ে একপাশে রেখে দিয়েছে, ঘণ্টা দুই কেউ খোলে নি, ভেবেছে, কি আর হবে, কন্ডলেন্স্-টেন্স্। খুলেছিল শেষটায় আমার ছোট ভাই। সেও নাকি প্রায় ঐ জগন্নাথ রাওয়ের মত পাঙাশ

মেরে রাম ইডিয়টের মত গা-গা ডাক ছেড়েছিল। বাকিরা ভাবলে, আবার কে মরলো? তারপর কেউ বিশ্বাস করে না তারটাকে, যদিও সবাই করতে চায়। অ্যান্ড্রুজ সাহেব এত বিখ্যাত লোক, তিনি আমাদের চিন্নিটার জন্য ইত্যাদি...।'

শেষটায় বিশ্বাস করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি না পৌঁছনো পর্যন্ত কারও কারও মনের ধোঁকা কাটে নি।

রাত্রে ছাতের উপর পাশাপাশি শুয়ে আছি দু'জনাতে। আমি বললুম, 'চিন্নি, ঘুমুলি?'

'না।'

'আর তোর মা?'

'বিশ্বাস করবি নে, সে ভারি ইন্‌ট্রেস্‌টিং। জগন্নাথ রাওয়ের তার পৌঁছনোর পর থেকেই মায়ের মুখে শুধু এক বুলি, কিছুতেই হতে পারে না। আমার ছেলে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এই তো বছরের পয়লা দিনে আমি গণৎকার ঠাকুরকে ফি বছরের মত এবারও সব ক'টা ছেলের কোষ্ঠী দেখিয়েছি। তিনি এবারও বলেছেন, "চিন্নির সামনে ফাঁড়াটি পর্যন্ত নেই"।'

চিন্নি বললে, 'যখন পুরুতঠাকুর শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করতে এসেছে তখনো তার মুখে ঐ এক বুলি, "কি হবে এসব ব্যবস্থা করে? গণৎকার বলেছে, এ বছরে চিন্নির জ্বর-জ্বালাটি পর্যন্ত নেই"।'

কে তাঁর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে বোঝাবে চিন্নি নেই?

আর শ্রাদ্ধে যা টাকা খরচা হওয়ার কথা ছিল সেটা মা দিয়েছে গণৎকারকে।

[দু-হারা—রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড]

সিনিয়ার এপ্রেন্টিস্

কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থ যত পুরনো হয় তাদের কদর ততই বেড়ে যায়। নতুন যুগের লোক সে সব গ্রন্থ থেকে নতুন সমস্যার অতি প্রাচীন এবং চিরন্তন সমাধান পায় বলে তারা সব কেতাবকে অনায়াসে হার মানায়। শুধু ধর্মগ্রন্থ নয়, কোনো কোনো গল্পও অজরামর হয়ে থাকে ঐ একই কারণে। তারই একটা অতি মর্মান্তিকভাবে কাল মনে পড়ে গেল—কুড়িটি টাকা জেবে নিয়ে বাজার ঘুরে এলুম, ধুতি পেলুম না। গল্পটি হয়ত অনেকেই জানেন— তাঁরা অপরাধ নেবেন না।

গণেশ বেচারি এপ্রেন্‌টিস্ মাইনে পায় না। কাজ শিখছে, এর ধাঁতানি ওর গুঁতানি চাঁদপানা মুখ করে সয়। আশা, একদিন পাকাপাকি চাকরি, মাইনে সব কিছুই পাবে। চাকরি খালি পড়লও, কিন্তু বড়বাবু সেটা দিয়ে দিলেন তাঁর শালীর ছেলেকে—সে কখনো এপ্রেন্‌টিসি করে নি। বড়বাবু গণেশকে ডেকে বললেন, 'বাবা গণেশ, কিছু মনে করো না; এ চাকরিটা নিতান্তই অন্য একজনকে দিয়ে দিতে হল। আসছেটা তোমাকে দেব নিশ্চয়ই।'

কাকস্য পরিবেদনা, আবার চাকরি খালি পড়ল, বড়বাবু ফের ফক্কিকারি মারলেন, গণেশকে ডেকে আবার মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভেজালেন। এমনি করে দেদার চাকরি গণেশের সামনে দিয়ে ভেসে গেল, তার এপ্রেন্‌টিসির আঁকশি দিয়ে একটাকেও ধরতে পারল না। শেষের দিকে বড়বাবু আর গণেশকে ডেকে বাপুরে, বাছারে বলে সান্ত্বনা মালিশ করার প্রয়োজনও বোধ করেন না।

গণেশের চোখ বসে গেছে, গাল ভেঙে গেছে, রগের চুলের দু'এক গাছায় পাক ধরলো, পরনের ধুতি ছিঁড়ে গিয়েছে, জামাটা কোনো গতিকে গায়ে ঝুলে আছে। গণেশ এ-টুলে ও-টুলে, এর কাজ, ওর ফাইফরমাশ করে দেয়—আর করে করে আপিসের বেবাক কাজ তার শেখা হয়ে গেল। চাকরি কিন্তু হল না।

এমন সময় বড় সাহেব একদিন বড়বাবুকে দোতলায় ডেকে বললেন, 'আমায় একটা জরুরী রিপোর্ট লিখে আজকেরই মেল ধরতে হবে। কেউ যেন ডিস্‌টার্ব না করে। দরজার গোড়ায় একজন পাকা লোক বসিয়ে দাও, কাউকে যেন ঢুকতে না দেয়।'

দরোয়ানরা সেদিন করেছিল ধর্মঘট। বড়বাবু গণেশকে দিলেন দোরের সামনে বসিয়ে। বললেন, 'কিছু মনে করো না বাবা গণেশ, হেঁ, হেঁ হেঁ হেঁ, ইত্যাদি। গণেশ টুলে বসে ছেঁড়া ধুতিতে গিঁট দিতে লাগল।

এমন সময় নিচের রাস্তায় হৈহৈ রৈরৈ। এক বদ্ধ পাগল রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, পরনে কশ্মিনটুকু পর্যন্ত নেই—ইংরেজিতে যাকে বলে 'বার্থ-ডে-সুট'—আর পিছনে রাস্তার ছোঁড়ারা তাকে লেলিয়ে লেলিয়ে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবি তো হ পাগলা করল গণেশের আপিসের দিকেই ধাওয়া। সিঁড়ি ভেঙে উপরের তলায় উঠে ঢুকতে গেল বড় সাহেবের ঘরে। গণেশ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কিন্তু পাগলকে বাধা দিল না।

মারমার কাটকাট কাণ্ড। পাগলের পিছনে পিছনে ছোঁড়াগুলোও ঢুকে ঢুকেছে বড়সাহেবের ঘরে। চিৎকার চেঁচামেচি। পাগলা সাহেবকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে ফেলে রিভলভিং টিল্‌টিঙ চেয়ারে বসতে চায়।

তাই দেখে কেউ বদ্যি ডাকে
কেউ বা ডাকে পুলিশ,
কেউ বা বলে কামড়ে দেবে
সাবধানেতে তুলিস!

শেষটায় পুরো লালবাজার এসে ঘর সাফ করল।

সাহেব রেগে কাঁই। বড়বাবুকে ধরে তো এই-মার কি তেই-মার লাগান আর কি। বলেন, 'তুমি একটা ইডিয়েট, আর দোরে বসিয়েছিলে তোমার মত একটা ইম্বেসাইলকে। কোথায় সে, ডাকো তাকে।'

গণেশ এসে সামনে দাঁড়াল।

সাহেব মারমুখো হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইউ প্রাইজ-ইডিয়েট, পাগলকে তুমি ঠেকালে না কেন?'

গণেশ বড় বিনয়ী ছেলে। বললে, 'আমি ভেবেছিলুম, উনি আমাদের আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌। আমি তো জুনিয়র, ওকে ঠ্যাকাবো কি করে?'

সাহেব তো সাত হাত পানিমে। বললেন, "হোয়াড্যু মীন বাই দ্যাট?'

গণেশ বললে, 'হুজুর, আমি তিন বৎসর ধরে এ আপিসে এপ্রেন্‌টিসি করছি। খেতে পাই নে, পরতে পাই নে। এই দেখুন ধুতি। ছিঁড়ে ছিঁড়ে পট্টি হয়ে গিয়েছে। লজ্জা ঢাকবার উপায় নেই। তাই যখন এঁকে দেখলুম আমাদের আপিসে ঢুকছেন, একদম অবস্তর উলঙ্গ? তখন আন্দাজ করলুম, ইনি নিশ্চয়ই এ-আপিসের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস্‌। তা না হলে তাঁর এ অবস্থা হবে কেন? এখানে এপ্রেনটিসি করে করে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হয়ে সিনিয়ার এপ্রেন্‌টিস হয়েছে।'

* * *

১৯৪৭ সালে স্বরাজ লাভ হয়। আমাদের এপ্রেন্‌টিসি তখন শুরু হয়। তখনো পরনে ধুতি ছিল, গায়ে জামা ছিল। আর আমাদের সিনিয়র এপ্রেন্‌টিস হওয়ার বেশি বাকি নেই। সবই আল্লার কেরামতি।

[পঞ্চতন্ত্র প্রথম খণ্ড—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

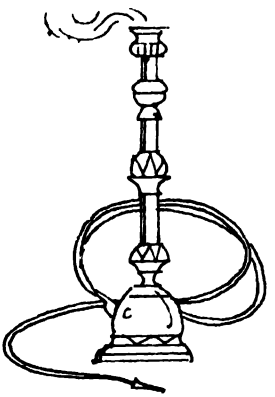

পাদটীকা

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলে ভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি স্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা, যাঁরা কোনোগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশি কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাশির চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজি হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোল-লাগা', 'পাখী-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সে দিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পরমুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য-বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশি, এবং টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশি। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিতমশাইকে খুশী করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশি স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই; ঐ 'দোলা-লাগা', 'পাখী-জাগাই' আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশি স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটূকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য', 'শাখা-মৃগ', দ্রাবিড়সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণত সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে

পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভা-লাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোন্‌টা বেশি হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িতলোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথা দ্বিসহস্র বারের মত স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে-দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায় —আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি?' তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—একথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজও যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থায় নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে পড়া, টিকিতে দোলা-লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন?

সে-সময়ে আসামের চীফ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসন্ বেল্। সাহেবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন্ বেল্ অর্থ 'বাজায় ঘণ্টা'—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সে-ই একদিন খবর দিল লাটসাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের ট্যুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্রিত আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টার মশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার একঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজির মতন তুর্কীনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সেদিকেই হেডমাস্টার—নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কি হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানলা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বললেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতি, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বললেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট-অফিট কি?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সাহেব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশচায, এ রকম উম্‌দা গেঞ্জি দু'খানা তৈরি হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানি দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাশি নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেন্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই বত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবি শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সাহেব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই করা কাপড়ের পাপ থেকে পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা এখন তৈরি কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পণ্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানো চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু পা তুলে তড়পায় শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্ব-যন্তণা,' কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়মিড়ি খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সায়েবের সামনে তো সব্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সাহেব এলে আমি জানলা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললে, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্তণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশি ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন্ দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময়মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব যন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন; সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেক্টর, ইনসপেক্টর, হেড মাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সাহেবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্‌ডিট্' বলে সাহেব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশায়ের সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সাহেবকে সেলাম করলেন —এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃৎ-তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সাহেব হেসে বললেন, 'ওয়ান অ্যাট এ টাইম, প্লীজ'। লাট সাহেব আমাদের বলল 'প্লীজ', এ কি কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ,—তখনো প্লীজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেললে—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সাহেব ততক্ষণ হেডমাস্টারের সঙ্গে পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কি বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পশু হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পশুের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সাহেব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশয্যে নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু'তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড্ হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাঁহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগারূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সাহেবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাশি নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?'

বললুম, 'ঐ যে বললুম, একগাদা, এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আর গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই; জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ—রাত্র্যান্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সাহেবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেন্ডের তরে ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, 'আজ্ঞে একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকোর মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম-টেলাম করে পরিচয় দিল,

সে আমাদের গ্রামের মিস্বর উল্লার শালা; লাট সাহেবের আরদালি, সাহেবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি, নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সাহেবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সাহেবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে খবরটাও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদনমোহন কিরকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিস্বর উল্লার শালা বলল, লাট সাহেবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়। এইবার দেখি, তুই কিরকম আঁক শিখেছিস। বল তো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধামাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবনধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সাহেবের কুকুরের কটা ঠ্যাঙের সমান?'

আমি হতবাক্।

'বল না।'

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে—।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ করে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরণ্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

সমুচা হাজরা রোড হাওড়া প্ল্যাটফর্মে সমুপস্থিত। অর্থাৎ হাজরা রোডস্থ আমাদের রকফেলারগণ। অজনদা, মশাদা, ঘন্টু, মুকুলদি,—ইস্তক পাঁচ বছরের গুড়গুড়ি।

আলিঙ্গন, মস্তকাঘ্রাণ ইত্যাদি শেষ হওয়ার পূর্বেই মশাদা বললে, 'ওঃ, কী গরমটাই না পড়েছে। ফোকাস ঢিলে করে দিলে।'

মশাদার ঐ একটা গুণ। কোনো নূতন টেকনিকাল কাজ আরম্ভ করলে তার প্রচলিত বুলিগুলো অন্য জিনিসে চট করে ট্র্যান্সফার করতে পারে। এই দুর্দিনে সবাই যখন ফটোগ্রাফি প্রায় ছাড়ে ছাড়ে সেই সময় মশাদা ঐ কর্মে মন দিয়েছে।

ইতিমধ্যে অ্যারকন্ডিশন কোচের স্টুয়ার্ড, মেট, রেস্তোরাঁকারের বাবুর্চি ইত্যাদি যাবতীয় চাকর-নফর, সরকারী ভাষায় ক্লাশ ফোর স্টাফ সারি বেঁধে আমায় গার্ড অব অনার দিলে।

আমার চোখে মুখে নিশ্চয়ই ভ্রূকুটি-কুটিল বিরক্তি ফুটে উঠেছিল।

রক চুপ। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতেই দেখি ঘন্টু হনহন করে পালাচ্ছে। মুকুলদি হেঁকে শুধালে, 'ব্যাপার কি? ঘন্টুদা পালাচ্ছো কোথায়?'

বললে, 'চাচা ক্ষেপেছে। নইলে অ্যারকন্ডিশনে আসার পয়সাই পায় কোথায়, কোং ওকে সেলাম ঠুকবেই বা কেন? দেদার টিপস্ দিয়েছে নির্ঘাত। এবারে টাকা ধার চাইবে।'

রক বললে, 'সত্যি তো। কিন্তু ব্যাপারটা কি?'

আমি বিরস মুখে বললুম, 'বাড়ি গিয়ে।'

চা-টা দেখেই জানটা তর-জল হয়ে গেল। চা আমরা বড় একটা খাই নে। কিন্তু সামনে না থাকলে আমরা আসামী খুনে। (আমি 'অহমিয়া' বলিনি, মনে থাকে যেন)। ওটা একটা সিম্‌বল্। মা কালী নৈবেদ্য ছোঁন না, কিন্তু না দিলে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'হালের বলদ বিক্রি করে রে, পালের গাই বিক্রি করে।'

সবাই শুধালে, 'সে আবার কি?' এরা শহুরে। 'হালের বলদ', 'পালের গাই' বলতে কি বুকের পাঁজর, জিগরের খুন জানে না। বললুম, 'তাই দিয়ে অ্যারকোচের টিকিট কেটেছি—তোরা কলকাতায় একশ'তে হিমসিম খাচ্ছিস। আমি যখন দিল্লি ছাড়ি তখন সেখানে ১১৮°।

পদ্মায় যখন উজোন বাইতে হয় তখন পাল যদি বাতাস পায় তা হলে দেখবি—আকছারই দেখবি—একা একজন মাল্লা মাঝ পদ্মা দিয়ে যাচ্ছে তরতর করে। আর সে কী এফর্টলেস ব্যাপার। লোকটার ডান হাত মোলায়েমসে অতি আলগোছে হালের উপর রাখা—যেন কোনো মহারাজ দামী সিংহাসনের মখমল মোড়া হাতলের ওপর হাত রেখে পোর্ট্রেট পেন্টিং করাচ্ছেন। আর বাঁ হাত দিয়ে ধরেছে পালের দড়ি। যেন প্রেমিক অলস রভসে প্রিয়ার বিনুনিটি তুলে ধরেছেন। প্রিয়া, পালের বুক ফুলিয়ে উড়ে চলেছেন উজানে।

তখন যদি সে দেখে আরেক নৌকায় তিনজন মাল্লা হাল বৈঠা মেরে মেরে নেয়ে-ভিজে কাঁই হয়ে যাচ্ছে, এক বিঘৎ এগুতে পারছে না, পাল নেই বলে, তখন সে চিৎকার করে তাদের বলে 'হালের বলদ বিক্রি কর, পালের গাই বেচে দে'—বাকিটা আর বলে না। সবাই জানে। তার মানে, ঐ পয়সা দিয়ে পাল কেন।

টেটেনদি উপস্থিত অর্থাভাবে। এটা সেটা বেচছে। নবীন হদিসের আশায় শুধালে, 'আপনি কি বেচলেন?' ইঙ্গিতটা বড় রূঢ়।

'মনিং সুট, ঈভনিং জ্যাকেট—'

বড়দা পিচভরা মুখ আকাশ পানে তুলে বললে, 'ভালো করেননি। এই আমি কেদার-বদ্রী হয়ে এলুম। পথেই যত বাহার—দেবতা দেখতে এমন কিছু না, কিন্তু যখন সাঁঝের ঝোঁকে ঈভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন দেখায় লাভলি।'

বিগ্রহের ঈভনিং জ্যাকেট। ওঃ, বুঝেছি। ঠাকুরকে যখন সন্ধ্যায় সিঁদুর চন্দন দিয়ে শৃংগার করানো হয়। সেইটে বড়দার ভাষায় ঈভনিং জ্যাকেট পরা। বুঝতে সময় লেগেছে। দিল্লিতে তিন বছর থেকে আক্কেল-বুদ্ধি ভোঁতা মেরে গিয়েছে।

টেটেনদি শুধালে, 'আর গার্ড অব অনার পেলেন বুঝি সেই ঈভনিং জ্যাকেটের পয়সায় মর্গানেটিক টিপস্ দিয়ে?' টেটেন ইংরেজিতে এম-এ। লাতিন শব্দের ইঁটের থান মারে।

অজনদা বললে, 'সে সব দিন গেছে রে টেটেন, তুই জানিস নে। টিপস্ দিলে তোকে খাতির করলে করতেও পারে, কিন্তু না দিয়ে তুই যদি এমপি-টেম পি হবার ভান করতে পারিস অর্থাৎ ভি আই পি, টি আই পি—'

মশাদা আলট্রা ডিমোক্রেট। বাধা দিয়ে বললে, 'এই ভি আই পি কথাটা প্রথম কে ব্যবহার করেছিল জানেন, চাচা? লোকটা নিশ্চয়ই জন্মদাস ছিল। ভি আই পি যদি কেউ থাকে তবে সে মুটে, জুতো-বুরুশওলা—সরকারের এক পয়সা নেয় না, সরকারের গাড়ি মুফতে চড়ে না—'

আমি বললুম, 'আমি টিপস দি নি। শোন।'

পালের বলদ বিক্রি করে তো অ্যারকোচে চাপলুম। দিল্লি চিরতরে ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে দিল্লির খানদানী ইয়ার-দোস্তরা গাড়িতে বিস্তর খাবার-দাবার তুলে দিলে। বিরয়ানী মুরগী মুসল্লম থেকে মিঠা টুক্‌ড়া মোরব্বা ইস্তেক। চারটে টিফিন কেরিয়ার ভর্তি। দুজন তো এলেন কানপুর অবধি। তাঁরা আবার দোস্তী পাকাতে ওস্তাদ। কোচের প্রায় সবাই জড়ো হল আমাদের কুপেতে। শুরু হল মুশাইরা, বয়েৎ-বাজি। তারপর নবাবী খানাপিনা। স্টুয়ার্ড সোডা সাপ্লাই করতে করতে কাহিল হয়ে গেল।

রাত বারোটার সময় যখন যে যার কোঠে ফিরে গেছেন, আমি একা, তখন দেখি, স্টুয়ার্ড। পিছনে তারই দলের দু'তিনজন। ভাবলুম, লোকগুলো বিস্তর খেটেছে—এই বেলাই টিপসটা দিয়ে দি। কিন্তু তার পূর্বেই সে ডবল সেলাম করে শুধালে, 'হুজুর, আপ তো ডক্টর হৈ?' গোয়ানীজ টোয়ানীজ হবে—ডক্টরই বলেছিল। আমি না ভেবেই বললুম, "হ্যাঁ।" তখন বিস্তর কাঁচুমাচু হয়ে এস্তের ঢোক গিলে, ঘাড়ের চুল ছিঁড়ে প্রায় ক্লীন শেভ করে বললে, 'হুজুর যদি কিছু না মনে করেন—'

আমি বললুম, 'কী আপদ! বলেই ফেলো না!'

বহু কষ্টে বোঝালে, তার মেটের ভয়ঙ্কর জ্বর, বেহদ্দ বেহুঁশ, এই যায় কি তেই যায়। হুজুরের যদি দয়া হয়, হুজুর মেহেরবান।

প্রথমটায় আমি বুঝতে পারিনি। বললুম, 'বড়ী আফসোস কী বাত, কিন্তু আমি কি করবো?'

এবারে সে তার সর্বশরীর ব্যাং মাছের মতো মোচড়াতে আরম্ভ করলে। যেন জ্বরটা তারই। বললে, 'আপনি তো স্যার, ডক্টর।'

তখন আমার কানে জল গেল। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'আমি জ্বর সারাই কে বললে?'

লোকটা ভয় পেয়েছে। অথচ আপন কাজ উদ্ধার করতে চায় বলে মেলা তর্ক করে আমাকে চটাতেও চায় না। বললে, 'এই তো রিজার্ভেশন কার্ডে লেখা রয়েছে, হুজুর।'

এ দুনিয়ায় 'আলী' নামটা বাঙলা দেশে 'কেষ্টা' নামটার মতই বিরল। গুবলেট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমার আপিস বার্থ রিজার্ভ করার সময় ডক্টরটি জুড়ে দিয়েছিলেন। সেইটেই এখন কাল হল।

আমি সবিনয় বললুম, 'সে অন্য ডাক্তার।'

বোধ হয় ভুল করলুম। কারণ এর পর দেখি স্টুয়ার্ডের সাঙ্গপাঙ্গরা তার পিছন থেকে মাসিকপত্রের উপন্যাসের মতো 'ক্রমশ প্রকাশ্য' হচ্ছে। সক্কলেরই হাত জোড় করা। হুবহু মোগল পেন্টিংয়ের দরবারের মতো। অবশ্য মুখের ভাব;—আসামীর সনাক্তকরণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে, এইবারে সাক্ষীসাবুদ-দলিল-দস্তাবেজ আরম্ভ হবে।

আমি অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি অন্য ডক্টর। তারা তর্ক করতে চায় না, কিন্তু জানতে চায়, তবে কিসের? ডক্টর অব ফিলসফি এদের বোঝাই কি প্রকারে? শেষটায় বললুম, 'দেমাগ সাফ করনেকা ডাক্টর—' অর্থাৎ মগজ সাফ করার ডাক্তার। শুনেছি, দর্শন অধ্যয়ন করলে মস্তিষ্ক পরিষ্কার হয়, অবশ্য আমার বিশ্বাস বিপরীত।

রাসা রোড থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত তাবৎ হাজরা রোড এ-কথায় আনন্দে সায় দিলে। কথায় বলে 'দশের মুখ খুদার তবল', কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনে উল্লাস বোধ করলুম না। যাক গে।

এই 'দেমাগ সাফ করাটা' গিলতে স্টুয়ার্ডগোষ্ঠীর সময় লেগেছিল। শেষটায় স্বয়ং স্টুয়ার্ডই হালে পানি পেল। ভয় পেয়ে বললে, 'না, হুজুর মেটের মাথা খারাপ নয়।'

ও হরি! এরা ভেবেছে, আমি পাগলের ডাক্তার।

টেটেনদি বললে, 'সাইকায়াট্রিস্ট্।'

আমি বললুম কচু। মেডসিন না পড়েও ঐ কর্ম করা যায়। সেটা ওরা বুঝলে তো আমি বেঁচে যেতুম। তা নয়। ওরা ফিসফিস করছে, আর সব মেলা ব্যামো সারানোর পর আমি পাগল সারাতে মন দিয়েছি—ঐ কর্ম সব চেয়ে কঠিন বলে। পাগল সারাতে পারে, আর জ্বর সারাতে পারে না! হুঃ! 'হাতী' বানান করতে পারে আর 'পিপীলিকা' পারে না—হাতী কত বিরাট আর পিপীলিকা কত ছোট—ঐ গোছ যুক্তি।

কিংবা বলতে পারো, ছোট বিপদ এড়াতে গিয়ে পড়লুম বড় বিপদে। সেই যে কোন্ সুবুদ্ধিমান বৃষ্টি এড়াবার জন্য ডুব দিয়েছিল পুকুরে।

তা সে যাকগে। ওরা আমাকে বিধান ডাক্তার, মানুষের ডাক্তার, পাগলের ডাক্তার, কুকুরের ডাক্তার, যা খুশি ভাবুক, আমার তাতে থোড়াই এসে যায় ।

কিন্তু ঐ বিধান ডাক্তার নিয়েই লাগল গোলমাল। ওরা ভেবেছে আমি বিধানবাবুর চেয়েও বড় ডাক্তার। কিছুটা আমায় শুনিয়ে, কিছুটা নিজেদের ভিতর তাদের মধ্যে যেন নিলাম ডাকাডাকি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, আমার দক্ষিণা কত। চৌষট্টি না কত থেকে আরম্ভ হয়েছিল শুনতে পাইনি, কিন্তু আমার চোখের সামনেই দেখ তো না দেখ দশ বিশ হাজারে গিয়ে পৌঁচেছে। আর কত রকম যুক্তিই না একে অন্যকে দেখাচ্ছে। অ্যারকন্ডিশন চড়ি, সে তো ডাল-ভাত। কটা বাক্স, প্যাটরা—সব তাদের মুখস্থ। দামী দামী ডাক্তারির মালপত্র ওদের ভিতরে। সব বিলায়তী, জর্মনি, আরও কত কি।

আমার চেহারা দেখে আমাকে উজবুক মনে হতে পারে, কিন্তু পাষণ্ডের মতো চেহারা আমার নয় সে কথা আমার মা আমাকে বলেছে। তবে কেন এরা ভাবছে, আমি একটা

আস্ত কসাই, মোটা টাকা না পেলে বরঞ্চ একটা লোককে মরতে দেখব, তবু কড়ে আঙুলটি তুলব না।

আমি বহু কষ্টে ধৈর্য সম্বরণ করে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি ডাক্তারির কিছুই জানি নে, খামখা একটা লোককে কুচিকিৎসায় মারি কোন্ আক্কেলে?

ওরা চুপ করে যেভাবে আমার দিকে তাকালে তাতে মনে হল আমি যেন একটি পয়লা নম্বরের গোড়সে। তবে গোড়সে শুধু একটিমাত্র, গান্ধিকে খুন করেছিল, আমি করি গণ্ডায় গণ্ডায়।

আমিও চুপ।

শেষটায় তারা শ্লথ মন্থরে পা চালাতে আরম্ভ করলে।

আমার মনে করুণার উদ্রেক হল। আর ঐ করলুম ভুল। যুধিষ্ঠিরের মত খ্রীস্ট কোন একটি পাপ করার ফলে যদি কখনো নরক-দর্শনে আসেন তবে তাঁকে ঐ একটি উপদেশ দেব, 'মহাশয়, আপনি করুণা করে আর ঐ করুণা করার উপদেশটি দেবেন না।'

ওদের বললুম, 'তা ওকে এলাহাবাদে নামিয়ে দাও না'—মনে মনে বললুম, পণ্ডিতজীরও নিশ্চয়ই গণ্ডাকয়েক অনারারি ডক্টরেট আছে।

এক লম্ফে সবাই আবার আমার দোরের সামনে। এককণ্ঠে সবাই বললে, 'এলাহাবাদ তো পিছনে ফেলে এসেছি।'

তখন মনে মনে চিন্তা করলুম, হাওড়া পর্যন্ত তা হলে তো এর কোনো গতি নেই। তখন আরও মনে পড়ল, বছর তিনেক পূর্বে আমার ফ্লু হওয়াতে এক সহৃদয় বন্ধু আমাকে এক শিশি ফ্লু টেবলেট দিয়ে যান; আমি ভালো করেই জানতুম, ফ্লু ওষুধে সারে না, তাই সে ওষুধ তেমনি পড়ে ছিল! দিল্লি ছাড়ার সময় আমার সময় ছিল না বলে চাকরকে বলেছিলুম, ঘরের তাবৎ মাল যেন প্যাক করে দেয়। সেই কারণেই দুনিয়ার যত আবর্জনায় ভর্তি দু'গণ্ডা বাকসোপ্যাটরা। ঘাঁটবে কে, খুঁজে পাবেন কোন্ হনুমান?

তারই ইঙ্গিত দিয়ে করলুম দুই নম্বরের ভুল—যদিও আসলে সেইটেই পয়লানম্বরী ভুল। সঙ্গে সঙ্গে আমার আটটা বাক্স করিডোরে সারি বেঁধে সাজানো হল—আমি বাধা দিতে না দিতেই। তখন নাচার হয়ে সেই শিশিটার বর্ণনা দিলুম।

পুলিনবিহারী সেনের বাড়ি এক ভোরে সার্চ হয়েছিল। আমি সে রাত্রে তার সঙ্গে ছিলুম বলে স্বচক্ষে দেখেছি পুলিশ কি রকম চিরুনি চালায় টুথব্রাশের উপর—তার থেকে কিছু বেরোয় কি না, সেই আশায়। মায় স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এদের কাছ থেকে তালিম নিয়ে যেতে পারত কি করে সার্চ চালাতে হয়।

আড্ডার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'বল দেখি ভাইরা সব, তিন বছরের প্রবাসে মানুষের কোন্ না দশ বিশটা ওষুধের শিশি জড় হয়। তারই এক-একটা বেরয় আর তারা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসে। ভাবখানা,—তবে না বলছিলেন চাঁদ তিনি ডাক্তার নন। আর ইংরিজি পড়তে জানে না বলে লাইটার ফ্লুইডকে ভাবে ওষুধ, ফেনসি গাঁদের শিশিকে ভাবে ওষুধ, সেন্টের শিশিকে ভাবে ওষুধ—একমাত্র সসের শিশিকে ওষুধ ভাবে নি—রেস্তোরাঁ কারে কাজ করে বলে।

ওষুধের শিশি তো আর রাসবিহারী বোস নন যে জাপান পালিয়ে যাবেন। ধরা পড়লেন। বমালসুদ্ধ গ্রেফতার—

অজন বললে, 'এই 'বমালসুদ্ধ' কথাটা কি ভুল নয়? 'ব' মানেই তো 'সুদ্ধ', ইংরিজিতে যাকে বলে 'উইথ'। উইথ মাল গ্রেফতার। আবার সুদ্ধ কেন? হয় হবে 'বমাল

গ্রেফতার', না হয় হবে 'মালসুদ্ধ গ্রেফতার'। যেমন বলি 'বহাল তবিয়তে' আছি, 'বহাল সুস্থ তবিয়তে আছি' তো বলিনে।'

মশাদা বললেন, 'রবিঠাকুর ব্যবহার করেছেন।'

অজনদা চটে বললে, 'তিনি তো দক্ষিণ আমেরিকায় বসে কবিতায় লিখলেন, আকাশে সপ্তর্ষি উঠলো। দক্ষিণ আমেরিকা থেকে কি সপ্তর্ষি দেখা যায়? আরও কি যেন আছে? হ্যাঁ—'বেতসের বাঁশী'—বেতস মানে তো বেত। বেত দিয়ে বাঁশী হতে কখনো দেখেছিস?'

টেটেনদি অলঙ্কার শাস্ত্র পড়েছে। বললে, 'যত সব বেরসিক।'

বড়দা সদুপদেশ দিলেন, 'সে না হয় পণ্ডিত মশাইকে পরে শুধনো যাবে, কোন্‌টা ঠিক। উপস্থিত তোদের বলে দিচ্ছি, রবিঠাকুরের সেন্টানারি আসছে। এখন বছর দুই এসব কথা বলেছিস কি পাড়ার ছেলেরা মারবে।'

মুকুলদি উঠে চলে যাচ্ছে দেখে সবাই হন্তদন্ত হয়ে বললে, 'বলুন চাচা' তারপর কি হল।' মুকুলদিকে কে না সমীহ করে। ভাঁড়ারের চাবি তার হাতে। আমি বললুম, ওষুধটা বেরুলে পর আমি বললুম, এরই দুটি গুলি খাইয়ে দাও।' মনে মনে বললুম, 'এতে তার ভালো-মন্দ কিস্‌সুটি হবে না—হাওড়া গিয়ে যা হবার তাই হবে।'

'নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে গেলুম। ভাবলুম, আপদ গেছে। ঐ করলুম আরেক ভুল।

পরদিন সকালে বর্ধমানে চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, আমার কুপের সামনে একপাল লোক একসারি কাপড়ে ঢাকা ট্রে নিয়ে হাজির। ভাই, তোরা যদি থাকতি—রুটি-মাখন-মমলেট।'

আমার ভ্রূকুটিকুটিল নয়ন তারা লক্ষ্যই করলে না। সমস্বরে চেঁচিয়ে বললে, 'সেরে গেছে, হুজুর, একদম সেরে গেছে।'

আমি বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম। বললুম, 'কে?'

সবাই প্রথমটায় থ মেরে পরে বললে, 'ঐ যে মেট।'

স্টুয়ার্ড সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'সকালে উঠেই তিনখানা ডবল রুটি খেয়েছে। দু পট চা। আমরা বারণ করিনি। আপনি তো রয়েছেন। আর ভাবনা কি।'

আমি মুখ ফিরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালুম।

অজনটা পেটুক। বললে, 'তা বেশ, তা বেশ। ব্রেকফাস্টটা ভালো করে খেয়ে নিলেই পারতেন।'

আমি বললুম, 'দেখ অজন, আস্ত একটা বুজরুক পেলি নাকি আমাকে—পেশাদার গুরু-মুর্শীদরা ঐ রকম ধাপ্পা মেরে খায়। আমাকে কি তাই ঠাওরালি?'

টেটেন বললে, 'আপনি থামুন, মশাদা। চাচাকে আর চটাবেন না। বলুন, চাচা।'

আমি বললুম, 'ব্রেকফাস্ট খেলুম না দেখে ওরা ভড়কে গেল—অবশ্য চা দু'কাপ খেয়েছিলুম। ওরা নিঃশব্দে চলে গেল।

হাওড়া পৌঁছবার পূর্বে চীফ স্টুয়ার্ডকে ডেকে বললুম, 'এই নাও চায়ের এক টাকা, আর তোমাদের টিপ্‌স্ চারটাকা।'

স্টুয়ার্ড ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার পিছনে একটা অচেনা চেহারার লোক ভ্যাক করে কেঁদে ফেললে—পরে জানলুম ঐ লোকটাই মেট, আমাকে সেলাম জানাতে এসেছিল—তারপর ডুকরে বললে, 'আমরা গরীব আপনার ফীজ দিতে পারলুম না, আর আপনি উল্টে দিচ্ছেন বখশিশ'

আমি বিরক্ত হয়ে সব কটাকে বের করে দিয়ে কুপের দরজা বন্ধ করে দিলুম। তারপর তোরা তো দেখলি আমাকে প্ল্যাটফর্মে গার্ড অব অনার দিলে।

ঘণ্টুদা একটু মুরুব্বি ঢঙে কথা কয়। বললে, 'এতে আপনি অত চটছেন কেন? আপনার দাওয়াইতেই সারুক আর নিজের থেকেই সারুক, আপনার মন খামখা চঞ্চল করছেন কেন?'

আমি উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'তোমাদের মতো আকাট নিরেট গবেট আমি ইহজন্মে পূর্বজন্মে, জন্মে-জন্মে কখনো দেখিনি। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম, ওদের মুখের উপর কৃতজ্ঞতা মাখা ছিল বটে—যার উপর হক অবশ্য আমার নেই—তার পিছনে ছিল লেখা স্নব। অর্থাৎ আমি গরীব দুঃখীর চিকিৎসা করিনে, সেটা এড়াবার জন্য মিথ্যে কথা বলতেও তৈরি—অথচ আমি যে হাত উপুড় করলেই ওদের পর্বত সেটা সপ্রমাণ হয়ে গেল। সোজা বাঙলায় স্নব, ক্যাডও বলতে পারিস—

'আমার কণ্ঠ তখন পর্দার পর পর্দা চড়েই যাচ্ছে, এমন সময় হঠাৎ দেখি জনা পাঁচেক লোক আমার বাড়ির নেমপ্লেট পড়ছে। লীডার সেই ব্যাটা স্টুয়ার্ড! আমি আঁতকে উঠলুম। কিন্তু ঠিকানা পেল কি করে? ওঃ! লাগেজগুলোর উপর নাম-ঠিকানা সাঁটা ছিল। অবশ্য বাড়ির নেম-প্লেটে আমার নাম নেই।

'আমি বৈঠকখানায় গা ঢাকা দেবার পূর্বে বললুম, ঐ সব মালরা আসছে! ওদের একটু বুঝিয়ে দে না, ভাইরা সব, চাচা-জানরা আমার, যে আমি ডাক্তার নই। তোদের কথা তো বিশ্বাস করবে।'

আড়াল থেকে অনিচ্ছায় নিম্নলিখিত কথোপকথন কর্ণে প্রবেশ করল।

'এটা ডাক্তার সাহেব অমুকের বাড়ি?'

অজনের গলা : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'—ঐ ঢাউস বাড়ি আমার নয়।

'নেমপ্লেটে নাম না দেখে ভাবলুম, কি জানি—'

বাধা দিয়ে মশার গলা : 'আরে নাম থাকলে কি আর রক্ষে ছিল। ছিঁড়ে ফেলতো না দুনিয়ার যত সব রুগী টুকরো টুকরো করে!'

একাধিক গদগদ কণ্ঠস্বর : 'তা হুজুর আর কি বলবেন, আমরা কি জানিনে? এই মোতীর জ্বরটা বড্ডই পাজী। একবার ধরলে দশদিনের কমে—'

অন্য কণ্ঠ : 'বিশদিনের কমে ছাড়ে না। আর ডাক্তার সাহেবের দুটি গুলিতেই—'

আরেক কণ্ঠ—বোধহয় স্টুয়ার্ডের—'কিছু যদি মনে না করেন, ওঁর ফীজ কত?'

অজনের টেনে-টেনে বলা : 'তা—তা—তা, দেড়, দুই—'

'দুশ? বাপ্!'

'হাজার—হাজার, শ নয়।'

নিশ্চুপ।

মশার গলা : 'অবশ্য যখন বাইরে যান, ঐ যে, মাসখানেক আগে রামপুরের নবাবের ছেলে এসে তাঁকে জোর করে নিয়ে গেল—স্পেশাল ট্রেনে—তখন ত্রিশ হাজার না কত—বল না ঘণ্টু, তুই তো সঙ্গে ছিলি—'

ভাবছি এ রকটা ছাড়ব।

[১৯ মার্চ, ১৯৬১/আনন্দবাজার পত্রিকা : রবিবাসরীয়]

মার্জারনিধন কাব্য
বা
গূরবে কুশ্ তন শব-ই আওওয়ল

কোন্ দেবে পূজা করি কোন্ শীর্নি ধরি?
গণপতি, মৌলা-আলী, ধূর্জটি, শ্রীহরি?
মুশকিল্-আসান্ আর মুর্শিদ মস্তান্
কোম্পানী কি মহারাণী. ইংরেজ, শয়তান?
হিন্দুস্থান, পাকিস্তান, যেবা আছ যথা
ইস্পাহানী, ডালমিঞা—কলির দেবতা।
সবারে স্মরণ করি সিতুমিঞা ভনে
বেদরদ বেধড়ক ভয় নাহি মনে।।

ইরান দেশের কেচ্ছা শোন সাধুজন
বেহদ্ রঙীন কেচ্ছা, বহুৎ বরণ।
এন্তার তালিম পাবে করিলে খেয়াল
রোশনী আসিবে দিলে ভাঙিয়া দেয়াল।
পুরানা যদিও কেচ্ছা তবু হর্বকৎ
সমঝাইয়া দিবে নয়া হাল হকীকৎ।।

ইরান দেশেতে ছিল যমজ তরুণী।
ইয়া রঙ, ইয়া ঢঙ, নানা গুণে গুণী।
কোথায় লায়লী লাগে কোথায় শিরীন
চোখেতে বিজলী খেলে ঠোঁটে বাজে বীণ।
ওড়না দুলায়ে যবে দুই বোন যায়
কলিজা আছাড় খায় জোড়া রাঙা পায়।
এ্যাসা পীরিতি তোলে ফকিরেরও জানে
বেহুঁশ হইয়া লোক তারীফ বাখানে।
দৌলতও আছিল বটে বিস্তর বিস্তর
বাপ দাদা রাখি গেলা চাকর-নফর।
ধন জন ঘর বাড়ি তালাব খামার
টাকা কড়ি জওয়াহর এন্তারে এন্তার।
তাই দুই নারী চায় থাকিতে আজাদ
কলঙ্কের ভয়ে শুধু বিয়ে হৈল সাধ।
তখন সে করিল শর্ত সে বড় অদ্ভুত
সে শর্ত শুনিলে ডর পায় যমদূত।
বলে কিনা প্রতি ভোরে মিঞার গর্দনে
পঞ্চাশ পয়জার মারি রাখিবে শাসনে।
এ বড় তাজ্জব বাৎ বেতালা বদ্খদ্

এ শর্ত মানিবে কেবা হয় যদি মর্দ্?
দুল্হা বরেতে ছিল পাড়া ছয়লাপ
শর্ত শুনে পত্রপাঠ হয়ে গেল সাফ।
সিতু মিঞা বলে সাধু এ বড় কৌতুক
মন দিয়া কেচ্ছা শোনো পাবে দিলে সুখ॥

শীত গেল বর্ষা গেল আসিল বাহার
ফুলে গুলে ইস্ফাহান হৈল গুলজার।
শীরাজ তব্রীজ আর আজর বৈজান।
খুশীতে ভরপুর ভেল জমিন আসমান।
শুধু দুই ভাই নাম ফিরোজ মতীন
পেটের ধান্দায় মরে দুঃখে কাটে দিন।
অবশেষে ছোট ভাই বলে ফিরোজেরে
"কি করে বাঁচিবে বলো, কি হবে আখেরে।
তার চেয়ে জুতা ভালো চলো দুই জনে
শাদী করি পেট ভরি দু মেয়ের সনে।"
দুআভুআ ফিরোজের মন মাঝে হয়
শাদীতে আয়েশ বটে জুতারও তো ভয়।
হদীসের লাগি ঘাঁটে কুরান পুরাণ
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মজলিশ জৌলুস করি দুনিয়া রওশন
জোড়া শাদী হয়ে গেল খুশ ত্রিভুবন।
চলি গেলা দুই ভাই ভিন্ন হাবেলিতে
মগ্ন হইলা মত্ত হইলা রসের কেলিতে।
পয়জারের ভয়ে নারি করিতে বয়ান
সিতু ভণে চুপিসাড়ে শুনে পুণ্যবান॥

তিন মাস পরে বুঝি খুদার কুদ্রতে
আচম্বিতে দু ভায়েতে দেখা হল পথে।
কোলাকুলি গলাগলি গিনা কলিজায়
মরি মরি মেলামেলি করে দুজনায়।

"তোমার মাথায় টাক নেই কেন?"
শুধায় ফিরোজ ভাই
মানিয়া তাজ্জব উত্তরে মতীন
"টাক কেন বলো তাই?"
কাঁচুমাচু হয়ে পুছিল ফিরোজ
"জোরে কি মারে না চটি"

"আরে দুত্তোর হিম্মত কাহার
আমি কি তেমনি বটি?
বাখানিয়া বলি শোন কান পেতে
তরতিব কাহারে কয়।
আজব দুনিয়া আজব চিড়িয়া
মামেলা ঝামেলা ময়।
তাই বসিলাম তলওয়ার হাতে
বীবী দিলা খানা আনি
কোর্মা পোলাও তন্দুরী মুর্গী
ঢাকাই বাখরখানী।
খানা আইল যেই বীবীর পেয়ারা
বিড়াল আসিল সাথে
যেই না করিল মমমিয়া 'ম্যাঁও'
খাপটা না তুল্যা হাতে,—
খুল্যা তলোয়ার এক কোপে কাট্যা
ফালাইনু কল্লাডারে
তাজ্জব বীবী আক্কেল গুড়ুম
জবানে রা'টি না কাড়ে।
গুস্‌সা কৈরা কই এসব না সই
মেজাজ বহুৎ কড়া
বরদাস্ত নাই বিলকুল আমার
তবিয়ৎ আগুনে গড়া।
তার পর কার ঘাড়ে দুইডা মাথা
করিবে যে তেড়িমেড়ি?"
সিতু মিঞা কয় নিশ্চয় নিশ্চয়
বাঘিনী পরিল বেড়ি।

"ক্যাবাৎ", "ক্যাবাৎ" বলি হাওয়া করি ভর
চলিল ফিরোজ মিঞা পৌঁছি গেলা ঘর।
মিলেছে দাওয়াই আর আন্দেশা তো নাই
খুদার কুদ্রতে ছিল তালেবর ভাই।
তারপর শোনো কেচ্ছা শোনো সাধুজন
ঠাস্যা দিল সেই দাওয়া পুলকিত মন।
সে রাতে খানার ওক্তে খুল্যা তলোয়ার
কাট্যা না ফালাইল মিঞা কল্লা বিল্লিডার।
চক্ষু দুইডা রাঙ্গা কর্যা হুঙকারিয়া কয়
"তবিয়ৎ আমার বুরা গর্বড় না সয়।
হুঁশিয়ার হয়ে থেকো নয় সর্বনাশ।"
সিতু মিঞা শুনে কয়, শাবাশ শাবাশ।।

হায়রে বিধির লেখা, হায়রে কিস্মৎ
জহর হইয়া গেল যা ছিল শর্বৎ।
ভোর না হইতে বীবী লয়ে পয়জার
মিঞার বুকেতে চড়ি কানে ধরি তার।
দমাদম মারে জুতো দাড়ি ছিঁড়ে কয়
"তবিয়ত তোমার বুরা, বরদাস্ত না হয়?
মেজাজ চড়েছে তব হয়েছ বজ্জাৎ?
শাবুদ করিব তোমা শুনে লও বাৎ
আজ হৈতে বেড়ে গেল রেশন তোমার
পঞ্চাশ হৈতে হৈল একশ' পয়জার।"
এত বলি মারে কিল মারে কানে টান
ইয়াল্লা ফুকারে সিতু, ভাগ্যে পুণ্যবান॥
কোথায় পাগড়ী গেল কোথায় পাজামা
হোঁচট খাইয়া পড়ে কভু দেয় হামা।
খুন ঝরে সর্ব অঙ্গে ছিঁড়ে গেছে দাড়ি
ফিরোজ পৌঁছিল শেষে মতীনের বাড়ি।
কাঁদিয়া কহিল, "ভাইয়া কি দিলি দাওয়াই
লাগাইনু কামে এবে জান যায় তাই।"
বর্ণিল তাবৎ বাৎ, মতীন শুনিল
আদর করিয়া ভায়ে কোলে তুলি নিল।
বুলাইয়া হাত মাথে বুলাইয়া দেহ
"বিড়াল মেরেছে" কয়, "নাই তো সন্দেহ।
ব্যাকরণে তবু, দাদা, কৈলা ভুল খাঁটি।
বিলকুল বরবাদ সব গুড় হৈল মাটি।
আসলে এলেমে তুমি করোনি খেয়াল
শাদীর পয়লা রাতে বধিবে বিড়াল।"
বাণীরে বন্দিয়া বন্দিয়া বান্ধিলো বয়ান
দীন সিতু মিঞা ভণে শুনে পুণ্যবান॥

মল্লিনাথস্য { স্বরাজ লাভের সাথে কালোবাজারীরে
মারনি এখন তাই হাত হানো শিরে।
শাদীর পয়লা রাতে মারিবে বিড়াল
না হলে বর্বাদ সব, তাবৎ পরমাল॥*

[পঞ্চতন্ত্র প্রথম খণ্ড—রচনাবলী প্রথম খণ্ড]

*ইরানে এ কাহিনী সবিস্তরে বলা হয় না। শুধু বলা, হয়, 'গুরবে কুশতন, শব-ই আওওয়ল' অর্থাৎ গুরবে = বিড়াল, কুশতন = মারা, শব = রাত্রি, আওওয়ল = প্রথম। সোজা বাঙলায় 'পয়লা রাতেই মারবে বিড়াল।'